শিক্ষা সংস্কৃতি ও সমাজভাবনার দ্বিমাসিক

আল-আমীন বার্তা

ভাদ্র-অগ্রহায়ণ ১৪২১ ● সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ২০১৪ ● জিলকাদ-সফর ১৪৩৫-৩৬

আল-আমীন মিশন: তথ্য ও পরিসংখ্যান

মিশনের বিস্তার

- কাজের পরিধি: পশ্চিমবঙ্গের ১৫-টি জেলায় এবং অসম ও ঝাড়খণ্ডে।
- মোট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: ৬৭-টি। মোট ছাত্রছাত্রী: ১১৬৬৭ জন।
- আবাসিক ক্যাম্পাস: ৪১-টি। আবাসিক ছাত্রছাত্রী: ৭৪৫৬ জন।
- পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণির ছাত্রছাত্রী: ৩৭১৬ জন (ছাত্র: ২৬৮৯ জন, ছাত্রী: ১০২৭ জন)।
- একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রী: ৩০৪৩ জন (ছাত্র: ১৯৮২ জন, ছাত্রী: ১০৬১ জন)।
- জয়েন্ট এন্ট্রান্স ও বিসিএস কোচিংয়ে ৬৯৭ জন (ছাত্র: ৫২৭ জন, ছাত্রী: ১৭০ জন)।
- দুঃস্থ, নিম্নবিত্ত পরিবারের ছাত্রছাত্রী: ১৮৩৭ জন (২৫%)।
- নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের ছাত্রছাত্রী: ৩০৫২ জন (৪১%)।
- মধ্যবিত্ত ও উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারের ছাত্রছাত্রী: ২৫৬৭ জন (৩৪%)।

দশ বছরে ক্রমবর্ধমান আবাসিক ছাত্রছাত্রী

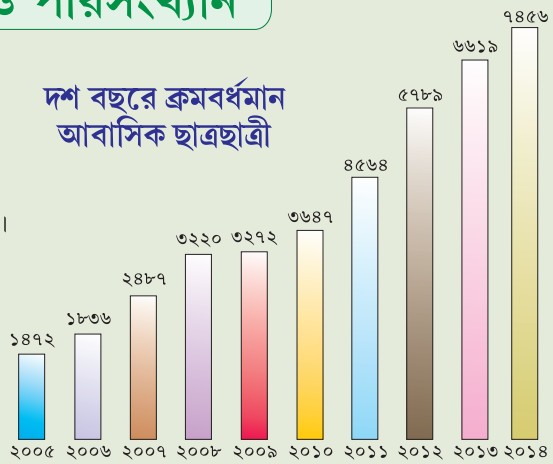

জয়েন্ট এন্ট্রান্সে (মেডি. ও ইঞ্জি.) দশ বছরের সফল ছাত্রছাত্রী

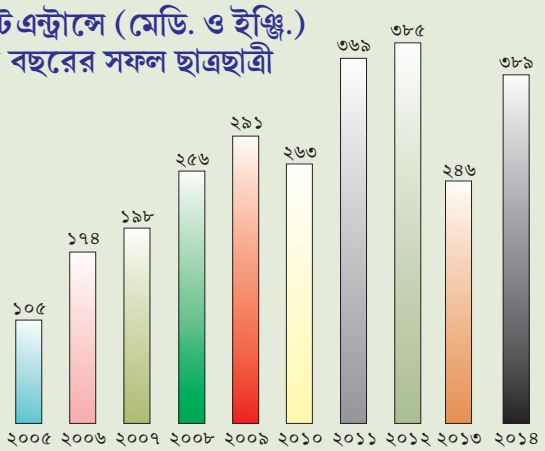

জেলাভিত্তিক আবাসিক ছাত্রছাত্রী

মুর্শিদাবাদ	১৯৭৮	হুগলি	২৩০
মালদা	১২২৯	পূর্ব মেদিনীপুর	১২৫
বীরভূম	৬৩৮	বাঁকুড়া	১০৮
দ. ২৪ পরগনা	৬০২	কুচবিহার	৭০
নদীয়া	৪৮৭	কলকাতা	৩৯
বর্ধমান	৪২৪	পুরুলিয়া	২১
হাওড়া	৩৪৭	জলপাইগুড়ি	১৪
উ. ২৪ পরগনা	৩২৪	দার্জিলিং	০২
দ. দিনাজপুর	২৯৪	অসম	২২
উ. দিনাজপুর	২৪৭	ঝাড়খণ্ড	১৯
প. মেদিনীপুর	২৩১	অন্যান্য	০৫

প্রাক্তনী পরিসংখ্যান

- মাধ্যমিক পাস করেছে ৩৮৮৬ জন।
- উচ্চমাধ্যমিক পাস করেছে ৬৪৫৩ জন।
- মেডিকেলে ১১১৪ জন, পাস করেছে ৫৪৫ জন।
- ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ১৬৪৯ জন, পাস করেছে ৯৭২ জন।
- ডব্লিউবিসিএস পরীক্ষায় সফল হয়ে কর্মরত ২০ জন।
- বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকুরিরত ৫৯৭ জন।
- স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে পড়ছে ২৪৫৬ জন।

দশ বছরের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী

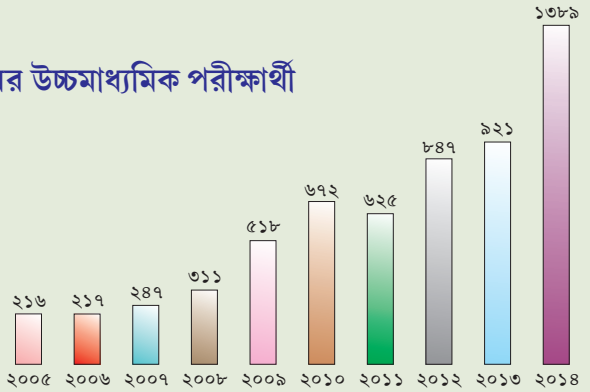

দশ বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী

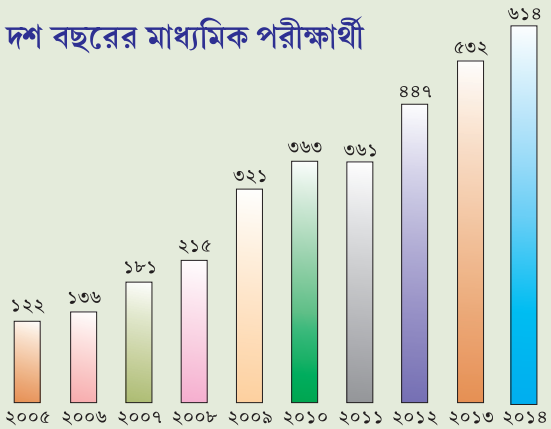

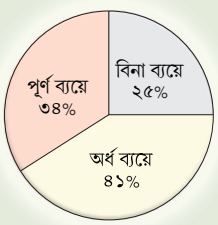

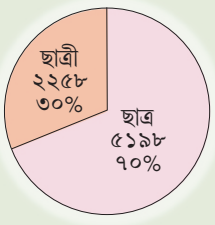

ভর্তি বিষয়ক তথ্য ২০১৫

একাদশ শ্রেণি বিজ্ঞান বিভাগ

- ফর্ম পাওয়া যাবে ১২.১২.১৪ থেকে।
- ফর্ম জমা দেওয়া যাবে ১৮.০২.১৫ পর্যন্ত।
- প্রবেশিকা পরীক্ষা ০৮.০৩.১৫ রবিবার।

আল-আমীন বার্তা

ভাদ্র-অগ্রহায়ণ ১৪২১ • সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ২০১৪ • জিলকাদ-সফর ১৪৩৫-৩৬ । চতুর্থ বর্ষ • পঞ্চম-ষষ্ঠ সংখ্যা

কিংবদন্তি
একরাম আলি
রূপকথার শাকিলা ০৬

দিনগুলি রাতগুলি
রোহণ কুদ্দুস
আমার মিশন মিশনের আমি ১২

সেই সময়
একরামুল হক শেখ
আল-গাজালি
ধর্মতত্ত্ব ও দর্শনের শ্রেষ্ঠ এক মনীষী ১৭

উজ্জ্বল প্রাক্তনী
আসাদুল ইসলাম
সাধারণের মধ্যেই অসাধারণের মহত্ত্ব ২৪

স্মরণ ১
আমিনুল ইসলাম
মীর মশাররফ হোসেন
সাহিত্যকর্ম ও সমাজচিন্তা ২৮

স্মরণ ২
ফ্রান্সিস ব্র্যাডলি ব্র্যাডলি-বার্ট
নবাব আবদুল লতিফ খান বাহাদুর ৩৪

মুক্তভাষ
ইউরি দ্‌মিত্রিয়েভ
রং আলো আর লেজের ভাষা ৪০

জীবনযাপন
জাভেদ ইকবাল
কলম ৪৬

আমার বাড়ি আল-আমীন
আসিফ বিশ্বাস
একা কিছু করা যায় না ৪৯

রূপকথা
দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
দুই ভাইয়ের গল্প ৫১

বিশ্ববিচিত্রা
ফরিদা নাসরিন
ডোম অফ দি রক । মেঘ । ইবোলা ৫৪

হাজার দুয়ারি
মহম্মদ মহসীন আলি
স্কলারশিপের আরও কিছু ৫৬

আরও লেখা
বাণী ০৩
পাঠকনামা ০৪
সম্পাদকীয় ০৫
রত্ন চতুষ্টয় ২৭
শিখরদেশ ৪৩
মিশন সমাচার ৫৯
আমাদের পাতা ৬৩

মুদ্রণ বিবরণী

পরামর্শ পরিষদ
ননীগোপাল চৌধুরী একরাম আলি সেখ মহম্মদ হাসান
সেখ মারুফ আজম এম আব্দুল হাসেম মাইনুদ্দিন আহমেদ

সম্পাদক
এম নুরুল ইসলাম

নির্বাহী সম্পাদক
শেখ হাফিজুর রহমান

সম্পাদনা সহযোগী
দিলদার হোসেন একরামুল হক শেখ
আসাদুল ইসলাম সেলিম মল্লিক

জনসংযোগ
মহম্মদ আসরাফুল হোসেন মহম্মদ আলমগীর বিশ্বাস
সেখ মোমিনুর রহমান তসলিম আরিফ
সেখ মহম্মদ ইস্রাফিল মহম্মদ মহসীন আলি

ইন্টারনেট সংস্করণ
আব্দুল কাইয়ুম বিশ্বাস

বর্ণস্থাপন এবং গ্রাফিক্স
মহম্মদ গোলাম কিবরীয়া

প্রচ্ছদ
ক্যানভাসের ওপরে কাগজের শিরোনামহীন কোলাজ (৯১.৫ সেমি × ৯১.৩ সেমি)। শিল্পী: শাকিলা সেখ। সৌজন্যে সীমা, কলকাতা।

আল-আমীন মিশন ট্রাস্টের পক্ষে সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম কর্তৃক সেন্ট্রাল অফিস ৫৩বি ইলিয়ট রোড, কলকাতা ৭০০ ০১৬ থেকে প্রকাশিত এবং ডায়মন্ড আর্ট প্রেস ৩৭এ বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৬৯ থেকে মুদ্রিত।

মতামত এবং লেখা পাঠাবার ঠিকানা
নির্বাহী সম্পাদক, আল-আমীন বার্তা, ৫৩বি ইলিয়ট রোড, কলকাতা ৭০০ ০১৬।

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ১৫০ টাকা, সডাক ২০০ টাকা • **প্রতি সংখ্যা** ২৫ টাকা

দূরভাষ ০৩৩-২২২৯ ৩৭৬৯; ৩২৯৭ ৩৫৮০
ফ্যাক্স ৯১৩৩ ২২২৯ ৩৭৬৯
e-mail: alameenbarta@gmail.com
weblink: www.alameenmission.org
facebook.com/alameen.barta

ভূপৃষ্ঠে দম্ভভরে বিচরণ করো না, তুমি তো কখনওই পদভারে ভূপৃষ্ঠ বিদীর্ণ করতে পারবে না।

– আল-কোরআন, সুরা বনি ইস্রাইল, আয়াত ৩৭

আবু হোরায়রা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন— হজরত নবি করিম (স.) কখনও কোনো খাদ্যবস্তুর দোষ বর্ণনা করেননি। কোনো খাবার পছন্দ হলে খেয়েছেন আর অপছন্দ হলে পরিত্যাগ করেছেন।

– সহিহ্ বোখারি শরিফ, হাদিস সংখ্যা ৫০১৫

উপযোগী ও সমৃদ্ধ

'আল-আমীন বার্তা'র সূচনা পর্ব থেকে আমি একজন নিয়মিত পাঠক। এত উপযোগী বিষয়ে সমৃদ্ধ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ম্যাগাজিন আমার পাঠকজীবনের অভিজ্ঞতায় এই প্রথম। বিশেষভাবে উল্লেখ্য 'সেই সময়' বিভাগ। 'কিংবদন্তি' বিভাগে শিশুশিক্ষার অগ্রপথিক জনাব আবুল খায়ের জালালউদ্দিনের পদক্ষেপ বর্তমান সমাজকে এক নতুন দিগন্তের আভাস দেয়। শেখ হাফিজুর রহমানের প্রতিবেদনে ডা. মুমতাজ আহমেদ খানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ার অদম্য প্রয়াস দেশ হতে দেশান্তরে সাফল্যের উচ্চশিখরে পৌঁছোনোর বার্তা আমাদের নতুন সমাজ গড়ার অনুপ্রেরণা দেয়। আসাদুল ইসলামের ধারাবাহিক প্রতিবেদন উজ্জ্বল প্রাক্তনীদের জীবনসংগ্রামের ইতিহাস আর আল-আমীন মিশনের প্রশংসনীয় সহযোগিতা— এ এক অন্য ইতিহাস, যা স্মরণযোগ্য। ছাত্রসমাজ উৎসাহ বোধ করবে এবং উপকৃত হবে। 'আমার শিক্ষক' বিভাগটি এই পত্রিকাকে আলাদা মাত্রা এনে দিয়েছে। এই দুঃসময়ে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের উজ্জ্বল মনোময় স্মৃতিচারণ ছাত্রদের মুগ্ধ কববে বলে আমার বিশ্বাস। 'আমার বাড়ি আল-আমীন' বিভাগে (মার্চ ২০১৪) দুই অনাথ বালকের পবিত্র মুখমণ্ডলে সুদূর স্বপ্ন ছোঁয়ার নির্লিপ্ত ছবি। রোহণ কুদ্দুসের মিশনের আবাসিক জীবনবৃত্তান্ত 'আমার মিশন মিশনের আমি', রচনাগুণে পাঠকমন লেখাটি পড়তে আগ্রহী হয়ে ওঠে। এ ছাড়া বুশ লেখক ইউরি দ্‌মিত্রিয়েভের গবেষণাধর্মী বিভিন্ন প্রজাতির পশু পাখি কীট পতঙ্গের অজানা কথা পড়ে চমৎকৃত হই। 'আমাদের পাতা', 'বিশ্ববিচিত্রা' এবং 'রূপকথা' বিভাগ পত্রিকাটিকে সুন্দর করে তুলেছে।

মহ. নূরেন্নবী
সম্পাদক: 'মণিকর্ণিকা', ময়ূরেশ্বর, বীরভূম

বার্তার কাছে আকাঙ্ক্ষা

চিকিৎসা পরিষেবা বিষয়ে কেরিয়ার গড়তে খুবই প্রয়োজনীয় মহম্মদ মহসীন আলির 'কী পড়ব কোথায় পড়ব' (মার্চ ২০১৪)। বহু মানুষ এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে অবহিত নন। পরিচিত সবাইকে জানাতে শুরু করেছি। সমাজবিজ্ঞান বিষয়ে এ-ধরনের একটি লেখা আমরা ভবিষ্যতে বার্তার কাছে আকাঙ্ক্ষা করি।

গোলাম সরওয়ার-ই-জাহান
বুধিয়া, মালদহ

দরকারি বিবরণ

'আল-আমীন বার্তা' সম্বন্ধে কী বিশেষণ যে ব্যবহার করব? বার্তায় একটা দিক আছে। যেখান থেকে আমি পনেরো-কুড়ি জন ছাত্রছাত্রীর উপকার করেছিলাম। এপ্রিল ২০১৩ সংখ্যায় মহম্মদ মহসীন আলির নানান সরকারি-বেসরকারি বৃত্তির বিবরণ পড়ে প্রথম জানতে পারি মাইনরিটি স্কলারশিপ ছাড়াও কত ধরনের স্কলারশিপ দেওয়া হয়। বৃত্তি বিবরণের ওই চার-পাঁচটা পাতা খুলে আমাদের এলাকার ক্লাবঘরে টাঙিয়ে রেখেছিলাম। যারা যারা জানতে পেরেছিল, সবাই স্কলারশিপ পেয়েছে, অনেকে এখনও পায়। মার্চ ২০১৪ সংখ্যায় মহম্মদ মহসীন আলির আর-একটা লেখা 'কী পড়ব কোথায় পড়ব'। এতসব সরকারি কর্মভিত্তিক কোর্স যে মাঝারি মানের ছাত্রদের জন্য আছে, জানাই ছিল না। সবথেকে বড়োকথা, কত ছেলেকে যে বেপথ থেকে সঠিক দিশা দেখাবে এই লেখা। আমার বাড়িতেই দুজন শিক্ষার্থী আছে, যাদের পারফিউশন টেকনোলজি এবং ওটি অ্যাসিস্ট্যান্ট কোর্সে ভর্তি করাব ঠিক করেই নিয়েছি। আমার ধারণা, যাঁরাই বার্তার এই সংখ্যা হাতে পাবেন, তাঁদেরই বাড়ির ছেলেমেয়েরা তিন-চার বছর পর আর বেকার থাকবে না। ধন্যবাদ 'আল-আমীন বার্তা'কে।

জাহিদ হাসান
শ্রীরামপুর ওয়ালস হাসপাতাল, হুগলি

সমৃদ্ধ হয়েছি

আপনাদের পত্রিকা পেয়ে খুশি হয়েছি। অনেক অজানা কথা জানতে পেরে সমৃদ্ধ হয়েছি। বিশেষ করে কৃতী প্রাক্তনীদের কথা, প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা আর কী পড়ব কোথায় পড়ব। এই ধরনের পত্রিকা দ্বিমাসিক করাটাই সবদিক থেকে বাস্তবসম্মত। অভিভাবকদের কথা থাকা প্রয়োজন। থাকা দরকার অর্থদাতাদের বদান্যতার মর্মকথা। সাহিত্য পুরস্কার এখন থেকেই চালু করলে ভালো হয়। ছাত্রছাত্রীরাই ভাবী প্রজন্মের প্রধান হাতিয়ার বলেই, সৃজনশীলতার সব দিক বিচার করা দরকার। কাগজ ও মুদ্রণের মান বজায় থাকলে পত্রিকা অনেক দূর যাবে।

ড. সুরঞ্জন মিদ্দে
অধ্যাপক, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

দুটি সংশোধন

'আল-আমীন বার্তা'র একটা সংখ্যা পড়া হয়ে গেলেই অন্যটির জন্য আমরা অধীর আগ্রহে থাকি। যে-দিন ক্যাম্পাসে 'আল-আমীন বার্তা' দেওয়া হয়, কিছুক্ষণের জন্য সবাই সবকিছু (পাঠ্য বই) দূরে ফেলে 'আল-আমীন বার্তা'য় বুঁদ হয়ে থাকে। আজ পর্যন্ত যতগুলি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে আমাদের কাছে সবথেকে বেশি আকর্ষণীয় হল 'মধ্যবঙ্গের মধ্যমণি'। কারণ, এটিতে আমাদের অর্থাৎ পাথরচাপুড়ির কথা আছে। 'আল-আমীন বার্তা' পড়ে আমরা নিত্যনতুন, জানা-অজানা নানা সংবাদ পেয়ে থাকি। জানতে পারি বিভিন্ন ক্যাম্পাসের কথা, বিভিন্ন ছাত্রছাত্রীর সুপ্ত প্রতিভার কথা। তৃতীয় বর্ষে চতুর্থ সংখ্যায় পাথরচাপুড়ি ক্যাম্পাস পরিচিতিতে, কীভাবে জানি না, একটু ভুল থেকে গেছে। লেখা হয়েছে পাথরচাপুড়িতে মেয়েদের শাখা শুরু হয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণির চল্লিশ জন ছাত্রী নিয়ে। তথ্যটি হল পঞ্চম ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির একানব্বই জন ছাত্রী নিয়ে শাখাটি শুরু হয়েছিল। আর-একটি সংশোধন— 'আমাদের পাতা' বিভাগে 'পুষি' কবিতাটি দশম নয়, সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী জেসমিন খাতুনের লেখা।

জেসমিন জুলেখা
সুপারিন্টেন্ডেন্ট, পাথরচাপুড়ি গার্লস ক্যাম্পাস, বীরভূম

কিংবদন্তি নামে আমাদের একটা বিভাগ আছে। এ-পর্যন্ত চারজন খ্যাতনামা মানুষের সাক্ষাৎকার সেই বিভাগে প্রকাশিত হয়েছে। 'কিংবদন্তি' কথাটা অর্থে ও ব্যাপকতায় এত বিশাল যে, সব বিখ্যাত ব্যক্তির ক্ষেত্রে শব্দটি ব্যবহার করা যায় না। কোনো কোনো বিখ্যাত জন কিংবদন্তি হয়ে ওঠেন। এই সংখ্যায় আমরা একটি সাক্ষাৎকারভিত্তিক রচনা প্রকাশ করছি এক বাঙালি মহিলা সম্পর্কে। তিনি প্রায় নিরক্ষর। অথচ নিজের সৃষ্টির গুণে সারা ভারতে আজ পরিচিত। এমনকী ভারতের বাইরেও। পশ্চিমবাংলার বাঙালি মুসলমান নারীসমাজে এমন খ্যাতি স্বাধীনতার পর আর কেউ অর্জন করতে পারেননি। স্বাধীনতার আগেই-বা কতজন পেরেছিলেন?

দেখা যাচ্ছে, নিজেকে প্রকাশ করবার ভাষা অনেক। প্রথাগত শিক্ষা অর্জনের মাধ্যম এক বা একাধিক ভাষা। হতে পারে সে-ভাষা বাংলা বা ইংরেজি, হতে পারে অন্য ভাষা। ভাষা ছাড়া কোনোকিছুই শেখা যায় না। কিন্তু তার বাইরেও নিজেকে প্রকাশ করবার কিছু মাধ্যম আছে। যেমন, ছবি। যেমন, সংগীত। যেমন, খেলা। এই সংখ্যায় থাকছে তেমনই এক মহিলার কথা, সৃষ্টিশীলতায় যিনি ব্যতিক্রমী, অনন্যা। শাকিলা। শাকিলা সেখ। এমন এক শিল্পী, যিনি ছবির বিশেষ এক মাধ্যম কোলাজ তৈরি করেই দেশ জুড়ে খ্যাতি এবং প্রচুর পুরস্কার পেয়েছেন। আল-আমীন মিশন পিছিয়ে-পড়া সমাজের যেসব হতদরিদ্র পরিবারের মেধাবী ছাত্রছাত্রী খোঁজে আর আশ্রয় দেয় আর লালন করে, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার তেমনই দরিদ্র পরিবার থেকে উঠে এসে শাকিলা সেখ নিজের প্রতিভার জোরে আজ ভারতীয় শিল্পজগতের কেন্দ্রে পৌঁছেছেন। আমরা তো তাঁকে কিংবদন্তি বলতেই পারি।

এই সংখ্যায় তিন বিভাগে আল-আমীনের তিন ছাত্রের কথা রয়েছে। একজন ডক্টর অফ মেডিসিন করছে, একজন কলকাতা মেডিকেল কলেজে এ-বছরই ভর্তি হয়েছে, অন্যজন পড়ছে ক্লাস সিক্সে। লক্ষ করার বিষয়, তৃতীয় জনও ডাক্তার হতে চায়। মনে হতে পারে, আল-আমীনের সব শিক্ষার্থীই প্রথমত ডাক্তার হতে চায়। কেউ-বা ইঞ্জিনিয়ার। বাংলার সংখ্যালঘু সমাজের এই উচ্চাশা-প্রবণতা বজায় রেখেও আমাদের ভাবতে হবে উচ্চতর অন্য শাখাগুলোর কথা। যেমন প্রশাসনিক পদে যাওয়ার শিক্ষা, যেমন নানা বিষয়ে উচ্চতর গবেষণা। মানুষের সংস্পর্শে থাকার, বৃহত্তর সমাজের জন্যে কিছু করবার এই সুযোগগুলোও অর্জন করতে হবে। আশা করি, আমাদের সমাজ এসব নিয়ে ভাববে।

অভাব-ভাবনা থাকলে তবেই সেটি পূরণ করবার মানসিকতা তৈরি হয়। তাই, এত দূর এগিয়ে এসে এখন আমরা অভাব বোধ করছি শিক্ষা সংস্কৃতি ও সমাজভাবনা সংক্রান্ত একটি প্রকাশনা সংস্থার। এই অভাব পূরণের দায়িত্বও আল-আমীন নিতে চায়, যেমন অতীতে বহু ক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় নিয়েছে। সবার সহযোগিতা পেলে সে-কাজেও আমরা সফল হতে পারব ইনশাআল্লাহ্।

একাধিক কারণে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর সংখ্যাটি যথাসময়ে প্রকাশ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। অথচ, সময় তো কারো জন্য থেমে থাকে না। এদিকে নভেম্বর-ডিসেম্বর সংখ্যা প্রকাশের সময় এগিয়ে আসছিল। তাই পত্রিকার কলেবর একটু বাড়িয়ে বাধ্যত এটিকে যুগ্ম সংখ্যার রূপ দিতে হল। প্রথম সংখ্যা থেকেই পাঠক-পাঠিকার প্রশ্রয় আমরা পেয়ে আসছি। আশা করি, সেই প্রশ্রয়পূর্ণ হাতে এই যুগ্ম সংখ্যাটিও তাঁরা তুলে নেবেন।

জন্মেই কেউ কৃতী হয়ে যান না। সাফল্যের চূড়ায় উঠতে প্রতি পদক্ষেপে ঘাম ঝরে। অনেক অপমানও জোটে স্বপ্নের দরজা খোলার জন্যে। কেউ পারেন, কেউ পারেন না। যাঁরা পেরেছেন, সেইসব কৃতী মানুষকে নিয়ে এই পাতায় থাকছে একটি করে সাক্ষাৎকারভিত্তিক লেখা। তাঁদের প্রতি এই আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য। এই সংখ্যায় নিঃসঙ্গ একক এক কোলাজশিল্পী।

রূপকথার

একরাম আলি

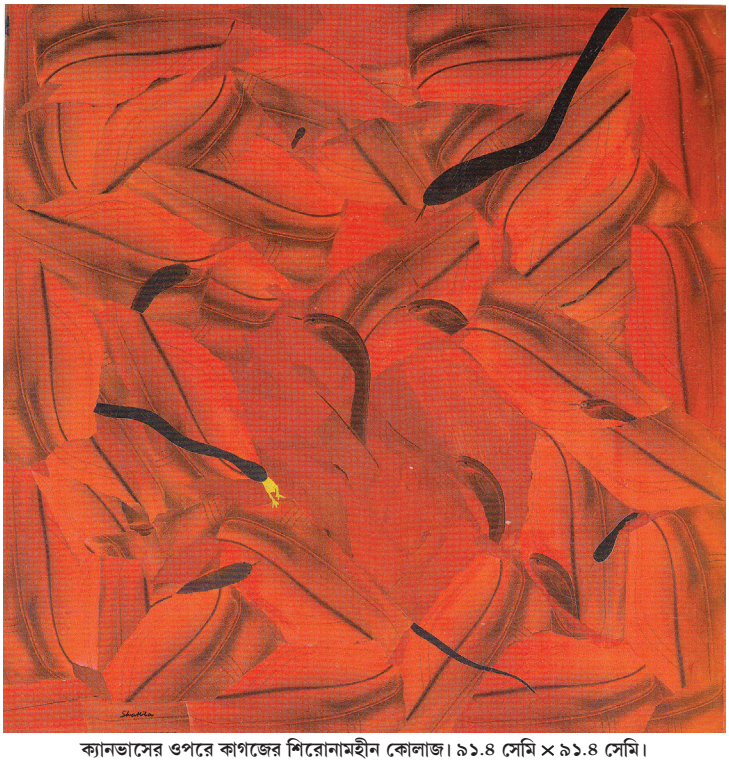

ক্যানভাসের ওপরে কাগজের শিরোনামহীন কোলাজ। ৯১.৪ সেমি × ৯১.৪ সেমি।

আমাদের গন্তব্য এমন একটি অখ্যাত গ্রাম, যে-গাঁয়ের নামও আগে কোনোদিন শুনিনি, যাকে বলে অশ্রুতপূর্ব— নোরগ্রাম। গাড়ি দক্ষিণমুখো ছুটেই চলেছে। ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাসের লেজের ডগা এক সময় ফুরিয়ে গেল। ফুরিয়ে গেল কলকাতার ক্রমবর্ধমান শহরতলির রেশও। দু-পাশে সবুজ বাড়ল। তবু শেষ কি আর আছে! তারপর আছে কামালগাজি, সোনারপুর, বারুইপুর ছাড়াও সবুজে ঘেরা ছোটোখাটো দু-একটি জনপদ। তারপর এসে গেল সূর্যপুর। শুরু হল আরও নিবিড় গাছপালা। সঙ্গী মহসীন (মহম্মদ মহসীন আলি) তো ছিলেনই, সূর্যপুরে উঠেছেন রাজীবও (সেখ রাজীব হাসান)। যখন রোদ বেশ চড়া, গনগনে আর ভ্যাপসা গরমে গাড়ি তেতে উঠেছে, রাজীব বললেন, এসে গেছি।

মূল রাস্তা ছেড়ে গাড়ি বাঁক নিল ডানদিকে, সরু আর নড়বড়ে কাঁচারাস্তায় এবং দাঁড়িয়ে পড়ল এক নবনির্মিত ফটকের সামনে, যার ডানদিকে পাঁচিলের বাইরে একটি করমচা গাছ নুয়ে পড়েছে থোকা থোকা রঙিন করমচার ভারে। গেট খুলে দিলেন অতি সাধারণ চেহারার আকবর সেখ। পরনে লুঙ্গি আর সাদামাটা শার্ট। তিনিই গৃহকর্তা। সামনে একতলা বাড়ি, দোতলার কাজ থমকে আছে। পাশের উঠোনে দুটি আম গাছ ফলে ভর্তি। বারান্দায় গৃহকর্ত্রী স্বয়ং। আটপৌরে ঢঙে শাড়ি, হাতে কাচের চুড়ি। এতই শান্ত, যেন পৃথিবীর কোথাও কোনো তাড়া নেই। চোখেমুখে বিষাদের স্থায়ী ছায়া, যা হয়তো স্বভাববশত, যা হতেও পারে জগৎ আর জীবন থেকে তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ অর্জন। শাকিলা। একটু বড়ো করে বললে— শাকিলা সেখ। হ্যাঁ। এই ছোট্ট নামটুকুতেই শিল্পের জগতে তিনি আসমুদ্রহিমাচল বিখ্যাত।

আকবর সাহেব ব্যস্ত হয়ে পড়লেন আমাদের বসার ব্যবস্থা করতে। আর, শাকিলা অতিথিদের আপ্যায়নের জন্যে সমস্তকিছুই করে যাচ্ছিলেন নিঃশব্দে। দেওয়ালে বলরাজ পানেসরের একটি ছবি, যাঁকে সর্বদা 'বাবা' নামেই ডাকেন শাকিলা।

আমরা বসেছিলাম তাঁর বাড়ির বসবার ঘরে, যেটি শহুরে বাড়িতে ওপেন স্পেস হিসেবেই ব্যবহৃত হয়।

নোরগ্রাম এই নামটি কেউ শোনেওনি কোনোদিন। কিন্তু এখন কলকাতা থেকে চৌষট্টি কিলোমিটার দূরের এই গণ্ডগ্রামটিকে একটি অতি দরিদ্র, প্রথাগত শিক্ষাহীন মহিলা পৌঁছে দিয়েছেন বিশ্বের শিল্পজগতে। সে এক রূপকথার গল্প, এই সময়ের ভারতবিখ্যাত এক শিল্পীর একক সংগ্রামের কাহিনি।

তাহলে সরাসরি শুনুন, তাঁরই মুখে, যা তিনি বলছিলেন থেমে থেমে, কিন্তু স্পষ্ট উচ্চারণে। কণ্ঠস্বরে সব সময় অজানা এক কষ্টের ছাপ। যখন হাসছিলেন, সে-হাসিও শব্দহীন।

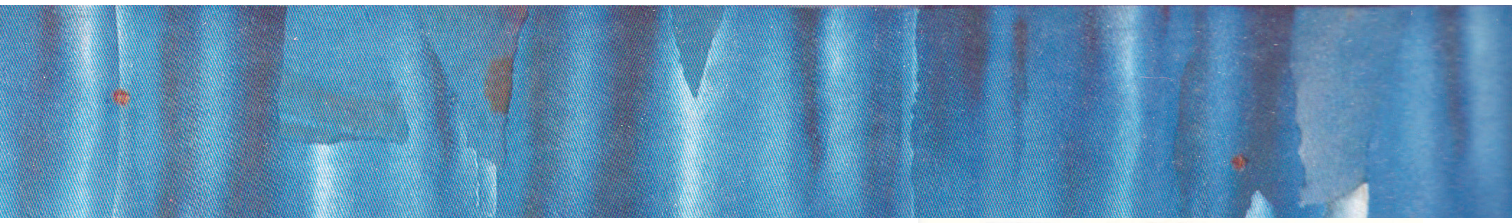

শাকিলা

শাকিলা সেখ।

ক্যানভাসের ওপরে কাগজের শিরোনামহীন কোলাজ।
৮৬.৩ সেমি × ৮৬.৩ সেমি।

ক্যানভাসের ওপরে কাগজের শিরোনামহীন কোলাজ।
৯৩.৯ সেমি × ৮৩.৮ সেমি।

আমি শাকিলা

আমরা তিন ভাই, এক বোন। আব্বার এক দোকান ছিল কলকাতায়। আব্বার আরেক সংসার ছিল বাংলাদেশে। আমার দুই ভাইকে নিয়ে যখন আব্বা বাংলাদেশে চলে যান আমাদের ছেড়ে, আমি তখন পাঁচ-ছ বছরের। আমার এক ভাই আর আমাকে নিয়ে মা পড়েন বিপদে। কলকাতার দোকান বেদখল হয়ে যায়। কী করে দিন চলবে? উপায় না-পেয়ে মা তখন কলকাতার তালতলায় ফুটপাথে বসেন সবজি বিক্রি করতে। আমাকে কার কাছে রেখে যাবেন? তাই সঙ্গে যেতাম আমিও। ফুটে খেলা করতাম। বসে থাকতাম চুপ করে। বাজারে আসতেন একটা লোক, একটা-দুটো সবজি কিনতে। সঙ্গে থাকত ব্যাগ। তাতে লজেন্স, বিস্কুট— এইসব বাচ্চাদের খাবার। রাস্তায় বাচ্চা পেলেই তাদের দিতেন। সবাই তাঁর চেনা। নতুন আমাকে দেখে লজেন্স দিতে গেলে আমি নিলাম না। অচেনা লোকের কাছ থেকে কিছু নিতাম না বলেই।

কয়েক দিন এরকম চলল। আমরা টের পাইনি যদিও, ততদিনে আমাকে বেশ পছন্দ হয়ে গেছে তাঁর। একদিন মাকে বললেন, মেয়েটাকে স্কুলে ভর্তি করে দাও। মায়ের তখন সবজি বেচে সুবিধে হচ্ছিল না। অভ্যেস নেই তো, হিসেব ঠিক রাখতে পারতেন না। উনি (পাশে বসে-থাকা আকবর সাহেবকে দেখিয়ে) তখন মাকে বললেন ডিমের ব্যাবসা করতে। পয়সাকড়ির হিসেব উনিই করে দেবেন। এই অবস্থা তখন। স্কুলে ভর্তি হব কী, খাওয়ারই পয়সা নেই।

একদিন বাজার করতে এসে সেই লোকটিই বললেন, শাকিলা আমার মেয়ে। ওর লেখাপড়ার দায়িত্ব আমার। এই বলে কলিন স্ট্রিটের এক স্কুলে আমায় ভর্তি করে দিলেন। এইভাবে জানলাম উনার নাম। তবে আমি কোনোদিন সেই নাম ধরে ডাকিনি। 'বাবা' বলেই উনাকে ডেকেছি। উনি

আর নেই (বলতে বলতে চুপ, মাথা নীচু, চোখে জল আড়াল করার আপ্রাণ চেষ্টা।)। তবু যতদিন বাঁচব, উনিই আমার বাবা (এই ছ-টি মাত্র শব্দ উচ্চারণ করতে গিয়ে বেশ কয়েক বার থামতে হল শাকিলাকে। কান্নাই থামিয়ে দিচ্ছিল তাঁকে বার বার।)।

ওয়াইএমসিএ হস্টেলে থাকতেন। সেদ্ধ সবজিই ছিল তাঁর খাদ্য। আর ছবি আঁকতেন। বহু মানুষ আসতেন তাঁর কাছে। বুঝতাম, মানী লোক। সেই বাচ্চা অবস্থাতেই আমাকে ধরিয়ে দিলেন ড্রইংয়ের টুকটাক জিনিস। মনে আছে, দুটো ছবি এঁকে বাবাকে দিয়েছিলাম। খুব পছন্দ হয়েছিল বাবার। পত্রিকায় ছাপাও হয়েছিল।

তবে লেখাপড়া হয়নি আমার। অত দূর থেকে প্রতিদিন স্কুলে সময়মতো আসা সম্ভব ছিল না ওইটুকু বয়সে, আর লেখাপড়াকে অত গুরুত্ব দেওয়ারও পরিস্থিতি ছিল না। বাবা রাগ করেছিলেন খুব, তবু উপায় ছিল না।

এইরকম ভালোমন্দে কষ্টে কেটে গেল কয়েক বছর। আস্তে আস্তে বাবার সঙ্গে দেখাশোনাও কমে আসছিল। উনি কত বড়োমানুষ! সব সময় বিরক্ত করা কি চলে? কী করে যেন বড়ো হয়ে গেলাম। বারো বছর বয়সে বিয়ে হয়ে গেল। বাবা জানতেও পারলেন না।

খুব রেগে গিয়েছিলেন। মাকে বলেছিলেন, আমার মেয়ের বিয়ে হল, আমিই জানলাম না! বিয়ে তো হল। ওরা খাবে কী? চলবে কী করে? তারপর নিজেই বুদ্ধি দিলেন। সঙ্গে দিলেন একগাদা খবরের কাগজ। বললেন, এই দিয়ে ঠোঙা তৈরি করো। বেচে সংসার চালাও।

কলকাতা আসা-যাওয়ার নতুন হিল্লে হল। বাবার কাছে কাগজ নিতে আসি, তখন তৈরি ঠোঙা নিয়ে আসি বিক্রি করার জন্যে। বাবা একদিন বললেন, ছবির একটা একজিবিশন হচ্ছে। আজ শেষ দিন। দেখতে যাবে? বললাম, যাব।

গেলাম। অ্যাকাডেমিতে। ঘুরে ঘুরে ছবি দেখছি। দেখা যখন হল, বাবা জানতে চাইলেন, কোন ছবিটা ভালো লাগল। একটা ছবি দেখিয়ে বললাম, এইটা বেশি ভালো। আরও কয়েকটা ভালো লেগেছিল। সেগুলোও দেখালাম। বাবা বললেন, তোমার চোখ তো খুব ভালো! ওইটাই প্রথম পুরস্কার পেয়েছে। আর, এগুলো বিক্রি হয়ে গেছে।

সে-দিন বাবা অনেকক্ষণ আমার ছবি দেখার প্রশংসা করেছিলেন আর চুপ করে ছিলাম আমি। শেয়ালদা থেকে ট্রেনে বাড়ি ফিরছি, সারা রাস্তা চুপ। উনি (আকবর সেখ) জানতে চাইলেন, কী হয়েছে? কিছু না। শরীর খারাপ? না। তাহলে? চুপ।

উনি জানবেন কী করে, আমি কী ভাবছি তখন? আমি তখন ভাবছি, ছবি আমাকে আঁকতেই হবে। কিন্তু আঁকব যে, আমার তো রং কেনার পয়সা নেই। ব্রাশ নেই। কাগজ, ক্যানভাস নেই। সেসব তো অনেক টাকা দাম। পাব কোথায়? তাহলে আঁকব কী করে? আমার আছে ঠোঙা বানাবার খবরের কাগজ, ম্যাগাজিন। তাতে তো রং আছে। খুঁজতে হবে। আঠাও আছে। সেইসব কাগজ শক্ত কোনো কাগজে সেঁটে আমিও তো রং আনতে পারি। হয় না? বাবা ক্যানভাসে করেন। আমি অন্য কিছুতেও তো করতে পারি। সূর্যপুর স্টেশনে নেমে ভ্যানরিকশায় উঠে বাড়ি আসতে আসতে রাস্তার দিকে তাকিয়ে বললাম, যে-দিন বাবার কাছে যাবে, দুটো পিচবোর্ড নিয়ে এসো তো।

শুনে উনি হেসে জানতে চাইলেন, পিচবোর্ড? কী হবে?

রেগে গেলাম, বলছি নিয়ে এসো। ছবি আঁকব।

উনি আরও হেসে উঠলেন, ছবি? তুমি আঁকবে?

আমি তখনও রাস্তার দিকে তাকিয়ে। বললাম, হ্যাঁ।

তার পরের যে-দিন গেলেন কলকাতা, বাবা ওঁর মুখে শুনে খুব খুশি হয়েছিলেন। দিয়েছিলেন জোগাড় করে।

দুটো কোলাজ করেছিলাম। যা চিনি, দেখে আসছি ছোটোবেলা থেকে, সেইসব কোলাজে ছিল। লঙ্কা, অন্য সবজি। বাবা দেখে খুব খুশি। বার বার জানতে চাইছিলেন, এসব তুমি করেছ? তুমি?

যাঁরা সে-দিন ছিলেন বাবার কাছে, তাঁদের দেখাচ্ছিলেন, দেখো, শাকিলা করেছে। আমার মেয়ে।

আমার ভেতরটায় কী যে তখন হচ্ছিল, জানি না। বলতে পারব না। তারপর আর পিচবোর্ডে কোলাজ করতে হয়নি। বাবা ক্যানভাস জোগাড় করে দিতেন। আর শুধু একটাই কথা বলতেন, যা খুশি আঁকো। শুধু দেখবে, প্রতিটি ছবি যেন আলাদা হয়। দুটো মানুষ একরকম হয় না, দুটো ছবি একরকম কী করে হবে?

শাকিলার বাবা

বলদেব রাজ পানেসর। পরিচিত মহলে ছিলেন সবার 'পানেসরজি'। জন্ম ১৯২৭-এ, পাঞ্জাবে। মৃত্যু ৬ জানুয়ারি, সোমবার, ২০১৪। লেখাপড়ায় ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। কলকাতায় আসেন ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটে পড়তে এবং পাশ করবার পর যোজনা দপ্তরে উচ্চপদে চাকরিতে ঢোকেন। ছিলেন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের ঘনিষ্ঠ। ছবি আঁকা তাঁর অবসর সময়ের কাজ ছিল এবং প্রথাগত শিক্ষাও ছিল না। তবু, কলকাতার শিল্পজগতে তাঁর ছবি উচ্চ সমাদর পায়। ১৯৭৪-এ 'সোসাইটি অফ কনটেম্পোরারি আর্টিস্ট' নামের বিখ্যাত গ্রুপের সদস্য হন। এই গ্রুপের অন্য সদস্যরা ছিলেন গণেশ পাইন, বিকাশ ভট্টাচার্য, সুনীল দাশের মতো ভারতখ্যাত সব চিত্রশিল্পী। তবু, তাঁর ছবি বৃহত্তর সমাজে যোগ্য সমাদর পায়নি। ছিলেন চিরকুমার। থাকতেন এস এন ব্যানার্জি রোডে, ওয়াইএমসিএ হস্টেলের এক ছোট্ট ঘরে। তাঁর সারা জীবনের উপার্জন খরচ করেছেন সেবামূলক কাজে। শাকিলাকে পাঁচ-ছ বছর বয়স থেকে নিজের

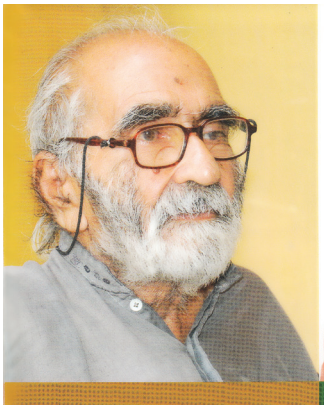

বলদেব রাজ পানেসর।

শাকিলা সেখ।

স্বামী, পুত্র, কন্যা ও নাতির সঙ্গে শাকিলা সেখ।

মেয়ে হিসেবেই দেখেছেন। আর আজ সারা দেশ এই সন্তসম মানুষটিকে চেনে শাকিলার গুরু হিসেবে। শাকিলা নিজে বলেন— বাবা।

শাকিলার সঙ্গে কথাবার্তা

● কোলাজশিল্পী আপনি। ছবির এই বিশেষ ফর্মটি কত দিনের এবং কোথায় এর উৎপত্তি?

■ জানি না।

● এটি ফরাসি শব্দ। বানান Coller। মানে হল— আঠা দিয়ে জোড়া দেওয়া। ব্রাক আর পিকাসো এই ফর্মে কাজ করে কোলাজকে বিখ্যাত করেন। কিন্তু আপনি যে জানেন না, এটা ভালো লাগল। না-জেনেও এমন ছবি সৃষ্টি করা যায় তাহলে!

■ আমার তো উপায় ছিল না। রং, তুলি, ক্যানভাস ছিল না। তাই এভাবেই শুরু করেছিলাম।

ক্যানভাসের ওপরে কাগজের শিরোনামহীন কোলাজ। ৯১.৪ সেমি × ৯১.৪ সেমি।

ক্যানভাসের ওপরে অ্যাক্রিলিকে আঁকা শিরোনামহীন ছবি। ৬০.৯ সেমি × ৬০.৯ সেমি।
শিল্পী: বলদেব রাজ পানেসর।

বলদেব রাজ পানেসর। পরিচিত মহলে ছিলেন সবার 'পানেসরজি'। জন্ম ১৯২৭-এ, পাঞ্জাবে। মৃত্যু ৬ জানুয়ারি, সোমবার, ২০১৪। শাকিলাকে পাঁচ-ছ বছর বয়স থেকে নিজের মেয়ে হিসেবেই দেখেছেন। আর আজ সারা দেশ এই সন্তসম মানুষটিকে চেনে শাকিলার গুরু হিসেবে। শাকিলা নিজে বলেন— বাবা।

● পড়তে পারেন?

■ (মাথা সব সময়েই অবনত) না। একটু-একটু।

পাশে বসা আকবর সেখ: নাম সই করতে পারে। বাংলায় আর ইংরেজিতে।

● দেশে-বিদেশে আপনার ছবি যায় প্রদর্শনীতে। সেসব জায়গা সম্বন্ধে জানেন কিছু?

■ দিদি জানেন। তিনিই সব ব্যবস্থা করেন। তিনি না থাকলে আমার ছবি এত জায়গায় যেত না।

● দিদি?

■ রাখী সরকার। সীমার ডিরেক্টর। দিদি বলেন, তুমি মন দিয়ে ছবি আঁকো। বাকিটা আমরা দেখব। দিদি যখন এই কথা বলেন, বাবাকে জানাই। বাবা বলেন, এর থেকে ভালো কিছু হয় না। একজিবিশনের ব্যাপারটা তুমি উনাদের ওপর ছেড়ে দাও। তুমি শুধু ছবি আঁকো। সেই থেকে আমার সব ছবি সীমার তত্ত্বাবধানে।

● এখন তো সীমাতেই একজিবিশন চলছে। গেছেন একদিন?

■ হ্যাঁ। কাল আবার যাব। উনারা যেতে বলেছেন।

● কীভাবে যান এখান থেকে?

■ সামনের রাস্তা থেকে অটো ধরি। বারুইপুর স্টেশনে যাই। সেখান থেকে

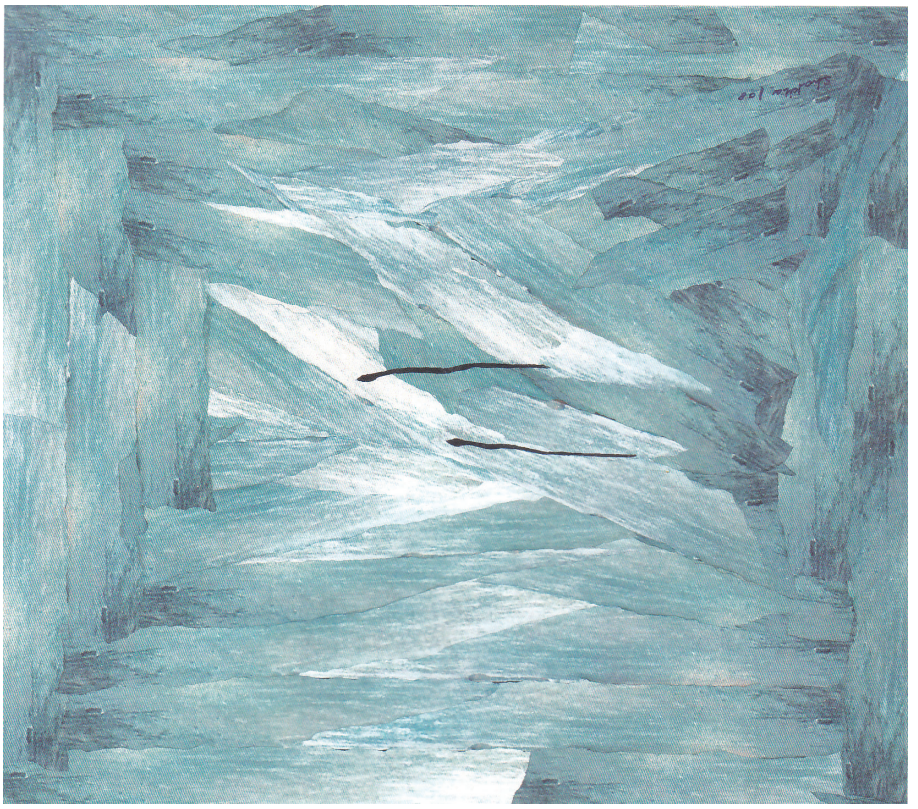

ক্যানভাসের ওপরে কাগজের শিরোনামহীন কোলাজ। ৯১.৪ সেমি × ৯১.৪ সেমি।

রাখী সরকার। সীমার ডিরেক্টর। দিদি বলেন, তুমি মন দিয়ে ছবি আঁকো। বাকিটা আমরা দেখব। দিদি যখন এই কথা বলেন, বাবাকে জানাই। বাবা বলেন, এর থেকে ভালো কিছু হয় না। একজিবিশনের ব্যাপারটা তুমি উনাদের ওপর ছেড়ে দাও। তুমি শুধু ছবি আঁকো। সেই থেকে আমার সব ছবি সীমার তত্ত্বাবধানে।

ট্রেনে বালিগঞ্জ। স্টেশন থেকে অটোতে সীমা গ্যালারি। ফেরার সময় ওইটুকু আর অটোতে উঠি না। গ্যালারি থেকে হেঁটে স্টেশন চলে আসি।

● কলকাতার বাইরে কোথাও গেছেন?

■ দিল্লি গেছি। সংস্কৃতি পুরস্কার নিতে।

● আর কোথাও না?

■ পাটনা। নীতীশ কুমারজি একটা পুরস্কার দেবেন। যাওয়ার সময় বাবার খুব অসুখ করল। (আকবর সাহেবকে দেখিয়ে) উনাকে বললাম, এ-সময় বাবাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না। উনাদের বলে দাও। তো, পাটনা থেকে বার বার ফোন আসে। সবাইকে বলে দিয়েছি, তুমি আসছ। আরও অনেকে আসছেন। সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। এ না গেলে অসম্মান হবে। আমি বলি, যেতে আমি পারব না। বাবা ভালো নেই। উনারা কিছুতেই ছাড়লেন না। বললেন, দুটো দিনের ব্যাপার। না এলে খারাপ দেখায়। তখন বললাম, রাতে ট্রেন, সাড়ে আটটায়। একটু আগে বেরিয়ে বাবাকে দেখে, তবেই যাব। সঙ্গে বড়ো ছবি ছিল পাটনার জন্যে। তাই যাওয়ার সময় দেখা হল না। সকালে পৌঁছেছি পাটনায়। স্টেশনে উনারা নিতে এসেছেন। গিয়ে কিছু খেয়েদেয়ে যেতে হবে ওয়ার্কশপে। মন আমার পড়ে আছে কলকাতায়। হঠাৎ ফোন। উনি ধরলেন। কিছু কথা শুনেই বললেন, যাঃ! আমি বলি, কী হল? বললেন, বাবা নেই। আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। কোথাও যাব না। ফেরার ব্যবস্থা করো। কলকাতায় বলো, আমি যেন বাবাকে দেখতে পাই। পাটনার আয়োজকরা কথাবার্তা বলে বিকেল সাড়ে তিনটের প্লেনে ফেরার ব্যবস্থা করলেন। যখন কেওড়াতলা শ্মশানে পৌঁছোই, শুনলাম, উনারা আমাকে একবার দেখাবার জন্যে এক ঘণ্টা অপেক্ষা করে আছেন। (কথা থামল, থামল শাকিলার কান্নাও।)।

প্রদর্শনীকক্ষে বিশিষ্টদের সঙ্গে পানেসর ও শাকিলা।

● (একটু নীরবতার পর) কোলাজের জন্যে কী করে কাগজ খুঁজে বার করেন। কাগজ ছেঁড়েন কীভাবে?

■ (অনেকক্ষণ চুপ থাকার পর) পেয়ে যাই।

● কোনটা আগে পান, কাগজটা? না, যে-ছবিটা আঁকবেন, সেটা?

ক্যানভাসের ওপরে কাগজের শিরোনামহীন কোলাজ। ৭৩.৬ সেমি × ৫৯.৬ সেমি।

ক্যানভাসের ওপরে কাগজের শিরোনামহীন কোলাজ। ৯১.৪ সেমি × ৯১.৪ সেমি।

তথ্যপঞ্জি

জন্ম: ১৯৬৯।
জন্মস্থান: মগরাহাট, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা।
বাবা: আবদুল হাই সেখ।
মা: জাইরুন বিবি।
বিবাহ: ১৯৮১।
স্বামী: আকবর সেখ।
সন্তান: এক মেয়ে, দুই ছেলে।
শিক্ষা: প্রথাগত কোনো শিক্ষার সুযোগ পাননি— না লেখাপড়ার, না ছবি আঁকার।
কর্ম: চিত্রশিল্পী, মাধ্যম— মূলত কোলাজ।

একক প্রদর্শনী

১৯৯১: চিত্রকূট আর্ট গ্যালারি, কলকাতা।
১৯৯৪: সীমা (সেন্টার অফ ইন্টারন্যাশনাল মডার্ন আর্ট), কলকাতা।
১৯৯৫: লাফায়েত আর্ট গ্যালারি, প্যারিস (ব্যবস্থাপক: সীমা, কলকাতা।)।
১৯৯৯: সীমা, কলকাতা।
২০০৩: ললিতকলা অকাদেমি, নতুন দিল্লি।
২০০৮: সীমা, কলকাতা।

■ জানি না।

(এতক্ষণ মিটিমিটি হাসছিলেন আকবর সাহেব। এবার বলেন— ওটা সাধনার ব্যাপার। কাগজ যখন ছেঁড়ে, সে কাগজ ধরে ক্যানভাসের সামনে বসেই থাকে। বসেই থাকে।)

● এবার প্রসঙ্গ পালটাই। আল-আমীন মিশনে কি গেছেন আপনি? এই সূর্যপুরেই একটা ক্যাম্পাস আছে। মিশনের। জানেন?

■ (এবার স্বাভাবিক গলায়) গেছি। খুব ভালো লেগেছে। সে-দিন আমাদের একজিবিশনে যাওয়ার ছিল। সেখান থেকে ফিরতে দেরিও হয়েছিল। ছেলেরা এক ঘণ্টা অপেক্ষা করার পরও আমাদের নিয়ে যেরকম আগ্রহ দেখিয়েছিল, সেটা মনে থাকবে। ছেলেরা চাঁদা তুলে আমার জন্যে উপহার কিনে রেখেছিল। কিছুই না। তবু সেটা বাড়িতে এনে কী আনন্দ পেয়েছিলাম, আমিই জানি।

● এইসব ছেলেমেয়েদের কিছু শেখানোর ইচ্ছে হয় না? আপনি পশ্চিমবাংলার সংখ্যালঘু এবং পিছিয়ে-পড়া সমাজের একমাত্র মহিলা, যিনি ছবি এঁকে সারা ভারতে পরিচিতি পেয়েছেন। একটা দায়িত্ব তো আছে আপনার এদের শেখানোর। সময় পেলে এদের একটু সঙ্গ দেওয়ার। ভেবেছেন কখনও?

■ ওদের সঙ্গ আমার খুব ভালো লেগেছে। ওরা পড়াশোনায় খুবই ভালো। নানা বিষয়ে জানার আগ্রহ ওদের। সময় পেলেই আমি যাব। ওদের শেখাতে পারলে আমারই আনন্দ হবে। আজ ওরা ছোটো। একদিন ওই ছেলেমেয়েরাই বড়ো হবে। আমি চাই আল-আমীন মিশনের ছেলেমেয়েরা নিজের সমাজের আর দেশের মুখ উজ্জ্বল করুক।

যৌথ প্রদর্শনী (নির্বাচিত কয়েকটি)

১৯৯০—১৯৯৮: অ্যানুয়াল অল ইন্ডিয়া একজিবিশন, অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস, কলকাতা।
১৯৯১—১৯৯২: সাউথ-সেন্ট্রাল জোন কালচারাল সেন্টার অল ইন্ডিয়া একজিবিশন, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র।
১৯৯২: কনটেম্পোরারি ইন্ডিয়ান আর্ট, ভারতভবন, ভোপাল।
১৯৯২—১৯৯৪: ন্যাশনাল একজিবিশন, ললিতকলা অকাদেমি, নতুন দিল্লি।
১৯৯৫: একজিবিশন অফ কনটেম্পোরারি আর্ট, নিউ ইয়র্ক।
১৯৯৮: কনটেম্পোরারি ইন্ডিয়ান আর্ট, সিঙ্গাপুর।
২০০০: হ্যানোভার, জার্মানি।
২০০১: আর্ট অফ বেঙ্গল: পাস্ট অ্যান্ড প্রেজেন্ট ১৮৫০—২০০০, সীমা, কলকাতা। ন্যাশনাল গ্যালারি অফ মডার্ন আর্ট, মুম্বাই।
২০১১: ইন্ডিয়া মিটস ভারত, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি।
২০১৪: সীমা, কলকাতা।

উল্লেখযোগ্য পুরস্কার

১৯৯১: রাজ্যপাল প্রদত্ত স্বর্ণপদক, কলকাতা।
১৯৯২: ইউনেস্কো পুরস্কারের জন্য মনোনীত।
১৯৯৩—১৯৯৫: ন্যাশনাল স্কলারশিপ, ভারত সরকার, নতুন দিল্লি।
২০০০: রাজস্থান জাতীয় পুরস্কার, রাজস্থান ললিতকলা অকাদেমি, জয়পুর।
২০০২: সংস্কৃতি পুরস্কার, নতুন দিল্লি।
২০০৬: চারুকলা পুরস্কার, পশ্চিমবঙ্গ। ■

বলদেব রাজ পানেসরের নামোল্লেখিত ছবি ছাড়া সমস্ত ছবিই (কোলাজ) শাকিলা সেখের। সৌজন্যে সীমা, কলকাতা।

হাঁটি-হাঁটি, পা-পা। হাওড়ার এক অখ্যাত গ্রামে আল-আমীনের টলোমলো পায়ে হাঁটার সেই শুরু। আজ সে ছড়িয়ে পড়তে চাইছে পূর্ব ভারতের রাজ্যে রাজ্যে। আল-আমীন মিশনের ইতিহাসের সঙ্গে অঙ্গীভূত হয়ে আছে অগণিত ছাত্রছাত্রীর স্বপ্ন আর শ্রমের কাহিনি। তেমনই এক ছাত্রের ধারাবাহিক স্মৃতিকথা, যে-কথায় আছে আল-আমীনের আর সেই শিশু-ছাত্রটির একই সঙ্গে বেড়ে-ওঠার ব্যক্তিগত বিবরণ।

আমার মিশন মিশনের আমি

রোহণ কুদ্দুস

চতুর্থ কিস্তি

জহুর ভাই অ্যান্ড কোম্পানি

এ-বার যাদের কথা বলব, তারা আমাদের সমান্তরালেই মিশনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছে। আফশোস, এদের মধ্যে কেউ কখনও তাদের স্মৃতিকথা লিখবে না। লিখলে, সেটা একটা রোমাঞ্চকর সাহিত্যের দৃষ্টান্ত হয়ে থাকতে পারত। আমি মিশনের রান্নাঘরের লোকজনের কথা বলছি আর কী।

যেকোনো হস্টেল বা মিশনে গিয়ে ছেলেমেয়েদের যেটা প্রথম অসুবিধা হয়, সেটা হল সেখানকার খাওয়াদাওয়া। আমাদের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম কিছু হয়নি। কিন্তু আগে থেকেই এ-ব্যাপারে মানসিক প্রস্তুতি ছিল আমার। জানতাম এটা হস্টেল, এখানে এরকমই হবে। যেহেতু একটু-আধটু জ্ঞানগম্যি হয়েছিল তখন, তাই নিজেকে সান্ত্বনা দিতাম এই ভেবে যে, আমাদের দেশে বহু মানুষ দু-বেলা পেট পুরে খেতে পায় না। কলকাতাতেই দেখেছি, আস্তাকুঁড়ে ফেলে যাওয়া খাবারের প্যাকেট তুলে নিচ্ছে মানুষ। আমাদের জন্যে তবু তো আহারযোগ্য কিছু পরিবেশিত হচ্ছে দু-বেলা। এটা নেহাত কম বড়ো ব্যাপার নয়।

মিশনে খাওয়াদাওয়া হত দিনে পাঁচ বার। সকালে পিটি করে বা আরবি পড়ে এসে চা আর রুটি। এই খাবারটা আমার বেজায় অপছন্দের ছিল। কাঁচা রুটি আর চা খেলে বেজায় অম্বল করত। প্রতিদিন সকালে খাওয়ার মতো যথেষ্ট পরিমাণে জেলি-বাটার-বিস্কুট আমার ট্র্যাঙ্কে মজুত থাকত যদিও। কিন্তু তবু আর-সবার দেখাদেখি একতলা থেকে নিজের নিজের গ্লাসে চা আর পাঁউরুটি নিয়ে নিজের নিজের রুমে চলে আসতাম। সুকুমার রায় বর্ণিত ঝোলাগুড় দিয়ে পাঁউরুটি খাওয়ার সৌভাগ্য কখনও না হলেও, শীতের সকালে জেলি-পাঁউ বেজায় ভালো লাগত।

এরপরের খাওয়ার সময় ছিল সকাল দশটা। এগারোটায় ক্লাস শুরু হওয়ার আগে ভাত, ডাল আর কোনো একটা সবজি। সবজিটা প্রায়দিনই খেতে বাজে হত। কিন্তু যে-দিন আলুভাতে হত, সে-দিন, আহা! ভাবলে এখনও জিভে জল আসে। বড়ো বড়ো তাল করে আলুমাখা ভাতের সঙ্গে দেওয়া হচ্ছে। সঙ্গে গরম ডাল, যার ঘনত্ব জলের থেকে সামান্য বেশি। কিন্তু অমৃতের মতো আলুভাতের সঙ্গে তা কিছুমাত্র খারাপ লাগত না। আমরা ওই আলুভাতের তালটাকে বলতাম পেটো। যে-দিন পেটো আর ভাত পাতে পড়ত, সে-দিন রসনায় যে-বিস্ফোরণ ঘটত, তা ভাষায় বর্ণনা করা দুষ্কর। কিন্তু জিনিসগুলো পেটে যাওয়ার পর সেখানে যে অমোঘ রাসায়নিক বিক্রিয়া হত, তার ফলাফলরূপে পাওয়া যেত মারাত্মক একটা জিনিস— ঘুম। ক্লাসে বসে চোখ খুলে রাখাই দায় হত। তার ওপর তখন ক্লাস হত বিছানায় বসে। মনে হত এমন ভরপেট খাওয়ার পর পড়াশোনা

> মিশনের ছাত্র নাজিমউদ্দিন মোল্লা কেরোসিনের আলোতে পড়াশোনা করেই ১৯৯১ সালে মাদ্রাসা বোর্ডের পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছিল। আর মিশনের প্রথম ছাত্র মোজাম্মেল হোসেন, যার রেজিস্ট্রেশান নম্বর ছিল ১, সেই মোজাম্মেলদাও ওই বছরই বোর্ডের পরীক্ষায় থার্ড হয়েছিল। তখন থেকেই স্যারের স্বপ্ন দেখা শুরু।

ছেড়েছুড়ে বালিশে মাথা দিয়ে মোষের মতো যদি নাক ডাকানো যেত। কিন্তু বাস্তবে তো তা আর সম্ভব নয়। তাই ঠান্ডা মেঝের ওপর পা নামিয়ে রাখতাম। কিছুক্ষণের জন্যে হলেও ঘুম কেটে যেত।

দুপুরে টিফিনের সময়েও ভাত দেওয়া হত। সঙ্গে থাকত ডিম বা মাছ। শুক্রবার আর রবিবার মাংস হত। আমি এবং জনা কয়েক মাছ বা মাংস কিছুই খেতাম না। মাছের কাঁটা ছাড়ানো একটা দারুণ ধৈর্যের ব্যাপার। তার ওপর মাছের আঁশটে গন্ধও সহ্য হয় না আমার। আর মাংস খেতাম না একটা বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে। একদিন দেখেছিলাম রান্নাঘরের পাশে একটা পলিথিন সিটের ওপর মাংস কেটে রাখা হচ্ছে। এমন সময় কোত্থেকে একটা কুকুর এসে মাংসের একটা টুকরো মুখে নিয়ে দে-ছুট। এমন ঘটনা তো বাড়িতেও ঘটে মাঝেমধ্যে, বিড়ালে মাছের টুকরো নিয়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু চোখের সামনে এমন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখার পর মাংস খাওয়ার ইচ্ছাটাই চলে গিয়েছিল। আমি মাংস না খেলেও, যারা খেত, তারা কোনো-কোনোদিন উচ্চকণ্ঠে জহুর ভাইয়ের প্রশংসা করত। জহুর ভাই ছিল আমাদের হেড শেফ এবং রান্নাঘরের বাইরে তাকে খুবই কম দেখা যেত। মিশনের রান্না এবং জহুর ভাই প্রায় সমার্থক হয়ে গিয়েছিল।

অনুষ্ঠানের ছবিটি পুরোনো। কিন্তু সেক্রেটারি স্যার তখন তরতাজা তরুণ।

কখনও কখনও ভাতের মধ্যে থেকে দারুণ সব জিনিস বের হত। যেমন কখনও হয়তো পাওয়া গেল আধপোড়া একটা বিড়ি। ছেলেরা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে একমত হল— নিশ্চয় জহুর ভাইয়ের বিড়ি। মামুদ আমাদের হাত থেকে সেটা কেড়ে নিয়ে রায় দিল, "এটা নিশ্চয় জনতা কোম্পানির বিড়ি। পতাকা বিড়ির বাঁধুনিই অন্যরকম হয়।" পতাকা বিড়ি মামুদদের কোম্পানি, সেইসূত্রে আধপোড়া বিড়ি সম্পর্কে তার বৈদগ্ধ্য প্রশ্নাতীত। আমার ভাত থেকে একবার একটা বড়ো পেরেক বেরিয়েছিল। সেটা অবশ্য জহুর ভাইয়ের পেরেক বলে কেউ দাবি করেনি। আর-একবার আলুভাতে থেকে বেরিয়ে ছিল একটা আরশোলার ছিন্নভিন্ন দেহ। আমি পেয়েছিলাম দুটো ডানা। কেউ মাথা। কারোর ভাগে পড়েছিল চারটে ঠ্যাং। কিন্তু তবু ওই ঘটনার পরেও পেটোর প্রতি দুর্বলতা যায়নি আমার। কারণ, আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম আরশোলা একদিনই পড়েছিল। এক জায়গায় যেমন দু-বার বাজ পড়ে না, তেমন একই খাবারে দু-বার আরশোলাও পড়ে না। প্রিয় জিনিসকে ডিফেন্ড করার জন্যে আমার যুক্তিবোধ ছোটোবেলা থেকেই বেশ তীক্ষ্ণ।

তখন আমরা খেতে বসতাম একতলা এবং দোতলার বারান্দায় মাদুর পেতে। সারি দিয়ে মাদুর পাতা হত। আমরা লাইন দিয়ে থালা নিয়ে বসতাম। তখন যারা ক্লাস এইটে পড়ত, তারা খাবার পরিবেশন করত। ডালুদা, কাওসারদা, মসিউরদা, হাসিবুরদা, মইনুদ্দিনদা ভাতের বালতি, ডালের বালতি বা তরকারির ডেকচি নিয়ে ছুটোছুটি করছে, এটা একটা পরিচিত দৃশ্য ছিল। পরে রান্নাঘরের স্টাফ বাড়তে মতি ভাই, শাহ আলমদা বা ছোটু— এরাও পরিবেশন করত। কিন্তু ছাত্ররা, ছাত্রদের পরিবেশন করছে, এটা আমার খুব পছন্দের ছিল। আমিও যখন ক্লাস এইটে উঠব, তখন কেউ আমায় ভাত বা ডাল দিতে ডাকবে আর আমি নিপুণ হাতে পরিবেশন করে সবশেষে আমরা ক্লাসের সবাই খেতে বসব— এমনটা ভাবতে দারুণ তৃপ্তি হত আমার।

দুপুরের খাবারের পর পেটপুজোর একটা লম্বা বিরতি থাকত। একেবারে সন্ধ্যে বেলা মাগরিবের নামাজের পর পাওয়া যেত কেক, মুড়ি, চানাচুর, প্যাটিস বা বাসনা। এই বাসনা ব্যাপারটা আমার কাছে নতুন ছিল। একটা গোল পেটমোটা নিমকি-জাতীয় খাবার। ওপরে চিনি ছড়ানো থাকত। জিনিসটা খেতে খারাপ ছিল না, কিন্তু প্রাত্যহিকতায় স্বর্গীয় খাদ্য উদরস্থ করার বাসনা চলে যায়, তো এই বাসনা কৌন সে বড়ি চিজ। দেখা যেত, সন্ধ্যে বেলায় পড়াশোনা শুরুর আগে ছোট্ট কোনো খুনসুটিতে কেউ তার রুমমেটকে তাক করে প্যাটিস ছুড়ছে। বা কোনো ঘরে গুলির মতো কেক বিনিময়ের ফলে রুমসুদ্ধু সবাই বড়ো হুজুরের কিল বা হাসেম স্যারের ছড়ি খেয়ে খিদে মেটাচ্ছে— এমন দৃশ্য নেহাতই দুর্লভ ছিল না।

সন্ধ্যে বেলার এই টিফিনটা যে আমাদের বিশেষ ভালো লাগত না, সেটা অবশ্য বড়ো হুজুর বুঝতেন। তাই যে-ব্ল্যাকবোর্ডে দৈনিক খাবারের মেনু লিখতেন তিনি, সেখানে নিত্যনতুন চমক থাকত টিফিনের জায়গায়। যেমন একদিন দেখা গেল সন্ধ্যে বেলা দেওয়া হবে ফ্রায়েড রাইস। প্রথমে ধরতে না পারলেও, পরে বোঝা গেল, সেটা আসলে মুড়ি (যার নাম চালভাজা, তারই নাম মুড়ি)। এই বোর্ডটা এখনও আছে কি না জানি না। তবে বড়ো হুজুর আর মিশনে থাকেন না। তাই সন্ধ্যে বেলা নির্ভেজাল মুড়ির বদলে আর ফ্রায়েড রাইসও নিশ্চয় লেখা হয় না।

রাতের খাবার খেতে যেতে একেবারেই ইচ্ছে করত না। সারাদিনের শেষে ঘুমোতে ইচ্ছে করত। কিন্তু সে-উপায়ও থাকত না। আসরাফুলদা, বড়ো হুজুর বা ছোটো হুজুর বা আমাদের রুমের ছেলেরাই কেউ-না-কেউ টেনে নিয়ে যেত খাওয়ার জন্যে। এতদিন পর লিখতে বসে এই আত্মীয়তার কথা মনে করে খুব কষ্ট হচ্ছে। আত্মীয় কি শুধুই রক্তের সম্পর্কে?

কবে তরকারি শেষ হয়ে

> **কবে তরকারি শেষ হয়ে গিয়েছিল বা ভাতে পোকা পড়ে গিয়েছিল কে আর মনে রেখেছে এতদিন পরে? কিন্তু সোহেলের পা ভেঙেছে, প্লাস্টার করা হয়েছে, বাইরে খেতে যেতে পারে না, জিয়াউল বা রনি বা দুষ্টুদা তার জন্যে খাবার নিয়ে আসছে, নিঃসঙ্গ নীরবতায় এইসব টুকরো ছবি মাথার মধ্যে চলাফেরা করতে শুরু করলে আত্মীয় শব্দের ব্যুৎপত্তি খুঁজতে চেষ্টা করবে তুমি— আত্মার বন্ধন।**

শরতের স্বপ্ন ▮ বসন্তে বাস্তব

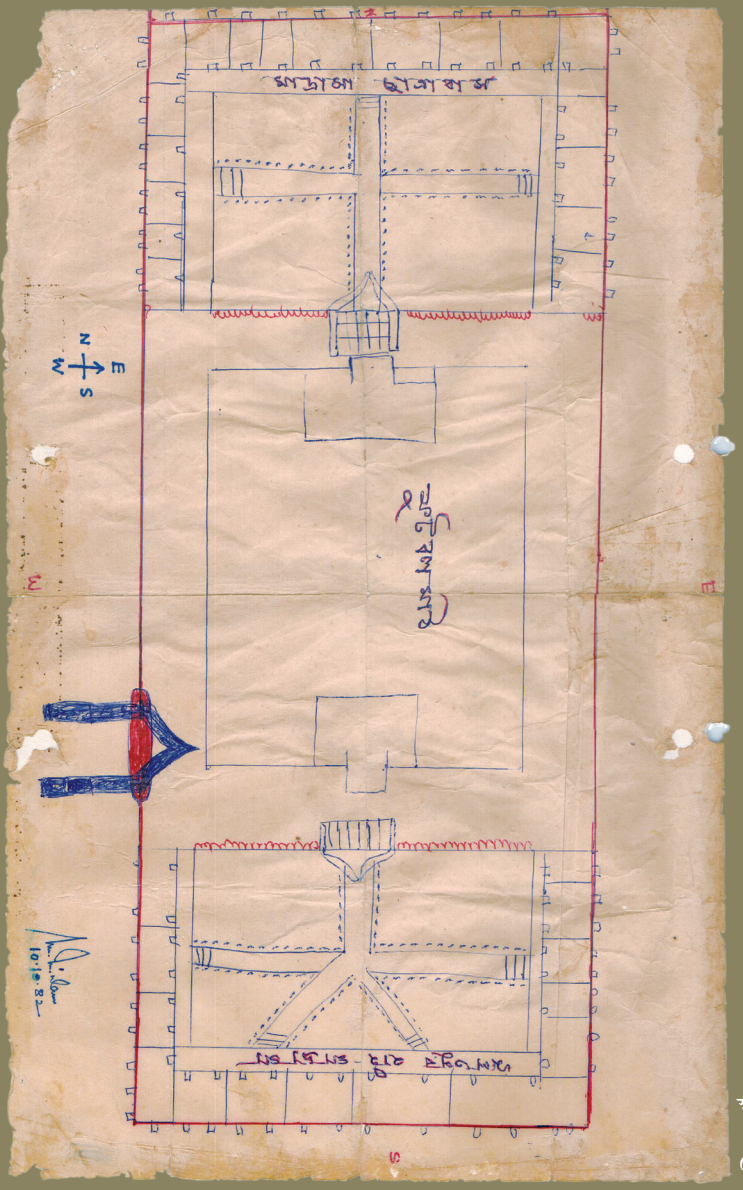

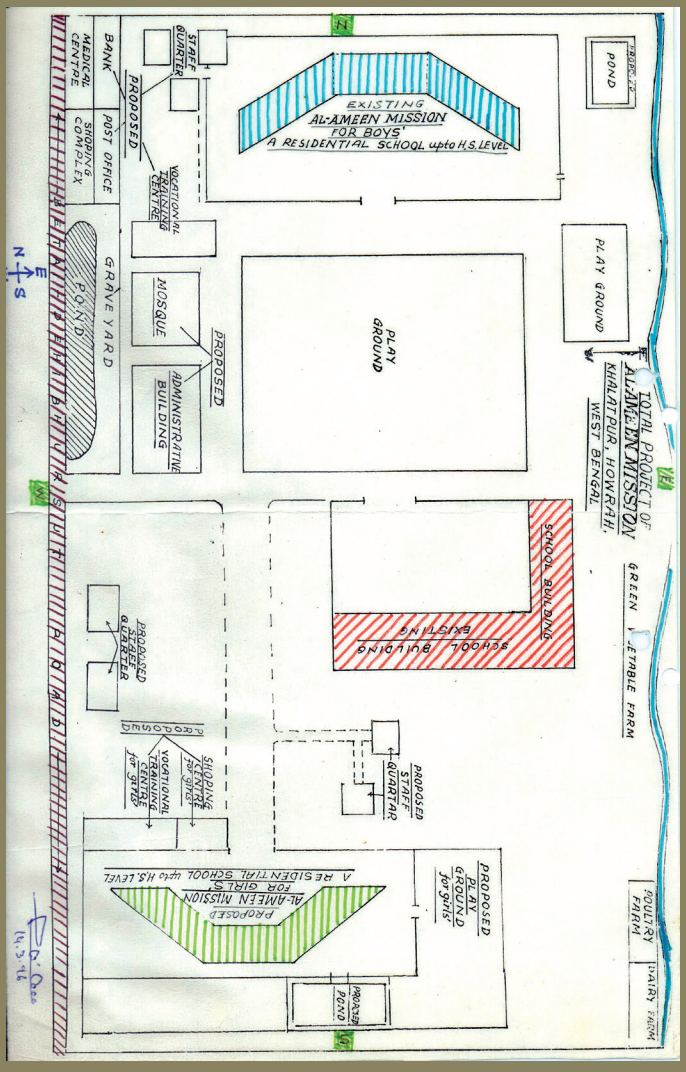

স্বপ্নের মিশন। যদিও সেই স্বপ্নের বয়স আরও পুরোনো, সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলামের হাতে সেটি কাগজে-কলমে রূপ পেয়েছিল ১৯৮২ সালের ১০ অক্টোবর (বাঁ-দিকের ছবি)। চোদ্দো বছর পর ১৯৯৬ সালের ১৪ মার্চ সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের সূচনা হল আর্কিটেক্টের হাতে।

গিয়েছিল বা ভাতে পোকা পড়ে গিয়েছিল কে আর মনে রেখেছে এতদিন পরে? কিন্তু সোহেলের পা ভেঙেছে, প্লাস্টার করা হয়েছে, বাইরে খেতে যেতে পারে না, জিয়াউল বা রনি বা দুষ্টুদা, রুমের কেউ-না-কেউ তার জন্যে খাবার নিয়ে আসছে। বা সাহিদদার থালা হারিয়ে গেছে, একই থালায় ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে আমি আর সাহিদদা ভাত খাচ্ছি। নিঃসঙ্গ নীরবতায় এইসব টুকরো ছবিগুলো মাথার মধ্যে চলাফেরা করতে শুরু করলে আত্মীয় শব্দের ব্যুৎপত্তি খুঁজতে চেষ্টা করবে তুমি— আত্মার বন্ধন। বন্ধুত্বের থেকে স্বার্থহীন আত্মীয়তা এ-দুনিয়ায় দুটি নেই। আমি ভাগ্যবান। নিতান্তই কম বয়সে এই সহজ তত্ত্ব অনুধাবন করতে পেরেছিলাম।

আলো, জল আর হাওয়া

সন্ধ্যার পর সবথেকে বড়ো সমস্যা ছিল ইলেকট্রিসিটি। সাধারণভাবে যে-বিদ্যুৎ আসত, তার কথা না বলাই ভালো। মিটমিট করে টুনি-বাল্বের

একসময় খলতপুর মাদ্রাসার অফিসে বসে তিনি এঁকেছিলেন আয়তক্ষেত্রাকার একটা মাঠ। মাঠের একদিকে একটা বাড়ি। আর তার অন্যদিকে আরও একটা। তাঁর স্বপ্নের মিশন। তখন কেউ কেউ হেসেছিলেন। কিন্তু আড়াই দশক পরে ওই ফুটবল মাঠের চারদিকে কত বাড়িই যে তিনি গড়ে তুললেন!

মতো জ্বলত ল্যাম্পগুলো। তাই আমাদের কোনো একজন পৃষ্ঠপোষক একটা বড়োসড়ো জেনারেটর দান করেছিলেন মিশনে। সন্ধ্যার নামাজের পর, সেই জেনারেটর চালু হত আর তার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হত আমাদের পড়াশোনা। কোনো কারণে তেল শেষ হয়ে গেলে বা যান্ত্রিক গোলোযোগে জেনারেটর বন্ধ থাকলে, টিউব লাইটগুলো বন্ধ হয়ে যেত। বাল্বের মিটমিটে আলোতেই পড়তে হত আমাদের। কিন্তু তেল বেশি থাক বা কম, রাতের দিকে জেনারেটর বন্ধ থাকত, ইলেকট্রিকের ভোল্টেজ একটু বাড়ত রাত বাড়ার সাথে সাথে। তখন আবার টিউব লাইট জ্বালাতে পারতাম আমরা।

শুনেছিলাম মিশন যখন প্রথম শুরু হয়, তখন ইলেকট্রিসিটি না থাকলে হ্যারিকেনের আলোই ছিল ভরসা। ছাত্ররা যে যার বাড়ি থেকে হ্যারিকেন নিয়ে আসত। সন্ধ্যে বেলা বিদ্যুৎ না থাকলে, সেই হ্যারিকেন জ্বালিয়ে পড়াশোনা করত সবাই। কিন্তু তার জন্যে পরীক্ষায় ভালো ফল কখনও আটকে থাকেনি। মিশনের ছাত্র নাজিমউদ্দিন মোল্লা ওই কেরোসিনের আলোতে পড়াশোনা করেই ১৯৯১ সালে মাদ্রাসা বোর্ডের পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছিল। আর মিশনের প্রথম ছাত্র মোজাম্মেল হোসেন, যার রেজিস্ট্রেশান নম্বর ছিল ১, সেই মোজাম্মেলদাও ওই বছরই বোর্ডের পরীক্ষায় থার্ড হয়েছিল। তখন থেকেই স্যারের স্বপ্ন দেখা শুরু। একদিন মাধ্যমিকে প্রথম দশ জনের মধ্যে থাকবে আমাদের ছেলেরা (এবং মেয়েরা)। যেমনটা করে নরেন্দ্রপুর বা পুরুলিয়ার ছেলেরা।

শুধু পড়াশোনাই নয়, এই জেনারেটরের সঙ্গে জড়িত ছিল আমাদের পানীয় জল এবং অবশ্যই স্নান, ওজু এবং রান্নার জল। কারণ, জেনারেটর বিকল হলে জল তোলার পাম্প মোটরটাও চলত না। দেখা দিত জলের অভাব। মিশনের দুটো চাপাকলই ছিল তখন ভরসা। একটা কলের জলে বাথরুম-টয়লেটের কাজ চালিয়ে নেওয়া যেত, কিন্তু সে-জল ছিল পানের অযোগ্য। অন্য কলটার জল পানযোগ্য হলেও, আড়াইশো ছাত্রের ভার নিতে না পেরে, সেটাও অচিরেই বিকল হয়ে যেত। মনে আছে, একবার জল তোলার পাম্প দু-তিন দিন বিগড়ে ছিল বলে, মাঠ পার হয়ে দূরের একটা কল থেকে আমরা বালতি আর বোতলে খাওয়ার জল বয়ে আনতাম।

আলো আর জলের কথা তো বললাম। হাওয়া? যতক্ষণ ফ্যান ঘুরত, ততক্ষণ ঠিকই ছিল। কিন্তু গ্রীষ্মের দিনে সবথেকে আরামদায়ক ছিল আমাদের ১৭ নম্বর রুমের মতো দক্ষিণমুখো ঘরগুলো। তাই ভাগ্যবানেরাই সেই ঘরে থাকতে পেত। স্যার আশ্বাস দিতেন, "নতুন বিল্ডিংয়ের সব ঘর দক্ষিণমুখো হবে। সেখানে সবাই দখিনা বাতাস পাবি।" সত্যি বলতে কী, মিশনে থাকতে আমার কখনও দখিনা বাতাসের অভাব হয়নি। কারণ, মিশনে থাকতে এই অসুবিধাগুলোকে আমরা বেশি পাত্তা দিইনি কোনোদিন। কখনও কষ্ট হলে একটু ক্ষোভ জমা হত ঠিকই। কিন্তু স্যার যখন আমাদের ঘরে ঢুকে বলতেন, "এই তো আমার ছেলেরা পড়াশোনা করছে। আমার একঝাঁক দখিনা বাতাস।" তখন মনটা হালকা হয়ে যেত। যারা নিজেরাই দখিনা বাতাস, তাদের আবার আলাদা করে ঠান্ডা হাওয়ার কী দরকার?

আমি ব্যক্তিগতভাবে পরে একটি আবাসিক শিক্ষাবাসের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। সেখানে ছাত্ররা যেরকম সুযোগসুবিধা পেত (বা এখনও পায়), মিশনে থাকতে, তা আমাদের কাছে স্বপ্ন ছিল। একটা স্টিলের কাঠামোওয়ালা আলাদা বিছানা, একটা পড়ার টেবিল, আলাদা একটা টেবিল ল্যাম্প পাওয়া এই ছাত্রদের দেখে মনে হয়— ভাগ্যিস, এই সুযোগ আমরা এত সহজে পাইনি। সেই সময় আমাদের সকলের জন্যে একটা আলাদা বিছানা ছিল না। অনেক সময়ই দুটো বেড পাশাপাশি জোড়া লাগিয়ে তিনজন ছাত্র ঘুমাত। আলাদা করে পড়ার টেবিল কারোরই ছিল না। বেডের ওপর বা মেঝেতে বসেই চলত আমাদের পড়াশোনা।

মিশনে যেটুকু কষ্ট তখন করতে হয়েছে, সেটা আমার জীবনের অক্ষয় সম্পদ। অল্পে তুষ্ট থাকার রহস্য শিখিয়েছিল মিশন।

মিশনের ঋণ

মিশনে আসার কয়েক মাস পরে, একদিন সকালে একটা মিটিং ডাকা হল ২ নম্বর রুমে। হাসেম স্যার ছিলেন। আর ছিলেন আমাদের সুপারভাইজার গোরাই স্যার। মিটিংয়ে ডাকা হয়েছিল সব ক্লাসের ক্যাপ্টেনদের। ক্লাস ফাইভের প্রতিনিধি ছিলাম আমি। তা এই জরুরি তলবের কারণ কী? জানা গেল কর্তৃপক্ষ খাবার রুটিনে কিছু রদবদল করছেন। সকালের চা থাকছে। দশটায় ক্লাস শুরু হওয়ার আগের খাবারও থাকছে, সেটাতে হয়তো সামান্য কিছু ছাঁটকাট হবে। কিন্তু দুপুরে দেওয়া হবে একটা ছোটো টিফিন। আর বিকালে দেওয়া হবে রুটি-সবজি। তারপর আবার রাত্রি বেলা ভাত। হিসেব করে দেখলে আগের রুটিনের সঙ্গে এমন কিছু হেরফের ঘটছে না।

প্রথমেই আমায় দিয়ে শুরু হল, "কী রোহণ? কিছু আপত্তি আছে?" আপত্তি আর কী থাকবে স্যার? বোঝাই যাচ্ছে, আলোচনার জন্যে নয়, সিদ্ধান্ত শোনানোর জন্যে ডাকা হয়েছে আমাদের, যাতে ফিরে গিয়ে ক্লাসে আর সবাইকে শোনাতে পারি এই রদবদলের কথা। আমি মাথা নাড়লাম— কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু ক্লাসে ফিরে ঘোর অসন্তোষের মুখে পড়তে হল আমায়।

আপত্তি উঠেছিল মূলত দুটো কারণে।

এক— ব্যাপারটা যদি কিছুই না হবে, তাহলে এত ঘটা করে মিটিং ডাকা কেন? নিশ্চয় আরও কিছু রহস্য আছে এর গভীরে।

দুই— দিনে তিন বার ভাত খেয়ে যাদের অভ্যাস, তারা সকালে আর রাতে মোটে দু-বার ভাত খেয়ে থাকতে পারবে?

সবারই প্রশ্ন, আমি রাজি হলাম কেন। কাউকেই সহজে বোঝানো গেল না, আমার রাজি না হওয়াতে কিছু যেত আসত না। দু-একদিনেই অবশ্য সেটা সবার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। উঁচু ক্লাসের কেউ কেউ এই ব্যাপারে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে দারুণ ধমক খেল হাসেম স্যারের থেকে— যা দেওয়া হচ্ছে, তাই-ই খেতে হবে। কোনো ট্যাঁ-ফোঁ করলে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হবে, সেখানে যত খুশি খেয়ো।

দুপুরে ভাত খাওয়া অভ্যাস হয়ে গেছে। তাই জোহরের নামাজের পর দুপুরে যখন কেক বা বিস্কুট খেতে দেওয়া হত, তখন খুব খিদে পেত। পেটে ইঁদুরদৌড়ের জেরে মাথায় পড়াশোনাও ঢুকত না ঠিকঠাক।

কিন্তু হঠাৎ হলটা কী? এমন করে খাওয়াদাওয়ার ওপর নতুন নিয়ম আরোপ কেন? অনেক পরে জেনেছিলাম, আমাদের মিশন ঋণভারে ডুবে গেছে। পাওনাদারদের লক্ষ লক্ষ টাকা বাকি। যে-ভদ্রলোকের থেকে মাংস নেওয়া হত, তাঁর পাওনা ছিল পঁয়ষট্টি হাজার টাকা। এই অঙ্কটা কতটা সঠিক ছিল জানি না, কিন্তু ১৯৯৩-এ টাকার পরিমাণটা যদি এর অর্ধেকও

হয়, তাহলেও সেটা চিন্তার বিষয় ছিল বই কী। বকেয়া টাকা মেটাতে স্যারের মাথার চুল ছেঁড়ার অবস্থা, কিন্তু আমাদের বড়ো করে তোলার স্বপ্ন তা বলে থেমে থাকেনি। স্যার তখনও বলে চলেছেন, "নতুন হস্টেল বিল্ডিংয়ে তোদের জন্যে ঝকঝকে বাথরুম হবে। টাইলস বসবে। ট্যাপ খুললেই জল।" কিন্তু কী করে হবে? আমাদের খাওয়ানোর খরচ জোগাতেই তখন হিমশিম অবস্থা। অনেক পরে একটা হিসেবের খতিয়ান ভুল করে আমার হাতে পড়ে গিয়েছিল। বলা যায়, মিশনের ধারবাকির খাতার একটা পাতা। সেটাতে দেখেছিলাম সবজিওয়ালা, মাংসের পাইকার, দর্জি আর চালের আড়তদারের মিলিত পাওনা প্রায় সাড়ে পাঁচ লাখ টাকা।

তখনও মিশনের অর্থনীতি বিশদে জানার বা বোঝার বয়স হয়নি আমার, তবু খাওয়াদাওয়ার এই কষ্টের কথা বাড়িতে মুখ ফুটে বলতে পারিনি। এমনিতেই নানা জন মিশন নিয়ে নানা কটূক্তি করতেন, তার ওপর এই খবর যদি তাঁদের কানে যায়, তাহলে আর রক্ষা ছিল না। আমার মিশন সবথেকে ভালো, এমন একটা ধারণা ও বিশ্বাস মনের মধ্যে লালন করতে শুরু করেছি তখন। আমি চাইতাম না সেটার ওপর কোনো আঘাত আসুক। বাড়ি আসার সময় কখনও কখনও আমাদের লাইব্রেরির তহবিলের জন্যে চাঁদার বই নিয়ে যেতে বলতেন স্যার। তখনও আমাদের লাইব্রেরি ছিল না। বাড়িতে গিয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করে এর ওর থেকে টাকা চেয়ে এনে দিয়েছি। কিন্তু লাইব্রেরি আর হয় না। আমাদের তুলে আনা চাঁদা চলে গেছে হয়তো কোনো পাওনাদারের কাছে।

স্যার শোনাতেন, যখন খলতপুর মাদ্রাসা শুরু হয়েছিল, তখন বাড়ি বাড়ি গিয়ে মুষ্টি-চালের ভিক্ষা নিয়ে আসতেন। পরে সেই চাল বাজারে বিক্রি করে আসত মাদ্রাসার খরচের টাকা। সেই ভিক্ষাকে আশ্রয় করেই একটা স্কুলবাড়ি মাদ্রাসার। সেটা ক্রমে বড়ো হল। সেটা হয়ে উঠল আল-আমীন মিশনের আবাসিক ভবন। আমরা থাকতে শুরু করলাম কচি কলা পাতা রংয়ের দোতলা বাড়িটাতে। আর খলতপুর মাদ্রাসার ক্লাস হতে লাগল মিশনের নির্মীয়মাণ নতুন বিল্ডিংয়ের একতলায়। মাদ্রাসার মতো করেই মিশনের জন্যেও স্যারের ভিক্ষার ঝুলি সবার সামনে পাতা। উনি বলতেন, "আমি তো চিরভিখারি। সবার কাছে হাত পেতে চলেছি।" আমরা সবাই জানতাম, সেটা আমাদের জন্যেই।

অনেক সময়ই দেখেছি, শনিবার বা রবিবার সন্ধ্যায় স্যারের অফিসের সামনে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পাওনাদাররা। মহাজনের লক্ষ টাকার ধার তখনও শোধ হয়নি। অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করছে কেউ কেউ। সবারই তো সংসার আছে। হাজার হাজার টাকা তারা কতদিন ফেলে রাখবে মিশনে? ভয় পেতাম, এরা অফিসের মধ্যে ঢুকে ভয়ানক কোনো কাণ্ড না ঘটিয়ে ফেলে। কিন্তু কে জানে, স্যার কী জাদু জানতেন। যে-লোকটা অফিসের বাইরে দাঁড়িয়ে তাঁর সম্পর্কে চোখা চোখা বাক্যবাণ প্রয়োগ করছিল, অফিসে ঢুকে স্যারের সঙ্গে কথা বলে সে-ই হৃষ্টচিত্তে বেরিয়ে আসছে। পাওনা টাকা পায়নি যদিও, তবু ঠোঁটের কোণে একচিলতে হাসি।

স্যার আমাদের বলতেন, "এখন থেকেই মুঠো খোলার চেষ্টা কর। তা না হলে হাতের মুঠো বন্ধই থেকে যাবে সারাজীবন। কবরে গিয়ে দেখবি, সেই বন্ধ মুঠোতে কিচ্ছু নেই।" এখন বুঝি মুঠো খোলা কত শক্ত। আমরা তো নিজেদের পরিবার, নিজেদের চাহিদা— এসব নিয়েই সদাব্যস্ত। অথচ ভুলেই যাই একজন 'পাগল' নিজের সমস্ত উপার্জন মিশনের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে তিল তিল করে গড়ে তুলেছেন আমাদের।

আসলে এই ম্যাজিকটুকু তাঁর কাছে কিছুই নয়। একসময় খলতপুর মাদ্রাসার অফিসে বসে তিনি এঁকেছিলেন আয়তক্ষেত্রাকার একটা মাঠ। মাঠের একদিকে একটা বাড়ি। আর তার অন্যদিকে আরও একটা। তাঁর স্বপ্নের মিশন। তখন কেউ কেউ হেসেছিলেন। কিন্তু আড়াই দশক পরে ওই ফুটবল মাঠের চারদিকে কত বাড়িই যে তিনি গড়ে তুললেন! আল-আমীন মিশন খলতপুরের মতো একটা গণ্ডগ্রামের সীমানা ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ল সারা পশ্চিমবাংলায়। হাতে কেবলমাত্র ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে যিনি এই অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলেন ম্যাজিকের অবিশ্বাস্য কৌশলে, তাঁর পক্ষে একজন আলু ব্যবসায়ীকে শান্ত করা কী এমন শক্ত কাজ।

স্যার নিজে ওই অঞ্চলেরই একটা হাইস্কুল, আসণ্ডা আদর্শ শিক্ষা সদনের ইতিহাস আর রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক ছিলেন ওই সময়। মিশনের কাজে, মূলত ডোনেশানের খোঁজেই, কলকাতায় যেতে হত সপ্তাহের দু-তিন দিন। মাস গেলে মাইনের টাকাটা এনে জমা দিতেন মিশনেই। বাড়ির জন্যে আলাদা করে কিছু বরাদ্দ থাকত না। নিজের জন্যে বা পরিবারের জন্যে আলাদা কোনো সঞ্চয় নেই, কোনো বিমা করানো নেই। নিজের সর্বস্ব দিয়ে মিশনকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন তিনি। 'আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে' রবি ঠাকুর যে একলা চলার আহ্বান জানিয়েছিলেন, সেটা পদে পদে অনুসরণ করতে দেখেছি স্যারকে।

কখনও কখনও তিনি নিজেকে 'পাগল'ও বলতেন। পাগল কি না জানি না, তবে যাঁরা যুগের চেয়ে এগিয়ে থেকে স্বপ্ন দেখেন, তাঁরা সাধারণ মানুষ নন নিশ্চিত। তবুও তাঁর কষ্ট ছিল, বেদনা ছিল। সেগুলো ভাগ করে নিতেন আমাদের সঙ্গে। হয়তো কেউ অপমান করেছে, খারাপ কথা শুনিয়েছে, স্যার আমাদের বলতেন, "এখন থেকেই মুঠো খোলার চেষ্টা কর। তা না হলে হাতের মুঠো বন্ধই থেকে যাবে সারাজীবন। কবরে গিয়ে দেখবি, সেই বন্ধ মুঠোতে কিচ্ছু নেই।" এখন বুঝি মুঠো খোলা কত শক্ত। আমরা তো নিজেদের পরিবার, নিজেদের চাহিদা— এসব নিয়েই সদাব্যস্ত। অথচ ভুলেই যাই একজন 'পাগল' নিজের সমস্ত উপার্জন মিশনের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে তিল তিল করে গড়ে তুলেছেন আমাদের।

পাওনাদারের ঋণের বোঝা তিনি বয়ে চলেছেন এখনও। আজও নিশ্চয় বকেয়া টাকার অঙ্ক দেখে বিনিদ্র রাত কাটে তাঁর। কিন্তু মিশনের ঋণ এ-জীবনে আর শোধ করা হল না আমাদের কারোরই। মাতৃস্তন্য বা অক্সিজেন— এসবও তো অপরিশোধ্য। এই ভেবেই সান্ত্বনা দিই নিজেকে। ■

(পরের সংখ্যায়)

ছবি: জাহির আব্বাস বাচ্চু

ভারতীয়, চীনা, গ্রিক ও রোমানদের বিখ্যাত জ্ঞানচর্চা যখন নিভু-নিভু, সেই অষ্টম শতাব্দীতে সভ্যতার উজ্জ্বল মশালটি হাতে তুলে নিয়েছিলেন আরবিভাষী মনীষীরা। সে এক প্রকৃত নবজাগরণ। বিশ্বসভ্যতাকে তাঁরা নতুন পথ দেখালেন। আমরা জানব অষ্টম থেকে ষোড়শ শতাব্দী, ট্রান্স-অক্সিয়ানার সমরখন্দ থেকে স্পেনের কর্ডোভা— এই বিপুল সময় আর স্থানপরিধির একেক জন মনীষীর জীবন আর কর্মপরিচয় ধরে ধরে। এবার

আল-গাজালি

ধর্মতত্ত্ব ও দর্শনের শ্রেষ্ঠ এক মনীষী

একরামূল হক শেখ

অল-ঘজালীর মতো জ্ঞানী ব্যক্তি শুধু ইসলামের ইতিহাসেই নয়, পৃথিবীর সব ধর্মের ইতিহাসেই খুব কম জন্মগ্রহণ করেছেন।

— 'ভারতবর্ষ ও ইসলাম', সুরজিৎ দাশগুপ্ত,
ডি এম লাইব্রেরি, কলকাতা, ১৯৯১, পৃষ্ঠা ৪৪।

একদা এক তরুণ ছাত্র পারস্যের (বর্তমান ইরান) জুরজান শহর থেকে নিজের বাড়িতে ফিরছিলেন। পথে এক ডাকাতদল তার সবকিছু লুঠ করে। অন্যান্য সবকিছুর সঙ্গে তার কাছে একটা নোটবইও ছিল। ওই নোটবইয়ে সে তার শিক্ষক আবু নাসরের সমুদয় ব্যাখ্যা লিখে রেখেছিল। টাকাপয়সা ও পোশাকপরিচ্ছদ হারিয়ে তার যত-না কষ্ট হচ্ছিল, নোটবই হারানোতে তার দুঃখ হচ্ছিল অনেক বেশি। সে ডাকাতসর্দারের কাছে নোটবই ফেরতের জন্য বেশ কিছুক্ষণ অনুনয়-বিনয় করে। ডাকাতসর্দার সে-অনুরোধ তাচ্ছিল্যভরে প্রত্যাখ্যান করে এবং ব্যঙ্গ করে বলে, "তোমার যাবতীয় পড়াশোনা ও বিদ্যাবুদ্ধি বুঝি ওই নোটবইয়ে, নিজের পেটে তাহলে কিছুই নেই। বৃথাই তোমার এই সময় নষ্ট করা।" এই নিষ্ঠুর শ্লেষ ওই তরুণের চোখ খুলে দেয়। সে তৎক্ষণাৎ প্রতিজ্ঞা করে, এরপর যা-কিছু অধ্যয়ন করবে, তার সবকিছুই সে কণ্ঠস্থ করবে। এই প্রতিজ্ঞা নিষ্ঠার সাথে পালন করার ফলে তার স্মরণশক্তি খুব বেড়ে যায়। ফলে পরবর্তীতে সে যতই পুস্তক পাঠ করত, কোনোটিই দ্বিতীয় বার অধ্যয়নের প্রয়োজন হত না।

তার কর্মজীবনে তর্কবিতর্কে ও জ্ঞানালোচনায় সে যে অজেয় হয়েছিল, বাল্যকালের এই ছোটো ঘটনাটি মুখ্য না হলেও, গৌণ কারণ তো বটে। এই তরুণ ছাত্রই 'জাইন আল-দিন' অর্থাৎ বিশ্বাসের শোভা, মনীষী আল-গাজালি।

জীবনচরিত

অমিত প্রতিভাধর মনীষীর জন্ম নিয়মিত হয় না, কয়েক শতাব্দী পর পর দু-এক জনের আবির্ভাব ঘটলেও ঘটতে পারে। মধ্যযুগের অন্যতম মহাপণ্ডিত আল-গাজালিকে অনেকেই পারস্যের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা বলে মনে করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক ড. আমিনুল ইসলামের মতে, "গাজালি ছিলেন গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী একজন সত্যসাধক, এবং আনুষ্ঠানিক শিক্ষাদীক্ষা ও বুদ্ধিবৃত্তিক নিষ্ঠার দিক থেকে তিনি ছিলেন তাঁর উল্লিখিত সব পূর্বসূরির চেয়ে অনেক বেশি অগ্রসর। রক্ষণশীল ধর্মের প্রতি তাঁর অবিচল সমর্থন এবং যুক্তিকে বিসর্জন না দিয়েও স্বজ্ঞার উৎকৃষ্টতা প্রমাণের কারণেই তিনি সক্ষম হয়েছিলেন সব মহলের শ্রদ্ধা অর্জনে।" (মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৯।)। পূর্ব পারস্যের উর্বর ও জনবহুল এলাকা খোরাসানে জন্ম আল-গাজালির। জ্ঞানবিজ্ঞানের উৎকর্ষ ও রাজনৈতিক গুরুত্বে খোরাসান এক অনন্য প্রদেশ। কবি জ্যোতির্বিদ উমর খইয়াম (১০৪৮—১১৩১), মহাকবি আল-ফেরদৌসি (৯৪০—১০২০), প্রসিদ্ধ সেলজুক সম্রাট মালিক শাহ (১০৫৫—১০৯২)-এর প্রধানমন্ত্রী নিজাম-উল-মুলক আবুল আলি হাসান ইব্ন আলি তুসি (১০১৮—১০৯২) প্রমুখ স্মরণীয় পারস্যসন্তানদের জন্মস্থল খোরাসান।

সাধারণত মধ্যযুগীয় আরবিভাষী মনীষীদের জীবনকাহিনি রচনার নির্ভরযোগ্য সূত্র সীমিত হলেও, আল-গাজালি এ-ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। তাঁর জীবনকীর্তি রচনার সমসাময়িক ও আধুনিক উপকরণ অন্যান্যদের চেয়ে বহুগুণ বেশি। দুটি প্রধান মৌলিক উৎস হল— আল-গাজালি রচিত আত্মজীবনী 'আল-মুনকিদ মিন আল-দলাল' অর্থাৎ 'ভ্রান্তির

প্রাচীন তুসের একটি দেওয়ালের ধ্বংসাবশেষ।

পরিত্রাতা' এবং আল-গাজালির চেয়ে তেরো বছরের ছোটো, তাঁর ছাত্র এক সময়ের সহশিক্ষক আবদ আল-গাফির আল-ফারিসির (মৃত্যু: ১১৩৫ খ্রি.) আল-গাজালির জীবনীগ্রন্থ, যা ১১১৩ সালে রচিত। আল-করিম আল-উসমান পাবলিকেশন কর্তৃক আরবি ভাষায় বেশ কয়েকটি জীবনীগ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থকারগণ হলেন— ইব্ন আসাকির (১১০৫—১১৭৫), আবুল ফারাজ ইব্ন আল-জাওজি (১১১৪—১২০০), তাজ আল-দিন আল-সুবকি (১৩২৭-১৩৭০), আল-জাদিবি (মৃত্যু: ১৭৯০ খ্রি.) প্রমুখ।

আধুনিক কালেও আল-গাজালি নিয়ে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে বহু গবেষণা হয়েছে এবং হচ্ছে। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি জীবনকাহিনি হল— আদিকালীন খ্রিস্টান ও মুসলমান সুফি-বিশেষজ্ঞ মার্গারেট স্মিথ (১৮৮৪—১৯৭০) রচিত 'আল-গাজালি: দ্য মিস্টিক', ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামি বিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ফ্রাঙ্ক গ্রিফেলের 'আল-গাজালিজ ফিলোজফিক্যাল থিওলজি', অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামি ধর্মতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক আর জে ম্যাকার্থি (মৃত্যু: ১৯৮১ খ্রি.)-এর 'আল-গাজালি— ডেলিভারেন্স ফ্রম এরার', প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ ডব্লিউ মন্টগোমারি ওয়াট (১৯০৯—২০০৬)-এর 'মুসলিম ইনটেলেকচুয়াল— এ স্টাডি অফ আল-গাজালি' প্রভৃতি।

শৈশব ও শিক্ষা

আল-গাজালি পারস্যের খোরাসান প্রদেশের অন্তর্গত তুস জেলার তাবারানে ৪৫০ হিজরি অর্থাৎ ১০৫৮ খ্রিস্টাব্দে জন্ম নেন। তাঁর পুরো নাম আবু হামিদ মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ আল-তুসি আল-শাফিই। জন্মস্থানটি বর্তমান ইরানের মাশহাদ শহরের কাছাকাছি। সাধারণত তিনি তাঁর বংশনাম আল-গাজালি নামে অধিক পরিচিত। কোনো কোনো পুস্তকে তাঁর নাম আল-গাজজালিও উল্লিখিত। এ-বিষয়ে দুটি মত প্রচলিত। কতিপয় ইতিহাসকারের মতে, তাঁর জন্মস্থান 'গাজালা' বা 'গাজজালা' হতে তাঁর এই বংশনাম। অপরদিকে অধিকাংশ জীবনীকারের মতে, তাঁর পিতা ছিলেন সুতাপ্রস্তুতকারী, যদিও কয়েক জন আধুনিক গবেষকের বিশ্বাস, তাঁর পিতার পেশা ছিল সুতা বিক্রয়। আরবি ভাষায় গাজালির অর্থ সুতাপ্রস্তুতকারী এবং গাজজালি অর্থাৎ সুতা বিক্রেতা। তবে বিভিন্ন সূত্র ও মত পর্যালোচনায় পাওয়া যায়, তাঁর পিতা সুতাপ্রস্তুতকারী হওয়ায়, তাঁদের বংশনাম আল-গাজালি। তাঁর পিতা ও পিতামহ উভয়ের নাম মুহাম্মদ হওয়ায় এটা অনুমান করা যায়, তাঁরা ধার্মিক ও মহানবি-প্রেমী ছিলেন। তাঁর পিতা ছিলেন ধর্মপরায়ণ দরবেশ। আল-সুবকির মতে, তিনি নিজের উপার্জন ব্যতীত অন্য কিছু দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন না। অধিকাংশ সময়ই তিনি সুফি পরিবেশ ও সাহচর্যে ব্যয় করতেন। আল-গাজালির পিতা দরিদ্র ও নিরক্ষর হলেও পুত্রের শিক্ষার্জনের জন্য কোনো ত্রুটি রাখেননি। উল্লেখ্য যে, শৈশবেই আল-গাজালি পিতৃহীন হন। মৃত্যুকালে তাঁর পিতা, তাঁর এক বন্ধুর কাছে সামান্য কিছু অর্থ গচ্ছিত রাখেন, তাঁর দুই নাবালক পুত্র মুহাম্মদ আল-গাজালি ও আহম্মদ আল-গাজালির প্রতিপালন ও শিক্ষার উদ্দেশ্যে।

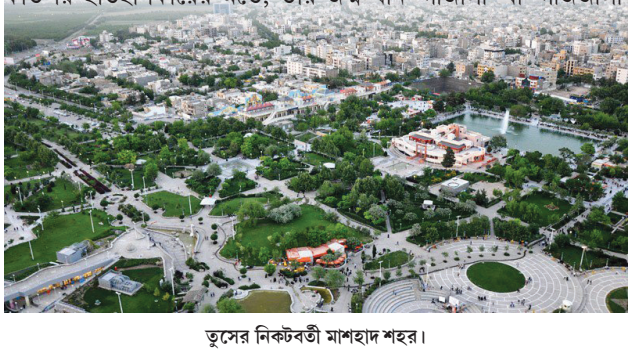

তুসের নিকটবর্তী মাশহাদ শহর।

দুই ভাই খুবই মেধাবী ছিলেন, বিশেষ করে আল-গাজালি দ্রুত সমগ্র কোরআন কণ্ঠস্থ করে ফেলেন। এ-সময় তাঁদের শিক্ষক ছিলেন ইমাম আহমদ আল-রাজকানি। তাঁদের পিতার বন্ধুর কাছে গচ্ছিত অর্থ কয়েক মাসে শেষ হয়ে যায়। ফলে বাধ্য হয়ে তাঁরা দুই ভাই সরকারি মাদ্রাসায় ১০৭৩ সালে ভর্তি হন। এ-সময় আল-গাজালির বয়স পনেরো বছর।

গাজালি ছিলেন গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী একজন সত্যসাধক, এবং আনুষ্ঠানিক শিক্ষাদীক্ষা ও বুদ্ধিবৃত্তিক নিষ্ঠার দিক থেকে তিনি ছিলেন তাঁর উল্লিখিত সব পূর্বসূরির চেয়ে অনেক বেশি অগ্রসর।

এইসব মাদ্রাসায় শিক্ষার্থীদের বেতন লাগত না। সেখানে থাকা খাওয়া ও শিক্ষা অর্জনের যাবতীয় ব্যয়ভার সরকারি কোষাগার হতে ব্যয়িত হত। সেলজুক সম্রাটের শিক্ষানুরাগী প্রধানমন্ত্রী নিজাম-উল-মুলক সে-সময়ের রাজকীয় বাজেটে শিক্ষাবিস্তার বাবদ বার্ষিক দু-কোটি মুদ্রা বরাদ্দ রাখতেন। ফলে আল-গাজালি ভ্রাতৃদ্বয়ের শিক্ষাগ্রহণ ও ভরণপোষণে বিশেষ কোনো অসুবিধা হয়নি। এই পর্যায়ে তাঁদের শিক্ষকগণ হলেন— আল্লামা আবু হামিদ আসকারায়েনি, আল্লামা আবু মুহাম্মদ জোবায়নি প্রমুখ আরবি ভাষা ও সাহিত্য এবং ফিকাহ্‌শাস্ত্রবিদগণ।

উচ্চশিক্ষা

তাবারানে শিক্ষা সমাপ্ত করে আল-গাজালি উচ্চশিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে জুরজান যান। ওখানে তাঁর শিক্ষক ছিলেন ইমাম আবু নসর ইসমাইল। আল-গাজালির অসাধারণ প্রতিভা ও তীক্ষ্ণ মেধার জন্য তাঁর শিক্ষক তাঁকে খুবই স্নেহ করতেন। বিশেষ যত্ন নিয়ে তাঁকে শিক্ষাদানও করেন। সে-সময় শিক্ষকগণ পাঠ্য বিষয়ে যে বিশদ ব্যাখ্যা দিতেন, ছাত্রদের তা

হুবহু লিখে রাখতে হত। এই লিখিত নোটকে আরবিতে তালিকাত বলা হয়। আল-গাজালির কাছে তালিকাতের বেশ বড়ো সঞ্চয় জমে ওঠে। জমানো তালিকাতসহ আল-গাজালি জুরজান থেকে তাঁর জন্মস্থল তাবারানের উদ্দেশ্যে যাত্রাকালে ডাকাতদল দ্বারা লুণ্ঠিত হন। এ-ঘটনা আগেই উল্লিখিত।

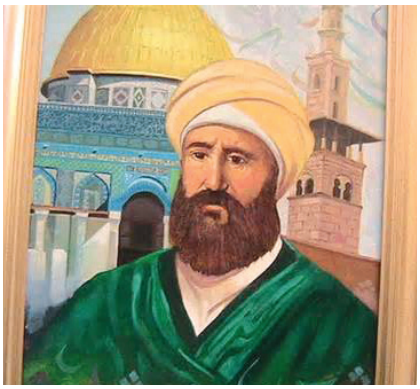
আল-গাজালি।

জুরজানে শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি তুসে কিছুকাল অতিবাহিত করেন। সম্ভবত এই সময় তিনি ইউসুফ আল-নাসাজের অধীনে সুফিবাদ পাঠ ও সুফিবাদের কিছু ভাবধারা অনুশীলনও করেন। এরপর তিনি ও তুসের কয়েক জন ছাত্র নিশাপুরে উচ্চস্তরীয় জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। তুস থেকে জুরজান ও নিশাপুরের দূরত্ব যথাক্রমে তিনশো ও পঞ্চাশ মাইল এবং নিশাপুর জুরজানগামী রাস্তার পাশে অবস্থিত। আল-গাজালি নিশাপুরের প্রখ্যাত নিজামিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। পরবর্তীতে এই মাদ্রাসাটি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। এই মাদ্রাসায় ভর্তির আগে আল-গাজালি ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাথমিক সিলেবাস কুরআন ও হাদিসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং ফিকাহ্‌শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। কিন্তু এখানের সিলেবাস ছিল আরও উচ্চস্তরীয় ও বিস্তৃত। এখানে ধর্মতত্ত্ব, আইন, বিজ্ঞান, দর্শন, যুক্তিবিদ্যা, দ্বান্দ্বিকবাদ, প্রকৃতিবিজ্ঞান, সুফিবাদ প্রভৃতি পড়ানো হত। সবচেয়ে বড়ো কথা, এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ছিলেন প্রখ্যাত ধর্মতাত্ত্বিক আবু মালি আল-জুওয়াইনি (১০২৮—১০৮৫)। ইসলামি ধর্মতত্ত্ব ও আইন বিষয়ে মহাপণ্ডিত, প্রখ্যাত দার্শনিক ও বিজ্ঞানী ইব্‌ন সিনা (৯৮০—১০৩৭) বিশেষজ্ঞ, অনন্যসাধারণ প্রতিভাবান আল-জুওয়াইনিকে 'ইমাম আল-হারমাইন' নামেও অভিহিত করা হয়। কারণ, তিনি পবিত্র মক্কা ও মদিনাতে ইমামতি করেছেন। তাঁর গভীর জ্ঞানের কারণে বহু জ্ঞানীগুণী ছাড়া শাসকবর্গও বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে তাঁর মতামতকেই চূড়ান্ত বলে গ্রহণ করতেন। তিনি তাঁর শিষ্যদের স্বাধীন মতপ্রকাশ ও চিন্তার পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। সকল প্রকার বিতর্ক ও আলোচনায় অংশ নিতে তিনি সবাইকে উৎসাহিত করতেন। প্রতিভাবান আল-গাজালি প্রথম থেকেই এই ধরনের মুক্ত জ্ঞানচর্চার পরিবেশে গভীর পাণ্ডিত্যের প্রমাণ রাখেন এবং দার্শনিকসুলভ চিন্তা করতে আগ্রহী হন। ফলস্বরূপ খুব শীঘ্রই আল-হারমাইনের প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। আল-গাজালি তাকলিদ (অন্ধবিশ্বাস) অপেক্ষা তানকিদ (সমালোচনা) এবং মুক্তবুদ্ধি ও স্বাধীন চিন্তার অনুরাগী হয়ে ওঠেন। তিনি এই সময় লেখেন, "যে বিশ্লেষণ করে না, সে বিচার করে না; যে বিচার করে না, সে উপলব্ধি করে না; যে উপলব্ধি করে না, সে অন্ধকারে ও ভুলের মধ্যেই হাতড়ে মরে।" (মুসলিম মনীষা: আবদুল মওদুদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৪।)। অন্যদিকে আল-হারমাইন তাঁর প্রিয় ছাত্রকে বর্ণনা করেন 'একটি পর্যাপ্ত সমুদ্র, যাতে নিমজ্জিত হওয়া যায়' এবং অন্যত্র মন্তব্য করেন, আল-গাজালির বিশেষ ঝোঁক ছিল অনুধ্যানপরায়ণ চিন্তায়। অপরের সাথে বিতর্কে যুক্তিকৌশলের ব্যবহার ছিল তাঁর সহজাত। অচিরেই তিনি তাঁর সহপাঠীদের শিক্ষাদান শুরু করেন। এ ছাড়া তাঁর উচ্চাঙ্গের চর্চা বিষয়ক বই লেখাও অরম্ভ করেন। নিজামিয়ার ছাত্র থাকাকালীন তিনি সম্ভবত তাঁর প্রথম বই 'আল-মানখুল' (১০৮০ খ্রি.) রচনা করেন।

নিশাপুরে অধ্যয়নরত অবস্থায় তিনি বিশিষ্ট সুফি আবু আল-কাদল ইব্‌ন মোহাম্মদ ইব্‌ন আলি আল-ফারমাদির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁরই নির্দেশে তিনি সুফিবাদের কঠোর সাধনা ও অনুশীলন করতেন। কিন্তু এতে সফল না হওয়ায় মানসিক অস্বস্তিতে ভুগতে শুরু করেন। একদিকে স্কলাসটিক ধর্মবিদদের অনুধ্যানপরায়ণ পদ্ধতিতে তিনি অতৃপ্ত ও প্রাধিকারের কিছুই গ্রহণ করতে পারছিলেন না। অন্যদিকে সুফি অনুশীলনও তাঁর মনে সুনির্দিষ্ট কোনো ছাপ ফেলতে পারেনি, কারণ এ-থেকে তিনি নির্দিষ্ট কোনো জ্ঞানলাভ করতে পারেননি। তবে সুফিতত্ত্বের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ও স্রষ্টা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কারণে নির্বিচারে গৃহীত ধর্মতত্ত্বের প্রতি তাঁর সমালোচনামূলক অসন্তুষ্টি বেড়ে যায়। ('মিশকাত আল-আনওয়ার ইমাম আল-গাজালি, অনুবাদ: 'আলোর উৎস', মোহাম্মদ আবদুল হালিম, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৭।)।

১০৮৪ খ্রিস্টাব্দে আল-ফারমাদি ও তার পরের বছর ইমাম আল-হারমাইন ইন্তেকাল করলে আল-গাজালি দুঃখে শোকে নিশাপুর ত্যাগ করেন। কথিত আছে, তাঁদের প্রিয় শিক্ষক আল-হারমাইনের চিরপ্রস্থানে আল-গাজালিসহ প্রায় চার শতাধিক শিষ্যের প্রত্যেকেই তাঁদের নিজ নিজ দোয়াত-কলম ভেঙে ফেলেন এবং শিশুর মতো গড়াগড়ি দিয়ে বেশ কয়েক দিন কাঁদতে থাকেন। সত্যিই, অপূর্ব এ-গুরুভক্তি!

তিনি তাঁর শিষ্যদের স্বাধীন মতপ্রকাশ ও চিন্তার পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। সকল প্রকার বিতর্ক ও আলোচনায় অংশ নিতে তিনি সবাইকে উৎসাহিত করতেন। প্রতিভাবান আল-গাজালি প্রথম থেকেই এই ধরনের মুক্ত জ্ঞানচর্চার পরিবেশে গভীর পাণ্ডিত্যের প্রমাণ রাখেন এবং দার্শনিকসুলভ চিন্তা করতে আগ্রহী হন। ফলস্বরূপ খুব শীঘ্রই আল-হারমাইনের প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন।

শিষ্যদের মধ্যে আল-গাজালি।

কর্মজীবন

জ্ঞানরাজ্যের শেষ সীমায় পৌঁছোতে না পারলেও, ইতিমধ্যেই তিনি যা অর্জন করেছেন তাঁর সমকক্ষ জ্ঞানসাধক সে-সময় প্রাচ্যদেশে বিরল। 'মিশকাত আল-আনওয়ারে'র অনুবাদক মোহাম্মদ আবদুল হালিমের বর্ণনা আরও চিত্তাকর্ষক, "তাঁর সৃজনশীল এবং আগ্রহী ব্যক্তিত্বের সজীব সমন্বয়ের মাধ্যমে তিনি মুসলিম ধর্মতত্ত্বকে নবরূপ দান করেন এবং এর মূল্য ও ভাবধারাকে পুনর্জাগরিত করে তোলেন। ইসলামে মৌলিকতাবাদ এবং অধ্যাত্মীকরণের সমন্বয়ে তাঁর শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব এত উল্লেখযোগ্য ছাপ রাখে যে, তাঁর কাল থেকে সমাজ ও বিভিন্ন সম্প্রদায় কর্তৃক এ ভাবধারা অব্যাহতভাবে গৃহীত হয়ে আসছে। তাঁর দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মৌলিকতার দ্বারা চিহ্নিত। এ মৌলিকতা যত না গঠনমূলক, তার চেয়ে অধিকতর সমালোচনামূলক। দর্শনের ওপর তাঁর লিখিত গ্রন্থ পাঠে অভিভূত না হয়ে পারা যায় না। তাঁর দার্শনিক তীক্ষ্ণতা দার্শনিকদের মতাবলম্বীর ওপর তাঁর সুস্পষ্ট ও পাঠযোগ্য বিবরণ, যে উপায়ে তিনি দার্শনিকদের সমালোচনা করেন তার সূক্ষ্মতা এবং তাঁর বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা এবং সর্বত্র সত্যকে গ্রহণ করার তাঁর উদার মানসিকতা আমাদের আকর্ষণ করে।" ('আলোর উৎস', বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৭।)।

তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি সমাজের নীচুতলা থেকে অভিজাত শ্রেণি পর্যন্ত পৌঁছোয়। সে-সময়ের শাসক সেলজুকদের রাজধানী ইস্পাহানের রাজনৈতিক ও সামরিক ঘাঁটি মুয়াস্কারে ১০৯১ খ্রিস্টাব্দে আল-গাজালি পৌঁছোন। এখানেই বিশিষ্ট উলেমাদের (ইসলামি শাস্ত্রবিদগণ) নিয়মিত জমায়েত ও তর্কবিতর্ক চলত। এই জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রে তাঁর সাথে সে-কালের বহু বিশিষ্ট পণ্ডিত ও শাস্ত্রজ্ঞদের হামেশাই বাগবিতণ্ডা হত। মাঝে মাঝে আল-গাজালিকে তীব্র বিরোধিতারও সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এই জ্ঞানালোচনায় অনেকেই পরমানন্দ পেতেন। কেউ কেউ তাঁর পাণ্ডিত্যে হয়ে যান মুগ্ধ। সেলজুক শাসকদের প্রধানমন্ত্রী নিজাম-উল-মুলকও আল-গাজালির মনীষায় আকৃষ্ট হন। নিজাম-উল-মুলক একজন অসাধারণ পণ্ডিত ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁরই নামানুসারে সে-সময় পারস্য ও ইরাকে মোট ন-টি নিজামিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। এইসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সিলেবাস হল— 'দারসে নিজামি', যা আজও পৃথিবীর বহু ইসলামি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রচলিত। নিজাম-উল-মুলক আল-গাজালির ব্যক্তিত্ব শিক্ষাদীক্ষা ও জ্ঞানার্জনের মাঝে তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'নিজামিয়া মাদ্রাসা'র জন্য যোগ্য অধ্যক্ষ আবিষ্কার করেন। মুসলমান বিশ্বে এ-পদ তখন ছিল অত্যন্ত গৌরবের ও সম্মানের। এ-পদ ছিল লোভনীয় ও আকর্ষণীয়ও।

আল-গাজালির বাগদাদে অধ্যক্ষ পদ গ্রহণকালে বয়স ছিল মাত্র চৌতিরিশ বছর। উল্লেখ্য যে, এই শিক্ষায়তনের প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন পারস্যের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ আবু ইসহাক আল-শিরাজি (১০০৩—১০৮৩)। তিনি মাত্র কয়েক বছর অধ্যক্ষরূপে এই পদে অধিষ্ঠিত থেকে মৃত্যুবরণ করেন। এত কম বয়সে আল-গাজালির এ-পদে যোগদানে অনেকেই অতি মাত্রায় চিন্তিত ও বিস্মিত হন। কেউ কেউ এই সুযোগে আল-গাজালির প্রতি পরশ্রীকাতরতায় কুৎসা রটনা করেন। নির্ভীক আল-গাজালি কবিতার মাধ্যমে তাঁদের প্রত্যুত্তর দেন, যার মর্মার্থ হল: "এদের শত্রুতার কালো মেঘ চারিদিক হতে আমাকে ঘিরে ফেলছে। কিন্তু তারা যে মিথ্যার ধূম্রজাল রচনা করেছে, তারই ভেতর দিয়ে সত্যের উজ্জ্বল আলো তীব্রতর হয়ে (আমার অনুকূলে) ফুটছে না কি? তারা আমার শিক্ষার ত্রুটিই দেখাক বা মিথ্যা প্রচারণাই করুক, অথবা ভুল করে মণি ফেলে ধুলো জড়ো করুক,

কথিত আছে, শ্রেণিকক্ষে তাঁর উৎকৃষ্ট ভাষণ শিষ্যগণ লিখে রাখত। এগুলো এতই পাণ্ডিত্যপূর্ণ যে, তাঁর এক ছাত্র শেখ সাইদ বিন আল-ফারেস ওই নোটগুলির সংকলন গ্রন্থ 'মাজালেসে গাজালি' দুই খণ্ডে প্রকাশ করলে, তা প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে সুধী-সমাজে সমাদৃত হয়।

তাতে আমার কিছু আসে যায় না। লোকে কদর না করলেও মণি মণিই থাকে।" ('পারস্যপ্রতিভা', মোহম্মদ বরকতুল্লাহ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৭।)।

এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অনেক প্রবীণ শিক্ষক থাকলেও নবনিযুক্ত অধ্যক্ষ আল-গাজালি নিজের যোগ্যতার বলে সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। তাঁর উৎকৃষ্ট বক্তৃতায়, ধর্মতত্ত্বের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে এবং জটিল বিষয়ের পরিষ্কার ফতোয়ায় বাগদাদবাসীরা মুগ্ধ হন। সে-সময়ের পণ্ডিতবর্গ ও সাধারণ জনগণ সবারই নয়নের মণি হয়ে উঠলেন তিনি। তাঁর আর্থিক উন্নতি

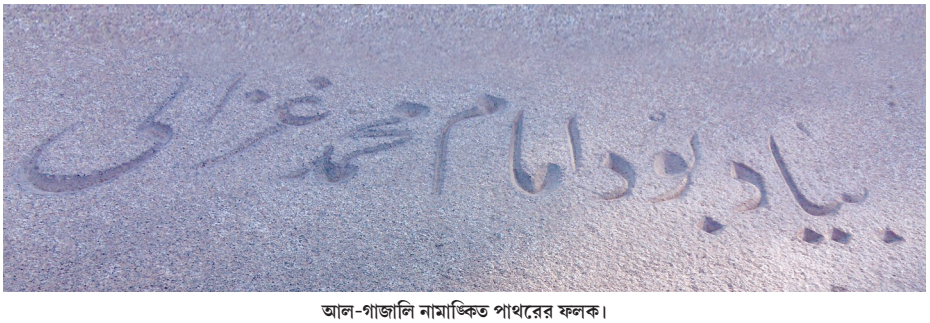

আল-গাজালি নামাঙ্কিত পাথরের ফলক।

ও পদমর্যাদাও ধাপে ধাপে বাড়তে লাগল। তাঁকে আশারীয় ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠ ধর্মতাত্ত্বিক হিসেবে গণ্য করা শুরু হয়। ধর্মীয় ও রাজনীতির ক্ষেত্রে উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীর তুলনায় তাঁর উপদেশ বেশি গ্রহণ করা হত। ফলস্বরূপ তাঁকে সমগ্র ইরাক ও খোরাসানের ইমাম নিযুক্ত করা হয়।

কথিত আছে, শ্রেণিকক্ষে তাঁর উৎকৃষ্ট ভাষণ শিষ্যগণ লিখে রাখত। এগুলো এতই পাণ্ডিত্যপূর্ণ যে, তাঁর এক ছাত্র শেখ সাইদ বিন আল-ফারেস ওই নোটগুলির সংকলন গ্রন্থ 'মাজালেসে গাজালি' দুই খণ্ডে প্রকাশ করলে, তা প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে সুধী-সমাজে সমাদৃত হয়। ('কিমিয়ায়ে সা আদাত'-ইমাম আল-গাজালি, অনুবাদ: 'সৌভাগ্যের পরশমণি', আবদুল খালেক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০৮।)।

সংশয়বাদ ও নিজামিয়া ত্যাগ

নিজামিয়ার অধ্যক্ষ পদে তাঁর কার্যকাল চার না ছ-বছর, সে নিয়ে ইতিহাসকার ও গবেষকদের মতে বিতর্ক আছে। সে যাই হোক, ওই সময় তিনি বাগদাদের শাহি গ্রন্থাগারে মনোবিজ্ঞান, জড়বিজ্ঞান, প্রাণীবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি বিশেষভাবে অধ্যয়ন করেন। শত শত গ্রন্থ তিনি পাঠ করেন এবং অনন্ত জ্ঞানসমুদ্রে ডুবে থাকতেন কিন্তু সমুদ্রের তলদেশ তাঁর পক্ষে দেখা সম্ভব হয়নি। এতে তাঁর কৌতূহলী মন ক্রমশ অশান্ত হয়ে ওঠে। পুথিগত বিদ্যার কিছু তো বাকি রইল না, মানুষের ইন্দ্রিয়লব্ধ অনুভূতির এইসব তথ্য ও জ্ঞান নির্ভুল কি? যথার্থ পরম সত্যের সন্ধান কোথায় পাওয়া যায়? তাঁর ধারণা হল, পুথিগত জ্ঞান বাহ্যিক ও অকিঞ্চিৎকর, তাকে মূলধন করে কী করে মানুষ পাণ্ডিত্যের অভিমান করে? বিশুদ্ধ জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে একাগ্র সাধনা ও কঠোর অনুশীলন আবশ্যক। তাঁর মতে, মানুষের সদ্‌গুণ বিকাশের জন্য অক্লান্ত সাধনা এবং একনিষ্ঠ সংযমের প্রয়োজন। তিনি অন্তর বা অভ্যন্তরীণ দিক থেকে বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক চরম সংকটের কাল অতিবাহিত করেছেন। আল-গাজালির এই সংশয়বাদ পশ্চিম-দেশীয় প্রত্যক্ষবাদী দর্শনের অগ্রদূত। ইংরেজ দার্শনিক রজার বেকন (১২১৪—১২৯৪) ও ফরাসি দর্শনবিদ্যাজ্ঞ রেনে দেকার্ত (১৫৯৬—১৬৫০)— উভয়েই যে-প্রত্যক্ষবাদের প্রবর্তন করেন, তারও মূলে রয়েছে এই সংশয়বাদ।

ধীরে ধীরে তাঁর বিশ্বাস জন্মাল, তিনি যে এতকাল ধরে হাজার হাজার বিরাটকায় গ্রন্থ পাঠ করেছেন এবং বহু গ্রন্থাগার উজাড় করেছেন, তাতে তাঁর প্রকৃত জ্ঞানলাভ কিছুই হয়নি। এসবই ছিল বাহ্যিক জ্ঞান এবং সত্যের সন্ধান এতে কিছুই পাওয়া যায় না। এই সুদীর্ঘ সময়-ব্যয় ও পরিশ্রম বৃথা। ব্যর্থতার এই নিষ্করুণ আঘাতে তিনি জীবন ও সংসারের ওপর থেকে উদাসীন হয়ে পড়েন। মানুষের দেওয়া সম্মান, শাহি দরবারের মর্যাদা, নিজামিয়ার আলোচনা ও বিতর্কসভা সবই একে একে নীরস ও কৃত্রিম মনে হতে লাগল।

শাহি দরবার ও নিজামিয়া যাওয়া তিনি বন্ধ করলেন। বন্ধুবান্ধবের সংশ্রব ত্যাগ করলেন। নিজের খাওয়াদাওয়াও প্রায় বন্ধ করলেন। একের পর এক জাগতিক কার্যকলাপ থেকে তিনি নিজেকে আলাদা করতে শুরু করেন। খাওয়াদাওয়া ত্যাগের ফলে তাঁর স্বাস্থ্য দিন দিন ক্ষয়প্রাপ্ত হতে লাগল। তাঁর ক্ষুধা ও হজমশক্তি কমে যায় এবং তিনি কথা বলার শক্তিও প্রায় হারিয়ে ফেলেন। তদুপরি চিকিৎসকদের পরামর্শও অগ্রাহ্য করলেন। বিনা কারণে রোজা রাখা ও নিজ রসনার ওপর কঠোর সংযম আরোপ করেন। নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া কথা বলতেন না। এতকিছু করেও তাঁর মানসিক শান্তি এল না। এমতাবস্থায় তিনি ভাবলেন, নিজামিয়ার প্রাসাদোপম আবাসে তিনি শান্তির দেখা কোনোদিন পাবেন না। এবং সিদ্ধান্ত নিলেন নিজামিয়া তথা বাগদাদ ত্যাগের। পরবর্তীতে বেশ কিছুদিন হল, বাগদাদের রাস্তাঘাটে সুদর্শন ও সুকেশী নিজামিয়ার অধ্যক্ষের আর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। নগরে নানা জল্পনা চলল এবং ১০৯৮ খ্রিস্টাব্দের এক সকালে লোকেরা দেখল আল-গাজালি একটি কম্বল গায়ে দিয়ে নগরের তোরণ অতিক্রম করছেন। লোকেরা নিজেদের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না, কিন্তু এটাই বাস্তব যে বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক চরম সংকটে আল-গাজালি চল্লিশ বছর বয়সে নিঃস্ব ও রিক্ত হয়ে চরম সত্যের সন্ধানে সবকিছু ত্যাগ করে দরবেশ বেশে বেরিয়ে পড়লেন। তাঁর জীবনীকার ও এককালের সহশিক্ষক আল-ফারিসির মতে, "এক রহস্য-লোকের দুয়ার তাঁর নিকট খুলে গেল, যার ফলে তিনি আল্লাহ্ ব্যতীত সবকিছুই পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন।"

১. দামাস্কাস, ২. জেরুসালেম, ৩. মদিনা, ৪. মক্কা, ৫. আলেকজান্দ্রিয়া— এই শহরগুলিতে আল-গাজালি পর্যায়ক্রমে আধ্যাত্মিক ভ্রমণ করেন।

আল-গাজালির সমাধি-দ্বার। ইরান।

মৃত্যুর পর আল-গাজালির বালিশের নীচে একটি কবিতা পাওয়া যায়, যার সারমর্ম: "আমার মৃত্যুর পর আমার প্রিয় বন্ধুগণ যখন শোকে কাঁদতে থাকবে, তখন তাদেরকে বলো, আমার দেহটা আমি ছিলাম না, উহা একটি মাংসপিণ্ড মাত্র; আসল আমি আমার আত্মা (যা অবিনশ্বর)।"

দেশত্যাগ ও আধ্যাত্মিক ভ্রমণ

'মিশকাত আল-আনওয়ারে'র বাংলা তরজমাকারী অধ্যাপক মোহাম্মদ হালিম আল-গাজালির দেশত্যাগ বিষয়ে মন্তব্য করেন, "সম্ভবত হজব্রত পালনের উদ্দেশ্যে তিনি বাগদাদ ত্যাগ করেন; কিন্তু বাস্তবে মনের নিশ্চয়তা ও আত্মার শান্তির জন্য তিনি সুফির ধর্মীয় নীতি এবং নির্জন সাধনার তন্ময়তা অনুশীলনের জন্য বেরিয়ে পড়েন। পরিবারের জন্যে কিছু অর্থ ব্যতীত তিনি সমস্ত সম্পদ বর্জন করেন এবং সিরিয়ার অভিমুখে অগ্রসর হন।"

আল-গাজালির ছিল এক অসাধারণ অনুসন্ধিৎসু মন। জাগতিক জ্ঞান তাঁর মনের তীব্র তৃষ্ণা মেটাতে পারেনি। সে-কারণেই এই আধ্যাত্মিক জ্ঞান অন্বেষণের তীব্র আকুতি ও উদগ্র জ্ঞানপিপাসা ছিল। দেশ-বিদেশের প্রায় সকল দার্শনিক ও ধর্মতত্ত্ববিদের মতবাদ তিনি গভীর মনোনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করেও মানসিক শান্তি পাননি। ফলে অজ্ঞাত এক রহস্যের সন্ধানে সংসারবিরাগী সুফি-দরবেশের বেশে জীবনের দশটি বছর নানা দেশ ভ্রমণে অতিবাহিত করেন।

নিজামিয়াতে অবস্থানকালে তিনি মূল্যবান পোশাকপরিচ্ছদ পরতেন, কিন্তু দেশত্যাগ করে পরিভ্রমণকালে তিনি নিতান্ত সাধারণ পরিচ্ছদে মোটা চাদর-কম্বলে থাকতেন, তবুও তাঁকে প্রফুল্লিত মনে হত। বাগদাদ ত্যাগ করে তিনি সিরিয়ার দামাস্কাস শহরে পৌঁছোন। এখানে উমাইয়া জামে-মসজিদে কিছুকাল থাকেন। ওই মসজিদের পাশে বিরাট এক মাদ্রাসা ছিল। তিনি ওই মসজিদের এক প্রান্তে অধিকাংশ সময় মুরাকাবা (ধ্যান করা) ও মুশাহাদায় (কঠোর চেষ্টা) মগ্ন থাকতেন। আল-গাজালি বিষয়ে বিশিষ্ট গবেষক নোরানি আবু বকরের মতে, এই সময় আল-গাজালি উজলা অর্থাৎ একাকিত্ব অবস্থায় সব সময় ছিলেন না। তিনি সেখানকার জাওইয়া আল-ফাতহ মাদ্রাসায় (পরবর্তীতে এটি গাজালিয়া মাদ্রাসা হিসেবে পরিচিত হয়) পড়িয়েছেন, শহর পরিভ্রমণ ও গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি একাকী পরিভ্রমণও করেননি, তাঁর সাথে ছিলেন আবু তাহির আল-সাব্বাক নামের তাঁর সহপাঠী। এখানে তিনি আবুল ফাতহ নাসর নামক এক সুফির সান্নিধ্যে ছিলেন। ('Al-Ghazali– His life (1058–1111) and his personal crisis', Norani Abu Bakar, Wordpress.com)

আল-গাজালির স্মৃতিসৌধ। ইরান।

দু-বছর দামাস্কাস শহরে থাকার পর তিনি জেরুসালেমের বায়তুল মুকাদ্দাস যান। এখানে তিনি সাখরাতুস্‌সাম্মা নামক বিখ্যাত পাথরের নিকট এক নির্জন প্রকোষ্ঠে সর্বদা জিকির (আল্লাহ্‌র নাম জপ) ও ফিকিরে (স্রষ্টা বিষয়ে চিন্তা) মশগুল থাকতেন। এরই মাঝে তিনি সময় সময় পবিত্র মাজারসমূহে জিয়ারত (কবর বা পুণ্যস্থান দর্শন ও প্রার্থনা) করতেন। প্রায়শই তিনি আল-আকসা মসজিদে নামাজপাঠ ও ধ্যানে নিমগ্ন থাকতেন। তিনি হেব্রনের মকামে-খলিল নামক স্থানে হজরত ইব্রাহিম (আ.)-এর মাজারে জিয়ারত করে তিনটি প্রতিজ্ঞা করেন: কখনও কোনো রাজদরবারে যাবেন না, কোনো বাদশাহের দান বা বৃত্তি গ্রহণ করবেন না এবং কারো সাথে বিতর্কে প্রবৃত্ত হবেন না।

এখান থেকে আল-গাজালি মদিনায় পৌঁছোন এবং মহানবি মুহাম্মদ (স.)-এর পবিত্র রওজা (সমাধিস্থল) জিয়ারত করে কিছুকাল ওখানে অবস্থান করেন। মদিনা থেকে তিনি পবিত্র মক্কায় যান এবং হজ পালন করেন। এখানে তিনি দীর্ঘকাল অবস্থান করেন। মক্কা ও মদিনায় অবস্থানকালে তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের জ্ঞানীগুণীদের সাথে সাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা করেন। মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ার অভিজ্ঞতা অর্জনে তিনি সেখানে কিছুকাল ব্যয় করেন। এরপর নিজের জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্তনের পথে পুনরায় মক্কা ও মদিনা জিয়ারত করেন।

বাগদাদ থেকে বেরিয়ে দামাস্কাস, জেরুসালেম, মক্কা-মদিনা ও আলেকজান্দ্রিয়ায় প্রায় দশ বছরকাল তিনি বন-জঙ্গল, জনপদ, মরুপ্রান্তর, নদীনালা পরিভ্রমণ করেন। সে-কালে যাতায়াতের জন্য পশুর বাহন ছাড়া অন্য কোনো মাধ্যম ছিল না। কিন্তু এত কষ্টকর ভ্রমণেও তিনি সত্যের খোঁজে সর্বদা মশগুল থাকতেন। ইবাদত (উপাসনা), বন্দেগি (আনুগত্য), রিয়াজত (আত্মশুদ্ধির চেষ্টা) ও মুজাহাদায় (সাধনা) কোনোপ্রকার শিথিলতা বা ত্রুটি করেননি। তাঁর অন্তর নির্মল ও পরিষ্কার হয়ে যায় এবং দিব্যজ্ঞান অর্জনের সমস্ত বাধা বিদূরিত হয়। যে-উদ্দেশ্যে তিনি বিশ্ব-পরিভ্রমণে বেরিয়েছিলেন, তা অনেকটাই সফলতা পায়।

পুনরায় নিজামিয়ার অধ্যক্ষপদ গ্রহণ

জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি দেখলেন যে, নানারকম বিড়ম্বনায় মুসলমান সমাজ ভুগছে। জড়বাদী দর্শন, বিজ্ঞানের নানান উদ্ভাবন ও মুসলমানদের নিজেদের মধ্যেকার ধর্মীয় বিধানের নানান ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ— মুসলমান সমাজকে করেছে শিথিল, ভঙ্গুর ও বিভ্রান্ত। এই কঠিন পরিস্থিতিতে ইসলামের প্রকৃত স্বরূপ ফিরিয়ে আনতে তিনি ইসলামের প্রচার প্রসার ও বিশ্লেষণে আত্মনিয়োগ করেন। বাগদাদের প্রয়াত সুলতান মালিক শাহের পুত্র সুলতান আহমদ সানজার (১০৮৫—১১৫৭)-এর প্রধানমন্ত্রী ফখর-উল-মুলক (ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী নিজাম-উল-মুলকের জ্যেষ্ঠপুত্র) আল-গাজালিকে পুনরায় নিজামিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষপদ গ্রহণের অনুরোধ জানান। তাঁর বহু শুভাকাঙ্ক্ষী ও বন্ধু ধর্মশিক্ষা প্রসারের এই সুযোগ গ্রহণের অনুরোধ জানালে, তিনি তা গ্রহণ করেন। আগের মতো অতিশয় উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে তিনি এই দায়িত্ব পালন শুরু করেন। কিন্তু এক বছর পরেই আরবি মহরম মাসে এক ইসমাইলি গুপ্তঘাতকের হাতে ফখর-উল-মুলক নিহত হন। এই ঘটনায় আল-গাজালি খুবই বিব্রত হয়ে নিজামিয়া থেকে পদত্যাগ করেন। এই খবর সুলতান সানজারের

কাছে পৌঁছোলে নিজামিয়ার শ্রীবৃদ্ধি ও গৌরব ব্যাহত হতে পারে ভেবে, আল-গাজালিকে পদত্যাগপত্র ফিরিয়ে নিতে বার বার অনুরোধ করেন। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই তিনি রাজি হননি। কয়েক জন গবেষকের মতে বিদ্যোৎসাহী নিজাম-উল-মুলক ও তাঁর পুত্র ফখর-উল-মুলকের সাথে আল-গাজালির ব্যক্তিগত মধুর সম্পর্ক থাকায় তাঁদের অনুরোধ তিনি অতীতে অগ্রাহ্য করতে পারেননি। এ ছাড়া বায়তুল মুকাদ্দাসের মাকামে-খলিলে তাঁর প্রতিজ্ঞা তাঁকে সুলতানের অনুরোধ রক্ষা করতে বাধা দেয়। ফলশ্রুতিতে সুলতানের বেশকিছু গুণগ্রাহী আল-গাজালির বিরুদ্ধে সুলতানকে উত্তেজিত করে এক আপাত বৈরিতার অপচেষ্টা চালায়। কিন্তু দৃঢ়চেতা আল-গাজালির সামনে সুলতানও তাঁর নিজের ভুল বুঝতে পেরে লজ্জিত হন।

নিজামিয়া ত্যাগ করে তিনি নিজ বাসভূমি তুসে ফিরে যান। সেখানে একটি মাদ্রাসা ও খানকাহ (ধর্মগুরুর বৈঠকখানা) প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষার্থী ও আল্লাহ্‌র পথের পথিকদের শিক্ষাদীক্ষা দিতে থাকেন। পাশাপাশি চলে জ্ঞানসাধনা এবং দর্শন, আইনশাস্ত্র ও ধর্মতত্ত্বের নানান গ্রন্থরচনা। জীবনের সুখ দুঃখ এবং জাগতিক সব প্রলোভনের মায়া কাটিয়ে তিনি একমাত্র আল্লাহ্‌র ধ্যানে নিমগ্ন থাকতেন। আত্মা ও সৃষ্টিকর্তার গোপন রহস্য উদ্ঘাটনে তাঁর সাধনার অন্ত ছিল না। এ-সম্পর্কে তিনি যে-জ্ঞানলাভ করেন, তা যেমনই পূর্ণাঙ্গ ও গভীর, তেমনই ছিল অভিনব। এ-জ্ঞানের আলোয় জগতের বিভ্রান্ত বিশ্বাসীগণ পুনরায় সঠিক পথের সন্ধান পায়। তাঁর বলিষ্ঠ যুক্তি ও অভ্রান্ত মতবাদের কাছে পূর্ববর্তী ধর্মতাত্ত্বিক ও দার্শনিকের চিন্তাধারা ম্লান দেখায়। এ-কারণেই তাঁর আর-এক নাম 'হুজ্জাতুল-ইসলাম' অর্থাৎ 'ইসলামের প্রমাণ'। প্রায় এক হাজার বছর আগেকার এ-মনীষীর দর্শন ও চিন্তাধারা প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সব মহাদেশেই আজও প্রবলভাবে অস্তিত্ববান।

তাঁর বলিষ্ঠ যুক্তি ও অভ্রান্ত মতবাদের কাছে পূর্ববর্তী ধর্মতাত্ত্বিক ও দার্শনিকের চিন্তাধারা ম্লান দেখায়। এ-কারণেই তাঁর আর-এক নাম 'হুজ্জাতুল-ইসলাম' অর্থাৎ 'ইসলামের প্রমাণ'। প্রায় এক হাজার বছর আগেকার এ-মনীষীর দর্শন ও চিন্তাধারা প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সব মহাদেশেই আজও প্রবলভাবে অস্তিত্ববান।

চিরবিদায়

বিস্ময়কর প্রতিভা, দার্শনিক, সুফিসাধক ইমাম আল-গাজালির ১৯ ডিসেম্বর ১১১১ খ্রিস্টাব্দে (৫০৫ হিজরি) দেহাবসান ঘটে। তাঁর চিরবিদায় নিয়ে তাঁর ভাই আহম্মদ আল-গাজালি লিখেছেন, "সোমবার দিন অতি প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করে তিনি স্বভাবসিদ্ধ অভ্যাস অনুসারে ওজু করে ফজরের নামাজ আদায় করেন। তারপর আগে তৈরি করা তাঁর কাফনটি চেয়ে নিলেন এবং এটি চোখে স্পর্শ করিয়ে বললেন, প্রভুর আদেশ শিরোধার্য। কথাটি মুখ হতে বের হওয়ার সাথে সাথে তিনি নিজের পা-দুটি প্রসারিত করলেন এবং সেই মুহূর্তেই আল্লাহ্‌র নিকট প্রাণ সমর্পণ করে দেন।" ('সৌভাগ্যের পরশমণি', আবদুল খালেক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০৮।)।

মৃত্যুর পর আল-গাজালির বালিশের নীচে একটি কবিতা পাওয়া যায়, যার সারমর্ম: "আমার মৃত্যুর পর আমার প্রিয় বন্ধুগণ যখন শোকে কাঁদতে থাকবে, তখন তাদের বলো, আমার দেহটা আমি ছিলাম না, ওটি একটি মাংসপিণ্ড মাত্র; আসল আমি আমার আত্মা (যা অবিনশ্বর)।"

"আমার সফর শেষ হয়েছে, আমি চললাম। তোমরা যারা পিছে পড়ে রইলে, তোমাদের শিরে সতত বর্ষিত হোক আল্লাহ্‌র রহমত।" ('পারস্যপ্রতিভা', মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৭।)। ■

আল-আমীন বার্তা

দেখে পড়ার ▮ পড়ে দেখার

আল-আমীন মিশন

একটি পরিবার। এই পরিবারের সদস্য আপনিও।

পরিবারের মুখপত্র

আল-আমীন বার্তা

নিজে পড়ুন। অন্যকে পড়ান

গত ২৮ বছরে আল-আমীন মিশন সমাজকে উপহার দিয়েছে বহু কৃতী ছাত্রছাত্রী। পড়াশোনায় সাফল্যের পর তাঁরা দেশে-বিদেশে গুরুত্বপূর্ণ পেশায় অথবা গবেষণায় ব্যস্ত। সেইসব প্রাক্তনীদের উপস্থিতি এই বিভাগে। এই সংখ্যায় চিকিৎসক

সেখ হাম্মাদুর রহমান

সাধারণের মধ্যেই অসাধারণের মহত্ত্ব

আসাদুল ইসলাম

চিকিৎসকের সন্তান চিকিৎসক হবেন, শিক্ষকের সন্তান শিক্ষক— এমনটাই ভাবতে অভ্যস্ত অনেকে। কেননা, চোখের সামনে সাধারণত এরকমটাই ঘটতে দেখে মানুষ। কিন্তু যে-সমাজে পড়াশোনা জানা মানুষের সংখ্যাই কম, সেই সমাজের মানুষেরা কি ওই আপ্তবাক্য আওড়ে হা-হুতাশ করেই জীবন কাটাবে? প্রথম প্রশ্ন এটা। দ্বিতীয় কথা, আজকাল রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে সাধারণ আলোচনার ক্ষেত্রেও সংখ্যালঘু মুসলমান সমাজের উদ্দেশ্যে বলা হয়, ধর্মীয় শিক্ষার সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানশিক্ষাও আমাদের অর্জন করতে হবে। প্রায় তিন দশক আগে আল-আমীন মিশন এ-কথা বলতে শুরু করে। সেই ভাবনা থেকেই আবাসিক শিক্ষা আন্দোলনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে ধর্মীয় শিক্ষার সঙ্গে আধুনিক শিক্ষার মেলবন্ধন ঘটানোর কাজ শুরু হয়। ধর্মীয় শিক্ষার সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানশিক্ষা তো অর্জন করতেই হবে, এরসঙ্গে আল-আমীন মিশনের প্রাণপুরুষ এম নুরুল ইসলামকে আরও একটা কথা বলতে শুনেছেন অনেকেই: আমরা দেখতে চাই ইমাম সাহেবের, মাওলানা বা মুফতি সাহেবের ছেলেমেয়েরাও ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হচ্ছে। বিশ্বমানের দক্ষতা অর্জন করে তারা দেশে-বিদেশে, বিশ্বের যেকোনো প্রান্তেই যাক-না-কেন, তাদের শিকড়টা ঠিক আছে। এই বক্তব্যকে কতটা বাস্তবায়িত করতে পেরেছে আল-আমীন মিশন, তা জানার জন্য এ-বারের উজ্জ্বল প্রাক্তনী বিভাগের লেখাটা পড়ে দেখা জরুরি।

এই সংখ্যায় আলোচিত আল-আমীন মিশনের উজ্জ্বল প্রাক্তনীর নাম সেখ হাম্মাদুর রহমান। হাম্মাদুরের বাড়ি বর্ধমান জেলার কাটোয়া থানার কৈথন গ্রামে। হাম্মাদুরের দাদাজি জিল্লুর রহমান পড়াশোনা জানতেন না। চাষাবাদ করে জীবনযাপন করতেন। জিল্লুর রহমানের তিন পুত্রসন্তানের মধ্যে একমাত্র, বড়োছেলে, হাম্মাদুরের আব্বা সাইদুর রহমান পাড়াশোনা জানেন। বিদ্যালয় স্তরে তিনি ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করার পর ধর্মীয় শিক্ষায় মুফতি ডিগ্রি অর্জন করেছেন উত্তর প্রদেশের বিখ্যাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে। ধর্মীয় শিক্ষা অর্জন মানে ইমামতি বা কোনো খারিজি মাদ্রাসায়

সেখ হাম্মাদুর রহমান।

শিক্ষকতা। নসিব ভালো থাকলে মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদ যে সাতশোর মতো মাদ্রাসা পরিচালনা করে, সেখানে জুটে যেতে পারে শিক্ষকতার চাকরিও। এই অলিখিত ভবিষ্যতের স্তর ছুঁয়ে সাইদুর রহমানও দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেছেন একটি খারিজি মাদ্রাসায়। পরে একটি সিনিয়র মাদ্রাসায় শিক্ষকতার চাকরি পান। অন্যদিকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা জানা হাম্মাদুরের মা সাকিয়া বিবি সংসার সামলানো গৃহবধূ। শুধু সংসার সামলানো গৃহবধূ বললে

বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে। ডানদিক থেকে দ্বিতীয় সেখ হাম্মাদুর রহমান।

সাকিয়া বিবির সংগ্রামকে খানিকটা খাটো করে বলা হয়। কেননা, সাইদুর সাহেব যখন সামান্য উপার্জনের তাগিদে পড়ে থাকতেন খারিজি মাদ্রাসায়, তখন ছেলেমেয়েদের মানুষ করার সমস্ত দায়ভারই বহন করতে হয়েছিল তাঁকেই। সপ্তাহ বা পনেরো দিনে একবার, এক দিন বা দু-দিনের জন্য এসে সাইদুর সাহেবই-বা কী করতে পারতেন? তাঁর সৎ পথে উপার্জিত সামান্য অর্থকে সঠিক পথে ব্যয় করে সংসারকে আরও একটু স্বচ্ছলতা, আরও একটু সম্মানের জায়গায় নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছাটাকে মূলধন করে, দুই ছেলে দুই মেয়েকে উচ্চশিক্ষিত করতে পেরেছেন সাকিয়া বিবি। কতটা উচ্চশিক্ষিত? পরিবারের পড়াশোনার পূর্বইতিহাস তো ইতিমধ্যে খানিকটা বলেছি। এমন পরিবারে সাইদুর সাহেবের মেজোছেলে হাম্মাদুর সর্বভারতীয় স্তরে অত্যন্ত গৌরবজনক সাফল্য পেয়েছেন। তাঁর কথা বিস্তারিত জানার সুযোগ পাব এই লেখায়। অন্য তিন ভাইবোনের কথা একটু বলে নেওয়া যাক। বড়ো সাজ্জাদুর রহমান বিএ পাস। বড়োবোন নাসিমা আল-আমীন মিশন থকে মাধ্যমিকে ৭৪ শতাংশ এবং উচ্চমাধ্যমিকে ৬৫ শতাংশের কাছাকাছি নম্বর নিয়ে পাস করেছিলেন। ইংরেজি অনার্স নিয়ে পড়তে পড়তে তাঁর বিয়ে হয়ে যায়। ছোটোবোন নাইমা রহমান আল-আমীন মিশনে ক্লাস ফাইভ থেকে টুয়েলভ পর্যন্ত পড়েছেন। মাধ্যমিকে স্টার ও উচ্চমাধ্যমিকে ৭০ শতাংশের মতো নম্বর পেয়েছিলেন। বর্তমানে ম্যাথমেটিক্সে অনার্স করছেন, আর সবকে ছাড়িয়ে গিয়েছেন হাম্মাদুর। এ-বার আমরা তাঁর কথায় আসি।

হাম্মাদুরের শৈশব কেটেছে গ্রামে। কলকাতা থেকে গ্রামের দূরত্ব একশো সত্তর কিমির মতো। কালনা, নবদ্বীপ ছুঁয়ে ট্রেন যাচ্ছে কাটোয়া। কাটোয়া থেকে কৈথন গ্রামের দূরত্ব চোদ্দো কিমি। অন্যভাবে বর্ধমান শহর থেকে কাটোয়া হয়েও যাওয়া যায়। গ্রামের বারো হাজার মানুষের মধ্যে ৭০ শতাংশ মুসলমান। কৃষিপ্রধান গ্রামে প্রধান ফসল ধান। বছরে তিন বার ধান হয়। আর্থিক অবস্থা তত ভালো না হওয়ায় হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে পড়াশোনার হার কমছিল এক সময়। এখন কেরালায় গিয়ে রাজমিস্ত্রির কাজ করার কারণে খানিকটা আর্থিক অবস্থা ফিরেছে। এই বাড়তি অর্থোপার্জন প্রলুব্ধ করেছে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের। টেনেটুনে মাধ্যমিক দিয়ে বা তারও আগেই পড়া ছেড়ে দিয়ে কাজের খোঁজে বাইরে চলে যাচ্ছে অনেকেই। গ্রামেই দু-মিনিটের হাঁটাপথের দূরত্বে, একটা প্রাইমারি স্কুল আছে। কৈথন মিলন অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়। এখন যেটা কৈথন উচ্চবিদ্যালয়, হাম্মাদুরের সময় সেটা ছিল জুনিয়র হাইস্কুল। উচ্চপ্রাথমিক স্তর শেষ করে তখন কুড়ুম্বা গ্রামের হাইস্কুলে যেতে হত। হাম্মাদুরও এই স্কুলগুলো ছুঁয়ে আল-আমীন মিশন হয়ে, গিয়ে পৌঁছেছেন চিকিৎসাবিদ্যায় ভারতের সর্বোচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দিল্লির অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সে। এমবিবিএস করার পর এমডি করেছেন। এখন সুপার স্পেশালিস্ট হতে ডিএম বা ডক্টরেট অফ মেডিসিন করার লক্ষ্যে এইমসে ভর্তি হয়েছেন। একজন মুফতির ছেলে কীভাবে এমন অসামান্য হয়ে উঠলেন? শুনুন সে-কথা।

যে-সূত্রে একজন ডাক্তারের ছেলে ডাক্তার হবে ভাবা হয়, সেই সূত্রেই মুফতির ছেলে মুফতি বা মাওলানা হওয়ার কথা। আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণেই হোক বা অন্যকোনো ভাবনা থেকে সাকিয়া বিবি ছেলেমেয়েদের স্কুলে ভর্তি করেছিলেন। তা বলে তিনি ছেলেমেয়েদের ধর্মীয় তালিম দিতে ভোলেননি। হাম্মাদুররা আব্বা-মায়ের কাছে আরবি শেখার পাশাপাশি মসজিদের মক্তবেও গিয়ে আরবি পড়তে শিখেছেন। ফলে চার ভাইবোনেই কোরআন শরিফটা ভালোভাবে পড়তে পারেন। হাম্মাদুর যখন ক্লাস এইটে পড়েন, তখন পর্যন্ত তাঁর আব্বা খারিজি মাদ্রাসাতে পড়াতেন। তার মানে পুরো শৈশবটাই আর্থিক অস্বচ্ছলতাকে সঙ্গী করে বড়ো হতে হয়েছে তাঁকে। হাম্মাদুরদের বিঘে দেড়েক জমিতে, চাচাদের আর্থিক অবস্থা আরও খারাপ হওয়ার কারণে, চাচারা চাষ করতেন। এখন গ্রামে বিদ্যুৎ এলেও, তখন হাম্মাদুরদের হ্যারিকেনের আলোতেই পড়াশোনা করতে হয়েছে। টিউশন পড়ার ক্ষেত্রে গ্রামের দিকে যেমন ইংরেজি আর বিজ্ঞান বিভাগের জন্য সবাই টিউশন নেয়, তেমন হাম্মাদুরও নিতেন। অবশ্য ক্লাস এইট পর্যন্ত একটা স্যারেই তাঁকে চালাতে হয়েছে। প্রাইভেট পড়ার বেতন কখনওসখনও বাকি পড়ে গেলে স্যারেরা নিতেন না। এতসব অনটনকে পাশ কাটিয়ে হাম্মাদুর পড়াশোনাটা কীরকম করতেন? প্রথম থেকেই কি দুর্দান্ত মেধাবান হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিলেন? নাকি একাগ্রতা, প্রচেষ্টায় অর্জন করেছেন অভাবনীয় সাফল্য? প্রাইমারিতে হাম্মাদুর ক্লাস ফোরেই একবার মাত্র প্রথম হয়েছিলেন। প্রথম হতেন হাইস্কুলের শিক্ষকপুত্র আসাদুজ্জামান, যিনি আবার আল-আমীন মিশনে পড়াশোনা করে হাইস্কুলে শিক্ষকতা করছেন এখন। প্রাইমারির গণ্ডি টপকে হাম্মাদুর হাইস্কুলে গিয়েও যে প্রথম দিকে দারুণ রেজাল্ট করেছিলেন, তা নয়। ক্লাস ফাইভে থার্ড, সিক্সে ফোর্থ, সেভেনে ফোর্থ, এইটে ফোর্থ। গ্রামের দিকের একটা হাইস্কুলের এমন ছাত্র যে ভবিষ্যতে সর্বভারতীয় স্তরে বহু মেধাবান ছাত্রছাত্রীকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাবেন, সে-কথা কি কেউ ভাবতে পারবেন? বদল ঘটতে শুরু করল ক্লাস নাইন থেকেই। কুড়ুম্বা গ্রামের গোপালপুর এস এম পি বিদ্যাপীঠে নাইন-টেন দু-বছর পড়েন। নাইনে সেকেন্ড হন হাম্মাদুর। সেকেন্ড হলেও, প্রথম হওয়া মহাকরণে চাকরি করা বাবার সন্তান শ্যামা যশের চেয়ে নম্বরের ফারাক ছিল খুবই কম। শ্যামা

হাম্মাদুর গ্রামের স্কুল ছুঁয়ে আল-আমীন মিশন হয়ে, গিয়ে পৌঁছেছেন চিকিৎসাবিদ্যায় ভারতের সর্বোচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দিল্লির অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সে।

পরবর্তীতে স্কুল-টিচার হয়েছেন। হাম্মাদুর সহপাঠী বন্ধুদের সকলকে ছাড়িয়ে গিয়েছেন। সবাইকে টপকে যাওয়া শুরু ক্লাস টেনে। ফার্স্ট আর সেকেন্ডের মধ্যবর্তী নম্বরের ফারাক ঘুচিয়ে ফেলার লক্ষ্যে পড়াশোনায় আরও একটু বাড়তি মনোনিবেশ করার পর, সেই মনোনিবেশ কতটা গভীর ছিল, তা জানা যায় ২০০০ সালে মাধ্যমিকের রেজাল্ট বের হওয়ার পর। ওই স্কুলের প্রথম ও দ্বিতীয় হওয়া পড়ুয়ার মধ্যে মোট নম্বরের ফারাক দাঁড়ায় ১০০-র মতো। ৮৭ শতাংশ নম্বর পান হাম্মাদুর। যা ওই স্কুলের সর্বকালীন সর্বোচ্চ নম্বর। মাধ্যমিক হল জীবনের প্রথম বড়ো পরীক্ষা। আবার মাধ্যমিকে অত্যন্ত ভালো ফল করার পর যথাযথ পথপ্রদর্শনের অভাবে অনেক ছেলেমেয়ের হারিয়ে যাওয়ার মতো দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাও ঘটতে দেখা যায়। জীবনের এই বাঁকটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হাম্মাদুরের জীবনে এই বাঁক থেকেই শুরু হয় এক নতুন পথের, যে-পথটি গিয়ে শেষ হয়েছে এক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রবেশদ্বারের সম্মুখে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির নাম আল-আমীন মিশন।

হাম্মাদুর আল-আমীন মিশনের খবর পান ওঁর চেয়ে এক বছরের

সিনিয়র, সেই সময় মিশনে পাঠরত, গ্রামেরই বসিরউদ্দিন নামে এক ছাত্রের কাছ থেকে। হাম্মাদুরের কথা তো বলছিই। বসিরউদ্দিনের কথা একটু জেনে নিলে হয় না? কৃষকপরিবারের সন্তান বসিরউদ্দিন এখন লন্ডনে। না, বেড়াতে যাননি। ওখানে চাকরি করছেন। পেশা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং। কথায় কথায় যেসব ছাত্রছাত্রীর কথা আসছে, তাঁদের কথা একটু করে বলতে গিয়ে যে-সাফল্যের গল্প শুনিয়ে দিচ্ছি, তা অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে না তো? আপনাদের মনকে দোষ দিয়ে কী হবে! অবিশ্বাস্য কিছু করে দেখালে এমন হওয়াই তো স্বাভাবিক। হাম্মাদুরের সহপাঠী আল-আমীনের প্রাক্তনীদের কথা তাহলে পরে বলাই ভালো। ২০০০ সালে হাম্মাদুর আল-আমীন মিশনের খলতপুর শাখায় ভর্তি হন। ইলেভেন-টুয়েলভে প্রায় ষাট জনের মতো ছাত্র ছিল। ইলেভেন-টুয়েলভের সব পরীক্ষাতেই প্রথম হলেও হাম্মাদুর উচ্চমাধ্যমিকের ফাইনাল পরীক্ষায় প্রথম হতে পারেননি। ২০০২ সালে ৮৬.২ শতাংশ নম্বর পেয়ে মিশনের মধ্যে চতুর্থ হয়েছিলেন। ৮৯ শতাংশ নম্বর পেয়ে প্রথম হয়েছিলেন মানোয়ার হোসেন। কিন্তু একটা পরীক্ষায় প্রথম হয়েছিলেন হাম্মাদুর। মিশনের মধ্যে প্রথম এবং রাজ্যস্তরে হইচই ফেলে দেওয়ার মতো সে-রেজাল্ট। রানিং ইয়ারে জয়েন্ট পরীক্ষা দিয়ে মেডিকেলে ১০ র‍্যাঙ্ক করেছিলেন। আরও আছে। একই সঙ্গে জয়েন্ট ইঞ্জিনিয়ারিংয়েও র‍্যাঙ্ক করেছিলেন ৯৬। ওই ব্যাচের আরও দু-এক জনের কথা বলে নিই। ওই বছর উচ্চমাধ্যমিকে মিশনের মধ্যে প্রথম হওয়া মানোয়ার রানিং ইয়ারে জয়েন্ট মেডিকেলে ১২৮ র‍্যাঙ্ক করেন। দ্বিতীয় হওয়া মহম্মদ আলি র‍্যাঙ্ক করেন ১২৭। মহম্মদ আলির কথাও উজ্জ্বল প্রাক্তনী বিভাগে আলাদা করে বলার দাবি রাখে। হাম্মাদুরের মতোই তিনিও পিজিআই, চণ্ডীগড়ে ডিএম করছেন। ওই ব্যাচেরই মুর্শেদ আলম ৯২ র‍্যাঙ্ক করেছিলেন। মুর্শেদ এমডি করেছেন। আয়াতুল্লাহ ফারুক যাদবপুর থেকে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পিএইচডি করে এখন অধ্যাপনা করছেন। গোটা ব্যাচের মধ্যে পঁয়তিরিশ জনের মতো ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হয়েছেন। সকলেই নানা পেশায় সুপ্রতিষ্ঠিত। যাঁর কিছু হল না বলে হা-হুতাশ শোনা যায়, তিনি হয়েছেন হাইস্কুলের শিক্ষক। ফিরে আসি হাম্মাদুরের কথায়। কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে হাম্মাদুর এমবিবিএস পাস করেছেন ২০০৮ সালে, এরপর এমডি করার লক্ষ্যে এক বছরের কোচিং নিতে দিল্লি যান। ও হ্যাঁ, খরচ ম্যানেজের কথাটা বলা হয়নি। হাম্মাদুর যখন মিশনে ভর্তি হন, তখন ওঁর আব্বা চাকরি পেয়ে গেছেন। তবু ওঁর ভালো রেজাল্ট করা দেখে, উৎসাহিত করতে, এক বছর পর বেতন অর্ধেক করে দেওয়া হয়। মেডিকেল পড়ার সময় প্রতিমাসে বারোশো টাকা করে জি ডি স্কলারশিপের ব্যবস্থা করে মিশন। এক বছর পর আইডিবি প্রদত্ত সুদমুক্ত লোন-স্কলারশিপ পাওয়ার ফলে আর্থিক বিষয় নিয়ে আর বিশেষ চিন্তা করতে হয়নি। কিন্তু সমস্যা তৈরি হয় দিল্লিতে কোচিং করতে যাওয়ার সময়। সেই সময় ২০০৮ সালে, প্রায় ছ-মাস, মিশন প্রতিমাসে সাড়ে তিন হাজার টাকা করে দিয়েছিল। বাকি খরচ সামাল দিতে ওঁর আব্বাকে লোনও করতে হয়েছিল। এমডিতে চান্স পাওয়ার পর স্টাইপেন্ড পেতে শুরু করলে আর্থিক দুর্ভাবনা দূর হয়। দিল্লিতে এক বছর কোচিং নেওয়ার পর ২০০৯ সালে অল ইন্ডিয়া মেডিকেল এন্ট্রান্স পরীক্ষায় সর্বভারতীয় স্তরে র‍্যাঙ্ক হয় ৩০৮। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পেয়ে মেডিসিনে এমডি করেন। ২০১২ সালে এমডি পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হন হাম্মাদুর। হাম্মাদুর এখানেই থেমে যেতে পারতেন। কিন্তু আরও ভালো কিছু, বড়ো কিছু করার ইচ্ছা তাঁকে প্ররোচিত করে পরবর্তী সাফল্যের দিকে পা বাড়াতে। আল-আমীন মিশনে আসার পর ছাত্রছাত্রীদের মনে গেঁথে যায় প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এ পি জে আব্দুল কালামের একটি কথা— 'অলওয়েজ ড্রিম বিগ'। স্বপ্ন যদি দেখতেই হয়, তাহলে বড়ো স্বপ্নই কেন নয়? বস্তুত এই কথাকেই পাথেয় করে স্পেশালাইজেশন তো হল, এ-বার সুপার স্পেশালাইজেশন। ২০১২ সালে এমডি শেষ করে ২০১৩ সালে কাশ্মীরের শের-এ-কাশ্মীর ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সে এন্ডোক্রিনোলজিতে ডিএম করার সুযোগ পান। ওখানে

চিকিৎসারত ডাক্তার সেখ হাম্মাদুর রহমান।

ক্লাস করতে-করতেই চিকিৎসাবিদ্যায় দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এইমসে পড়ার লক্ষ্যে পরীক্ষায় বসেন। মাত্র একটি সিট ছিল এন্ডোক্রিনোলজি বিষয়ে। সর্বভারতীয় স্তরের ওই পরীক্ষায় প্রথম হয়ে ওই একমাত্র সিটে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন হাম্মাদুর। চলতি বছরের গত জুলাই থেকে নতুন করে আবার শিখর স্পর্শ করার লক্ষ্যে পড়াশোনা শুরু করেছেন হাম্মাদুর। এই অভাবনীয় সাফল্য কেন হাম্মাদুরের হাতে ধরা দিয়েছে, তা হাম্মাদুরকে নিজের চোখে না দেখলে আন্দাজ করা কঠিন। হাম্মাদুর সাফল্যলাভের জন্য তিনটি পরামর্শ দেন সকলকে। এক— নিয়মনিষ্ঠ হওয়া। তাঁর মতে মুসলমান ছাত্রছাত্রীদের এ-ক্ষেত্রে বাড়তি সুবিধা আছে। কেননা, মিশনে যেমন সময় ধরে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া হয়, সবকিছু রুটিন ধরে চলে, তেমনি ব্যক্তিগত জীবনে শুধু সময়মতো পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করার অভ্যাস তৈরি হলেই সময়নিষ্ঠা নিয়মানুবর্তিতা তৈরি হবে। এ-ক্ষেত্রে হাম্মাদুর কেমন ? সে-কথা জানলাম অন্য সূত্র থেকে। হাম্মাদুর ক্লাস সিক্স-সেভেনে পড়ার সময় থেকে ওয়াক্ত অনুযায়ী নামাজ আদায় করার চেষ্টা করেন। আল-আমীন মিশনের এক স্যার ইন্টারভিউ চলা কালে হাম্মাদুর সম্পর্কে একটা তথ্য দিয়ে যান, মিশনে দু-বছর থাকা কালে হাম্মাদুরকে তাহাজ্জোদের নামাজ কাজা করতে দেখেনি কেউ। ধর্মনিষ্ঠার এ-দিকটা বাদ দিয়ে, আর যে-দুটি পরামর্শ দিয়েছেন, তার মধ্যে দ্বিতীয়টি— আত্মবিশ্বাস। আমরাও পারব মনোভাব। তৃতীয়— নিরলস প্রচেষ্টা। হাম্মাদুর আর যে-কথাটা বলেননি, সেটা তাঁকে চোখে দেখলে খানিকটা বোঝা সহজ হত। তা হল, সহজ সরল জীবনযাপন। এত বড়ো সাফল্য অর্জন করার পরও চোখেমুখে, পোশাকপরিচ্ছদে কোথাও তার ছাপ নেই। দেখলে অতি সাধারণ বলে মনে হবে। অসাধারণ হয়ে সাধারণ থাকতে পারার মধ্যেই লুকিয়ে থাকে মহত্ত্ব। নিজের অসাধারণত্বটুকু জেনে বুঝে আটপৌরে সাদাসিধে থাকার ইচ্ছেই হাম্মাদুরদের মতো দু-একজনকে ব্যতিক্রমী করে তোলে। 'সেরার সেরা' শিরোপা তো এঁদের জন্যই। তা-ই নয় কি? ■

শিখরের কাছাকাছি যারা, যারা উজ্জ্বলতর জীবন-জীবিকার জগতে একদিন পৌঁছোবে অবশ্যই— সেই সম্ভাবনাময়দের নিয়ে এই পাতা।

ভালো ফল করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ

মিলন শেখ।

মুর্শিদাবাদের রানিতলা থানার অন্তর্গত ডিহিপাড়া গ্রামের মিলন শেখ ছোটোবেলাতেই তার আব্বা সাহাবান শেখকে হারিয়ে এতিম হয়ে যায়। চারজন সন্তানকে নিয়ে মুনুয়ারা বেওয়ার অবস্থা সত্যিই করুণ। কারণ, সংসার চালানোই যেখানে দুঃসাধ্য, সেখানে ছেলেদের সুশিক্ষিত করা সত্যিই স্বপ্ন। কিন্তু মুনুয়ারা বেওয়া হাল ছাড়বার পাত্রী নন, তিনি আরও বেশি বেশি পরিশ্রম করতে শুরু করলেন। কিশোর মিলন পাশের গ্রামের এক দাদার কাছে আল-আমীন মিশনের নাম শোনে এবং মনস্থির করে সেখানেই সে পড়বে। আবার এ-কথাও ভাবে মিশনে পড়লে কী করে তার মা খরচ চালাবেন। এই দোদুল্যমান অবস্থাতেই সাহসে ভর দিয়ে মিলন মিশনের ভর্তির পরীক্ষায় বসে এবং নবম শ্রেণিতে ভর্তির জন্য নির্বাচিত হয়। মিলন ভর্তির পরীক্ষায় সফল হলেও মনে সাহস পায় না কীভাবে ভর্তি হবে। শেষে মা ও ছেলে ইন্টারভিউয়ের জন্য খলতপুর ক্যাম্পাসে পৌঁছোয়। এবং মিশন কর্তৃপক্ষ তাদের পারিবারিক অবস্থার কথা শুনে সম্পূর্ণ ফ্রি-শিপে পড়ার বন্দোবস্ত করে। মিলনের মা এই খুশিতে কেঁদে ফেলেন। মিলন মিশনের বেলডাঙা শাখায় ভর্তি হয় এবং মাধ্যমিকে ৮৮ শতাংশ নম্বর পেয়ে কৃতকার্য হয়। আর্থিক সুব্যবস্থা ছাড়াও মিশনের শিক্ষকদের নানান পরামর্শ ও নিয়মিত সহায়তা পেয়ে উচ্চমাধ্যমিকে আরও ভালো ফল করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সে। সারাজীবন মিশন পরিবারের সাথে জড়িত থাকতে ইচ্ছুক এই মেধাবান ছাত্রটি বর্তমানে মিশনে একাদশ শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগে পাঠরত।

আল-আমীনের সঙ্গে সারাজীবন

"আল-আমীন মিশনের হাত ধরে মুসলমান সমাজ আজ অগ্রগতির পথে"— কথাটা আমডাঙার এক অপরিচিত গ্রাম বেড়াবেড়িয়ার এক তরুণ জাহাঙ্গীর আলমের। উত্তর চব্বিশ পরগনার এক দুঃস্থ পরিবারের এই ছাত্রের সামাজিক বোধ আমাদের বিস্মিতই করে। চার ভাইবোনসহ দাদু ও দাদিমা মিলিয়ে আট জনের এই পরিবারের গৃহকর্তা জাহাঙ্গীরের আব্বা একজন দিনমজুর কৃষক। ফলে শৈশব থেকেই অভাব অনটন দুঃখ কষ্ট তাদের নিত্যসঙ্গী। স্বভাবতই জাহাঙ্গীর ও তার ভাইবোনদের কাছে পৃথিবীটা খুবই অচেনা মনে হয় এবং তারা স্বপ্ন দেখতেও ভুলে যায়। কিন্তু জাহাঙ্গীর বরাবর একটু অন্য রকমের, সে তারই মাঝে অদম্য ইচ্ছাশক্তিকে সম্বল করে মিশনের ভর্তির পরীক্ষায় বসে সফল হয়। উল্লেখ্য যে, তার এক দিদি আল-আমীনে পড়াশোনা করেছিল এবং বর্তমানে বিএসসি পাঠরত। কিন্তু তার পরেই শুরু অস্থিরতা উদ্‌বিগ্নতা, পড়াশোনার খরচ কোথা থেকে আসবে। কিন্তু মিশন কর্তৃপক্ষ তার পারিবারিক অবস্থা বিবেচনা করে সম্পূর্ণ ফ্রি-শিপে পড়াশোনার সুযোগ করে দেয়। আবেগে জাহাঙ্গীর ও তার অব্বার চোখ ছলছল হয়ে ওঠে। জাহাঙ্গীর মিশনের হাসনেচা শাখা থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৮৩.৭ শতাংশ নম্বর পেয়ে সফল হয়। কিন্তু এইটুকুতে সে সন্তুষ্ট নয়। এবং উচ্চমাধ্যমিকে আরও ভালো ফলের জন্য সে এখন থেকেই দিনরাত পরিশ্রম করছে। আল-আমীনের সঙ্গে সারাজীবন জড়িয়ে থাকতে চায়। জাহাঙ্গীর বর্তমানে মিশনে বিজ্ঞান বিভাগে পাঠরত।

জাহাঙ্গীর আলম।

ফ্রি-শিপ পেয়ে আনন্দাশ্রু

আধুনিক শিক্ষার আলো, বলতে গেলে সেসময় সবেমাত্র টিমটিম করে জ্বলতে শুরু করেছে হরিহরপাড়া থানার গণেশনগর গ্রামে। মুর্শিদাবাদের সাজিদ মণ্ডল অনুপ্রাণিত হয় রামকৃষ্ণ মিশনের এক ছাত্র, বর্তমানে ইঞ্জিনিয়ারকে দেখে। তারও স্বপ্ন জাগে মিশনে পড়ার ও ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার। আল-আমীন মিশনে পড়ত তাদের পাশের বাড়ির এক ছেলে। তার কাছ থেকে সে জানতে পারে মিশনে মেধাবীদের বিনাখরচ-হাফখরচে পড়বার কথা। সে মনস্থির করে, সেও আল-আমীন মিশনে ভর্তি হবে, পড়ার সুযোগ পাবে। আর্থিক অনটনে রিক্ত সাজিদের আব্বা মজিদ মণ্ডলও ছেলেকে মিশনে পড়তে উৎসাহিত করেন। বাড়ি থেকেই পরীক্ষা দিয়ে মাধ্যমিকে সাজিদ পায় ৮২.৮৫ শতাংশ নম্বর। পরে একাদশ শ্রেণির ভর্তির পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়ে ইন্টারভিউয়ে বসে খলতপুর ক্যাম্পাসে। তাদের আর্থিক দুরবস্থার কথা জেনে সেক্রেটারি স্যার সাজিদকে ফ্রি-শিপে পড়বার সুযোগ করে দেন। সাজিদ ও তার আব্বার চোখ তখন আনন্দাশ্রুতে ভরে যায়। মিশন কর্তৃপক্ষের প্রতি কৃতজ্ঞ সাজিদ সারাজীবন মিশনের সঙ্গে যুক্ত থাকতে অঙ্গীকারবদ্ধ। সাজিদ বর্তমানে মিশনে একাদশ শ্রেণিতে বিজ্ঞান বিভাগে পাঠরত।

সাজিদ মণ্ডল।

কৃতজ্ঞ নাওয়ার ও তার পরিবার

সিলেবাসের গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ইসলামি নৈতিক শিক্ষায় খুবই অনুরক্ত মুর্শিদাবাদের রেজিনগর থানার আন্দুলবেড়িয়া গ্রামের নাওয়ার হোসাইন। ছয় ভাইবোনের বিশাল সংসারের আয় বলতে সামান্য কিছু জমি ও তার আব্বার কৃষিকাজ। তবে নানান অসুখে অসুস্থ আব্বা বর্তমানে কৃষিকাজটুকুও করতে পারেন না। ফলে নিরবচ্ছিন্ন অভাব অনটন। এমনি পরিস্থিতিতে মেদিনীপুর শাখায় পড়া এক বন্ধুর মাধ্যমে সে মিশনে ভর্তির পরীক্ষায় বসার সাহস অর্জন করে। এবং পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়ে বেলডাঙা শাখায় নবম শ্রেণিতে ভর্তি হয়। আসলে মিশন কর্তৃপক্ষ তাদের আর্থিক অসুবিধা বিবেচনা করে ফ্রি-শিপে পড়ার সুযোগ করে দেন। এজন্য কৃতজ্ঞ নাওয়ার ও তার গোটা পরিবার। নাওয়ারের এখন একটাই লক্ষ্য, উচ্চমাধ্যমিকে ভালো ফল করা ও জয়েন্টে সফল হওয়া। আমরাও প্রত্যাশা করি নাওয়ারের স্বপ্ন সফল হোক, কারণ আল-আমীন মিশনও প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই মেধাবী, এতিম, দুঃস্থ ও অভাবীদের পাশে থেকেছে। এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। নাওয়ার বর্তমানে মিশনে একাদশ শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগে পাঠরত। ■

নাওয়ার হোসাইন।

তিনি 'বিষাদ-সিন্ধু'র লেখক। কারবালা প্রান্তরে মর্মস্পর্শী যুদ্ধের ইতিহাস যেভাবে বর্ণনা করেছেন, আজও তা মানুষকে ছুঁয়ে যায়। তিনি 'জমিদার দর্পণে'রও লেখক। স্বাধীনতার একশো বছর আগে জন্মানো সেই মনীষী-লেখকের কথা।

মীর মশাররফ হোসেন

সাহিত্যকর্ম ও সমাজচিন্তা

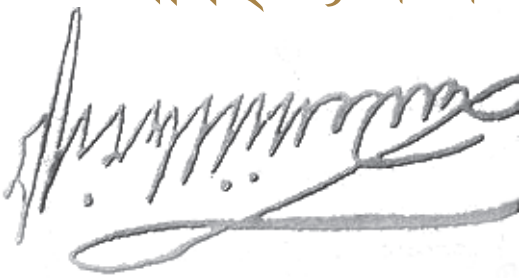

আমিনুল ইসলাম

দ্বিতীয় ও শেষ অংশ

পঞ্চম গ্রন্থ 'এর উপায় কি?' প্রহসন। কাহিনির পটভূমি মধ্যবিত্ত সমাজ। কুঅভ্যাসে আসক্ত পুরুষের অনাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। দ্বিতীয় সংস্করণের (১২৯৯) ভূমিকায় মশাররফ হোসেন বলেছেন " ... বিষয়টি ভাল নয়, কিন্তু রাধাকান্তবাবুর মত স্বামী, মুক্তকেশীর ন্যায় স্ত্রী, মদনের মত এয়ার খুঁজিলে যে, না পাওয়া যায় তাহা নহে। এ যাতনা অনেকেরই ভোগ করিতে হইতেছে। কত পরিবারের চোক্ষের জল অবিরত ঝরিতেছে। সম্পূর্ণ নহে, কোনও সত্য ঘটনার কতক সময়ের চিত্রই 'এর উপায় কি?' বিষয়টি যতই কেন কদর্য হউক না, ঘরের কথা যে পরের কানে গিয়াছে, আর কেন? বাবুদিগের মনে এই কথাটি উদয় হইলেও আমার পরিশ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক মনে করি।" লেখকের উদ্দেশ্য যে সমাজ সংস্কার, এখানে তা স্পষ্ট। ঢাকার 'বান্ধব' পত্রিকায় প্রহসনখানির বিরূপ সমালোচনা হয়: "এদেশের মুসলমান ভদ্রলোকেরা সাধারণ সাহিত্যে বীতস্পৃহ; বাঙ্গালা সাহিত্যের সহিত তাঁহাদিগের কোনও সম্বন্ধ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং যখন তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কদাপি শখ করিয়া বাঙ্গালা লিখিতে ইচ্ছা করেন, তখন আমরা নিতান্ত সুখী হই, এবং তাঁহাদিগের প্রশংসা করিতে প্রাণপণে যত্ন করি। কিন্তু তাঁহারা যশোলাভের এমন সহজ পথ থাকিতেও, কল্পনায় ও ভাষায় যারপরনাই জঘন্য রুচির পরিচয় দেন, অশ্লীল পদাবলীর ছড়াছড়িকেই কাব্যরসে রসিকতা মনে করেন, তখন এই গ্রন্থকারের ন্যায় আমরা বিপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করি, এর উপায় কি?" নানান

> 'বিষাদ-সিন্ধু'র জনপ্রিয়তা দুই ধরনের পাঠকের কাছে ভিন্ন দুই কারণে। প্রথমত, ইসলাম ধর্ম সম্পর্কিত স্পর্শকাতর কাহিনি সাধারণ মুসলমান পাঠকের কাছে এর জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ। দ্বিতীয়ত, 'বিষাদ-সিন্ধু'র জাদুকরি রচনাগুণের জন্যে সাহিত্যের রসিকজনের কাছেও গ্রন্থটি আদরণীয়।

অসামাজিক আচরণ নিয়ে সে-যুগে নাটক-প্রহসন অনেকে লিখেছেন। প্যারিচাঁদ মিত্রের 'মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়' (১৮৫৯), মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা' (১৮৬০), দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী' (১৮৬৬) প্রভৃতি এ-শ্রেণির রচনা। মশাররফ 'সধবার একাদশী'র দ্বারা প্রভাবিত হন। উল্লেখযোগ্য যে, ইন্দ্রিয়চর্চায় মশাররফ হোসেনের ব্যক্তিগত জীবনেও স্খলন ঘটেছিল।

মশাররফ হোসেনের সবচেয়ে বিখ্যাত রচনা 'বিষাদ-সিন্ধু'। ইসলাম ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রচারক হজরত মহম্মদ (স.)-এর দৌহিত্রদ্বয় হাসান-হোসেনের সঙ্গে দামেস্ক অধিপতি মাবিয়ার একমাত্র পুত্র এজিদের কারবালা প্রান্তরের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ এবং ইমাম হাসান-হোসেনের করুণ মৃত্যুকাহিনি 'বিষাদ-সিন্ধু' উপন্যাসে বর্ণিত মূল বিষয়। অবশ্য এই মূল ঘটনার সঙ্গে গ্রন্থটিতে অসংখ্য শাখাকাহিনি উপকাহিনির সন্নিবেশ ঘটেছে। এ-গ্রন্থে হৃদয়বিদারক বিষাদময় ঘটনার সঙ্গে 'মুসলমানদের ধর্মীয় সংস্কারবোধ' ইত্যাদি সংযোজিত হওয়ায় পাঠকদের হৃদয়কে আবেগায়িত করে তোলে।

মীর মশাররফ হোসেন নামাঙ্কিত উচ্চবিদ্যালয়। কুষ্টিয়ার কুমারখালিতে।

'বিষাদ-সিন্ধু'র জনপ্রিয়তা দুই ধরনের পাঠকের কাছে ভিন্ন দুই কারণে। প্রথমত, ইসলাম ধর্ম সম্পর্কিত স্পর্শকাতর কাহিনি সাধারণ মুসলমান পাঠকের কাছে এর জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ। দ্বিতীয়ত, 'বিষাদ-সিন্ধু'র জাদুকরি রচনাগুণের জন্যে সাহিত্যের রসিকজনের কাছেও গ্রন্থটি আদরণীয়। গ্রন্থটিতে তিনি মানুষের হৃদয়ানুভূতির দ্বান্দ্বিক প্রকাশ ঘটিয়েছেন। জয়নবের রূপে বিমোহিত এজিদ এবং এই রূপতৃষ্ণার পরিণামে বহু মানুষের বিপর্যয় ও ধ্বংসের যে-কথকতা বর্ণিত হয়েছে, তা গ্রন্থটিকে সর্বজনীন করে তুলেছে। এই গুণটি গ্রন্থটির জনপ্রিয়তার একটি অন্যতম প্রধান কারণ। হয়তো তাই ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন, "বাংলা সাহিত্যের অপূর্ব সম্পদ হিসাবে সকল সমাজেই এই গদ্যখানির সমান আদর।" অধিক জনপ্রিয়তার কারণেই 'বিষাদ-সিন্ধু' বেণীপ্রসাদ বাজপেয়ী মঞ্জুল কর্তৃক হিন্দি ভাষায় অনূদিত এবং ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে এলাহাবাদ থেকে মুদ্রিত হয়।

মশাররফ হোসেন অসাধারণ জীবনচেতনায় বৃহত্তর সমাজ-কাঠামোকে উপন্যাসে আনেন। অনেক ঔদার্য ও উন্মুক্ত জ্ঞানে তিনি বাংলা গদ্যরীতিকে উপন্যাসের কাহিনিতে প্রবিষ্ট করান। তাঁর ভাষা সংস্কৃতবহুল। এমন ভাষার প্রতি তাঁর ঔদার্য ও অনুরাগ ছিল। 'বিষাদ-সিন্ধু'তে তার প্রমাণ যেমন মেলে, তেমনি বহুকালব্যাপী জনপ্রিয়তার বিষয়টিও তাঁর রচনায় বিরাজমান: "স্বয়ং ঈশ্বর তুর পর্বতে যাহার কথা কহিয়াছিলেন, মুসা সেই সচ্চিদানন্দের তেজোময় কান্তি দেখিবার জন্য নিতান্ত উৎসুক হইলে কিঞ্চিৎ আভামাত্র যাহা মুসার নয়নগোচর হইয়াছিল, তাহাতেই মুসা স্বীয় শিষ্যসহ সে তেজ ধারণে অক্ষম হইয়া তখনই অজ্ঞান অবস্থায় ধরাশায়ী হইয়াছিলেন, শিষ্যগণ পঞ্চত্ব পাইয়াছিলেন, আবার করুণাময় জগদীশ্বর, মুসার প্রার্থনায় শিষ্যগণকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া মুসার অন্তরে অটল ভক্তির নবভাব আবির্ভাব করিয়াছিলেন, সে মহামতি সত্য-তার্কিক মুসাও আজি হোসেন শোকে কাতর কারবালায় সমাসীন।"

এ-দায়বদ্ধতা তৈরি হয়েছিল মীর মশাররফ হোসেনের ব্যক্তিজীবন থেকে। অনেক স্পর্শকাতর আখ্যান রচনায় তিনি প্রমাণ করেছেন তাঁর মানবতাবাদের শর্তসমূহ। মীর মশাররফ হোসেন পারিবারিক জীবনেও এরূপ প্রতিশ্রুতি পালন করেন। প্রাসঙ্গিকভাবে বলা চলে: "মশাররফ হোসেন একদিকে ছিলেন প্রাচীন জমিদারের সন্তান; অন্যদিকে আধুনিক কালের বন্ধনমুক্তিকামী মানুষ। এ দুয়ের সংমিশ্রণে মশাররফ হোসেনের অদ্ভুত মানস গঠন লক্ষ করা যায়। তাঁর জন্ম এমন এক সময়ে যখন তৎকালীন ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশে ইংরেজ রাজত্ব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং শাসক শ্রেণী মুসলমানের নিকট থেকে সব রকমের সুযোগ-সুবিধা কেড়ে নিয়েছে। মশাররফ হোসেনের পূর্বপুরুষ পিতা-পিতামহদের জমিদারি ছিল। কিন্তু নানা কারণে ধীরে ধীরে তাঁদের সম্পত্তি লোপ পেতে থাকে। এদিকে কৃষকরাও জমিদারের উপর আস্থা হারাতে থাকে এবং উনিশ শতকের বিভিন্ন সময়ে কৃষক বিদ্রোহ দেখা যায়, বিশেষত নীল-বিদ্রোহ। মশাররফ হোসেনের পিতা মীর মোয়াজ্জেম হোসেন জমিদার ছিলেন। তিনি ইংরেজদের প্রতি অনুগত ছিলেন।"

এরূপ পরিবেশের দায়বদ্ধতায় উপন্যাসের ক্ষেত্রটি তিনি চিনে নিতে পেরেছিলেন। অনেক রচনার মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তার সূত্রটি পাওয়া যায় 'বিষাদ-সিন্ধু' পাঠ করলে। নিজ ধর্ম ও মুসলমান আনুগত্যের প্রেরণা তিনি অর্জন করেন বাল্যকালেই।

কিন্তু সেটি বিশেষ কোনো কাল পরিবৃত্তে বা স্বধর্মের কাঠামোতে আটকানো নয়, হয়ে ওঠেন জীবনভাষ্যের পূর্ণাঙ্গ রূপকার। 'বিষাদ-সিন্ধু'

মশাররফ হোসেন অসাধারণ জীবনচেতনায় বৃহত্তর সমাজ-কাঠামোকে উপন্যাসে আনেন। অনেক ঔদার্য ও উন্মুক্ত জ্ঞানে তিনি বাংলা গদ্যরীতিকে উপন্যাসের কাহিনিতে প্রবিষ্ট করান।

শুধু পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস নয়, একটি ধর্মনিঃসৃত আখ্যানও বটে। বিচিত্র ভাবনার পরিবৃত্তে এটির অবলোকন চলে অনেক কালব্যাপী। 'বিষাদ-সিন্ধু'র লেখক হয়ে ওঠেন জনপ্রিয়। মীর মশাররফ হোসেন বঙ্কিম অনুসৃত রীতিতে

মীর মশাররফ হোসেন স্মারক গ্রন্থাগার ও সভাকক্ষ। কুমারখালি, কুষ্টিয়া।

উপন্যাস রচনা করেন। এবং সেখানে বঙ্কিমি পদাঙ্ক অনুসরণ করে তিনি সামনে এগোতে থাকেন। "মানবভাগ্যের এই আবেগময় রূপায়ণের জন্যেই 'বিষাদ-সিন্ধু' মূল্যবান। ... ঘটনার গতি রুদ্ধ করে আত্মগত ভাবনার সংযোজন মশাররফ হোসেনের গদ্যরচনার একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। এই কৌশল তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের কাছ থেকে লাভ করেছেন বলে মনে হয়, তবে বঙ্কিমের তুলনায় মশাররফ হোসেনের এই জাতীয় উক্তি দৈর্ঘ্যে ও সংখ্যায় বেশি। বঙ্কিমচন্দ্র স্বল্পকথায় যা বলেছেন, তার চেয়ে বুঝিয়েছেন অনেক বেশি: সতর্ক পাঠকমনে তাঁর অনুক্ত বক্তব্যও স্পষ্ট রূপ লাভ করেছে। মশাররফ হোসেন তাঁর ছোট বক্তব্য বেশী কথায় বলেছেন এবং কিছুই বলতে বাদ রাখেননি।"

গদ্যে মানবচরিত্রের প্রকৃত স্বরূপই শুধু বের করা নয়, তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, দ্বিধা-দোলাচলতা সবকিছু মানুষের অঙ্গীভূত বার্তায় প্রচার করেন তিনি। সেখানে শিল্প হওয়ার জন্য প্রকৃত যে-সংযম, সেটি তাঁর ছিল। এ ছাড়া বঙ্কিমি জনপ্রিয়তার কারণ ধর্মীয় সহানুভূতি বা আবেগ মীর মশাররফের রচনায় বিপুলভাবে বিদ্যমান। ধর্মীয় আখ্যানে তিনি এতটুকু কম যাননি। এজিদ তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ও জনপ্রিয় চরিত্র। এজিদ চরিত্রের প্রতি তিনি যাবতীয় সহানুভূতি লেপন করেছেন শিল্পসৃষ্টির অনিবার্য কারণেই। সেখানে হিন্দু-মুসলমান শুধু নয়, মানুষের গরিমাকেই তিনি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। সাহিত্যের প্রকৃত স্থানটি তিনি অতি সহজেই চিনে নিতে পেরেছিলেন। সেজন্য তিনি কিছুতেই পিছপা হননি। এমনকী নিজ ধর্মকেও অবহেলা করেছেন। এ-কারণেই তাঁর জনপ্রিয়তার মূল শর্ত নির্ধারিত। একটু উদাহরণ দিলে তা পরিষ্কার হবে: "এ শিরে তোমার স্বার্থ কি? খণ্ডিত শিরে তোমার প্রয়োজন কি? অর্থ? হায়রে অর্থ! হায়রে পাতকী অর্থ! তুই জগতের সকল অনর্থের মূল। জীবের জীবনের ধ্বংস, সম্পত্তির বিনাশ, পিতাপুত্রে শত্রুতা, স্বামী-স্ত্রীতে মনোমালিন্য, ভ্রাতাভগ্নীতে কলহ, রাজাপ্রজায় বৈরীভাব, বন্ধুবান্ধবে বিচ্ছেদ, বিবাদবিসম্বাদ, কলহ, বিরহ, বিসর্জন, বিনাশ, এ সকল তোমারই জন্য। সকল অনর্থের মূল ও কারণই তুমি।"

কিংবা অন্য প্রসঙ্গে, "ভাই মারোয়ান! তুমি আমার বাল্যসহচর। আজ তোমাকেই আমার প্রতিনিধি স্বরূপ এই বীরদলের অধিনায়ক হইতে হইবে। তোমাকেই সৈন্যপত্যের ভার গ্রহণ করিতে হইবে, কারণ হাসান-হোসেনের বধ সাধনের জন্য সৈন্যদলকে মদিনায় পাঠাইতেছি। যদি এজিদের মান রক্ষা করিতে চাও, যদি এজিদের অন্তরাগ্নি নির্বাণ করিতে চাও, যদি এজিদের মনে দুঃখ দূর করিতে চাও, যদি এজিদের জয়নব লাভের আশাতরী বিষাদ-সিন্ধু হইতে উদ্ধার করিতে চাও, তবে এখনই অগ্রসর হও, আর পশ্চাতে ফিরিও না।"

এভাবে প্রণয়-উত্তপ্ত জয়নবের প্রলম্বিত ধ্বনি আমরা অবলোকন করি উপন্যাসে। রূপজ মোহে সে অন্ধ। এটি তিনি অর্জন করেন তাঁর পূর্বসূরি বঙ্কিমের নিকট। আর এ ছাড়া তাঁর ট্র্যাজিক সূত্রটিও আমরা অনুধাবন করি মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২২—১৮৮৬)-র ট্র্যাজিক ভাবচেতনা থেকে। এরূপে মীর মশাররফ হোসেন তাঁর উপন্যাসের জনপ্রিয়তার পরিচর্যাটি সম্পন্ন করেন একাধারে নিজ মেধা অন্যদিকে সমসাময়িক কাল-অনুবর্তী লেখকদের সান্নিধ্যে। সেখানে তিনি বিশেষ ধর্ম বা সংস্কারে আত্মলীন ছিলেন না। মীর মশাররফ সেখানেও হয়ে ওঠেন অজেয়।

'বিষাদ-সিন্ধু' তিনটি পর্বে সম্পন্ন: মহররম পর্ব (১৮৮৫), উদ্ধার পর্ব (১৮৮৭) ও এজিদ পর্ব (১৮৯১)। কারবালার বিষাদময় কাহিনি নিয়ে উপন্যাস রচিত। কল্পনার যথেষ্ট আশ্রয় থাকলেও এটি ঐতিহাসিক উপন্যাসের পর্যায়ভুক্ত। মধুসূদন যেমন পৌরাণিক কাহিনিকে আধুনিক চিন্তার বাহন করেছিলেন, মশাররফ তেমনি দোভাষী পুথি প্রভাবিত পৌরাণিক-ঐতিহাসিক কাহিনিকে নতুন চিন্তার বাহন করেছিলেন। তাঁরা উভয়েই ধর্মের বন্ধন স্বীকার করেননি। রাজনৈতিক ক্ষমতার দ্বন্দ্বে রাবণ ও এজিদ সংগ্রাম করে উভয়ে লেখকের সহানুভূতি পেয়েছেন। অধার্মিকতা, পাশবিকতা প্রভৃতি দীর্ঘকালের আরোপিত চরিত্রধর্ম থেকে তাঁদের মুক্ত করে মানবোচিত চারিত্রিক দোষ-গুণ আরোপ করেছেন।

'বিষাদ-সিন্ধু'র উৎস ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লেখক 'মুখবন্ধে' (মহররম পর্বে) বলেছেন, "পারস্য ও আরব্য গ্রন্থ হইতে মূল ঘটনার সারাংশ লইয়া 'বিষাদ-সিন্ধু' বিরচিত হইল। প্রাচীন কাব্যগ্রন্থের অবিকল অনুবাদ করিয়া প্রাচীন কবিগণের রচনাকৌশল এবং শাস্ত্রের মর্যাদা রক্ষা করা অত্যন্ত দুরূহ। ... মহরমের মূল ঘটনাটি বঙ্গভাষাপ্রিয় পাঠক-পাঠিকাগণের সহজে হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়াই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য।"

তবে হাসান-হোসেন এবং এজিদের মধ্যে মুসলমানজগতের নেতৃত্ব (তথা ইমামতি) নিয়ে যে-দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল, তার সঙ্গে লোকপ্রচলিত কাহিনি ও পুথিসাহিত্য থেকে সংগ্রহ করা জয়নব এজিদ ও হাসান প্রসঙ্গ জুড়ে দিয়ে মীর মশাররফ হোসেন যে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, ইতিহাসের কঙ্কালে যে কল্পনার সুমিত মেদ মজ্জার সাহায্যে কাহিনিতে মনোহারী লাবণ্য সঞ্চার করেছেন, এ-কথা স্বীকার করলে তাঁকে অনৈতিহাসিক উপাদান ব্যবহারের জন্য ততটা অপরাধী করা চলে না। এ-প্রসঙ্গে আমাদের আলোচনার অবকাশ নেই। আমাদের প্রতিপাদ্য, 'বিষাদ-সিন্ধু'তে মুসলমান চরিত্র ও সমাজজীবনের প্রতিচ্ছবি।

প্রথমত, মনে রাখতে হবে 'বিষাদ-সিন্ধু' সার্বিকভাবে মুসলমান

এজিদ চরিত্রের প্রতি তিনি যাবতীয় সহানুভূতি লেপন করেছেন শিল্পসৃষ্টির অনিবার্য কারণেই। সেখানে হিন্দু-মুসলমান শুধু নয়, মানুষের গরিমাকেই তিনি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। সাহিত্যের প্রকৃত স্থানটি তিনি অতি সহজেই চিনে নিতে পেরেছিলেন। সেজন্য তিনি কিছুতেই পিছপা হননি।

জীবন-প্রতিবেশের গ্রন্থ। ধর্মগ্রন্থ নয়, উপন্যাস। এখানে মুসলমান জীবনের যে-পরিবেশ অঙ্কন করেছেন লেখক, তা একান্তভাবেই কাল্পনিক। তবে বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম বারই আরবের পটভূমি থেকে দুরন্ত জীবনতৃষ্ণা ও উদ্দাম জীবনাবেগ নিয়ে চরিত্রগুলি উঠে এসেছে।

চরিত্রগুলির দুটি স্তর আরবীয় জীবনচর্যার দুই প্রধান ধারাকে অবলম্বন করে অঙ্কিত হয়েছে। একদিকে পার্থিব ভোগ-লালসাবর্জিত ঈশ্বরমুখী জীবনাচারের সঙ্গে ইসলামের মহত্ত্ব ও বীরত্বের চর্চা। এই পথ হাসান, হোসেন ও তাঁর অনুচরবর্গের। অন্যদিকে দামাস্কাসের অতুল ঐশ্বর্যের মধ্যে লালিত এজিদের বিপুল ও বিচিত্র জীবনতৃষ্ণার সঙ্গে যুক্ত একান্তভাবে পার্থিব ভোগাকাঙ্ক্ষা ও সম্ভ্রম প্রতিপত্তির প্রতি আসক্তি।

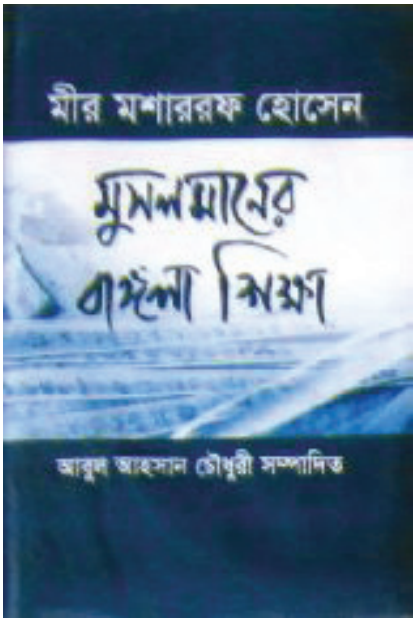

মুসলমান হয়েও এজিদ মদ্যাসক্ত। ইতিহাস হতে জানা যায়, এজিদ শিকারপ্রিয় ও কবি ছিলেন। 'বিষাদ-সিন্ধু'তে এজিদের কাব্যচর্চার খবর নেই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, আরবি ভাষায় এজিদের কবিতাগুলির সঙ্গে পরিচিত মাত্রই অনুভব করবেন মশাররফ হোসেন এজিদের যে দুর্দান্ত প্রেমিকসত্তার অনৈতিহাসিক চিত্র অঙ্কন করেছেন, তার সঙ্গে অপূর্ব সাযুজ্য রয়েছে এজিদের কবিসত্তার, প্রেমে অতৃপ্ত এক হৃদয়, প্রলয়-আগুন জ্বালিয়েছিল এক মহররমের মাসে কারবালার প্রান্তরে। 'বিষাদ-সিন্ধু'র প্রতিপাদ্য বিষয় এইটুকুই। এরসঙ্গে জড়িত হয়েছে সম-সময়ের রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র। হাসানের পারিবারিক অশান্তি ইত্যাদি।

গোটা গল্পে একমাত্র এজিদ চরিত্রে যাবতীয় মানবিক আবেগ অনুভূতি আরোপ করা হয়েছে। যে-ধর্মবোধ সেদিনকার রাজনৈতিক ও সাহিত্যক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করেছিল, তাকে নির্দ্বিধায় অতিক্রম করে এমন একটি প্রাণস্পর্শী, আবেগময় ও বীর্যবান চরিত্র নির্মাণ করা কম কথা নয়। এজিদ এমন একজন প্রাণবান পুরুষ, যিনি বিচক্ষণ রাজনীতিতে, দক্ষ কুটনীতিতে, অকুতোভয় সমরক্ষেত্রে, প্রেমিক ব্যক্তিগত জীবনে, দানশীল তাঁর প্রজাদের ক্ষেত্রে।

হজরত মোহাম্মদ (স.) ও তাঁর চার সাহাবার মৃত্যুর পর ইসলামি দুনিয়ার ইমামতি তথা নেতৃত্ব নিয়ে যে ধ্বংসাত্মক মারণযুদ্ধে নেমেছিল মক্কা মদিনা ও দামাস্কাসের মুসলমানরা, তার সঙ্গে আরব দুনিয়ার অন্যান্য রাষ্ট্রগুলিও যুক্ত হয়েছিল, 'বিষাদ-সিন্ধু'তে তার সংবাদ আছে এবং আছে মুসলমানদের ব্যক্তিচরিত্রের বীরত্ব ও যোদ্ধা মানসিকতার ছবি। ন্যায় আদর্শ ও প্রভুভক্তির জন্য তারা যে অবলীলায় জীবন দিতে পারে, একাধিক চরিত্রের মধ্যে তার প্রমাণ।

হোসেন চরিত্রের বীরত্ব সহৃদয়তা ও সর্বোপরি মানবতা তুলনাহীনভাবে প্রকাশিত হয়েছে। যুদ্ধশ্রান্ত পিপাসার্ত হোসেন যখন ফোরাত নদীর জলে নেমে অঞ্জলিভরে জল তুলেও পান করেন না কিংবা নির্দয় সিমারের সঙ্গে নির্বিরোধ ব্যবহার করেন, তখন হোসেন চরিত্রকে মহিমার মুকুট পরিয়ে দেন লেখক।

হোসেন চরিত্রের বীরত্ব সহৃদয়তা ও সর্বোপরি মানবতা তুলনাহীনভাবে প্রকাশিত হয়েছে। যুদ্ধশ্রান্ত পিপাসার্ত হোসেন যখন ফোরাত নদীর জলে নেমে অঞ্জলিভরে জল তুলেও পান করেন না কিংবা নির্দয় সিমারের সঙ্গে নির্বিরোধ ব্যবহার করেন, তখন হোসেন চরিত্রকে মহিমার মুকুট পরিয়ে দেন লেখক।

'বিষাদ-সিন্ধু'র আর-একটি মর্মন্তুদ প্লট হাসানপুত্র কাশিম ও হোসেনকন্যা সাকিনার তাৎক্ষণিক বিবাহ। কাশিমের যুদ্ধযাত্রা ও বরবেশেই মৃত্যুদৃশ্য অঙ্কনে কেবল ঘটনা বর্ণনার দক্ষতাই নয়, দুটি চরিত্রের মনস্তত্ত্বেরও যথাযথ চিত্রায়ণ করেছেন লেখক। যুদ্ধ ও মৃত্যুর মারণ আমন্ত্রণের মুখোমুখি পিতৃসত্য, অঙ্গীকারের প্রতি শ্রদ্ধাবশত দুটি তরুণ প্রাণের দুঃসাহসিক ও দুঃসহ সম্মিলন ইসলামের জীবনবোধের যথার্থ বর্ণবৈভবকে রূপায়িত করে। তা ছাড়া এখানে আছে কাশিম ও সাকিনার বিবাহ প্রসঙ্গে মুসলমান সমাজের বিবাহ সম্পর্ক বিষয়েও সুস্পষ্ট তথ্য। 'উদ্ধার পর্বে' হানিফার বীরত্বের বর্ণনা অপেক্ষা বিধ্বস্ত এজিদের দৃশ্যগুলি রচনায় লেখককে অধিক মাত্রায় পরিশ্রম স্বীকার করতে হয়েছে। এজিদের চরিত্রের এই ট্রাজেডিকে মহিমা দানের জন্যই 'বিষাদ-সিন্ধু'র লেখককে সাধারণ এজিদ-বিদ্বেষীরা কঠিন সমালোচনা করেন। কিন্তু সাহিত্যের মানদণ্ডের সার্বিক বিচারে বাংলা কথাসাহিত্যে সম্পূর্ণ বাস্তব মুসলমান জীবনচিত্র ও চরিত্র অঙ্কনের দিক থেকে 'বিষাদ-সিন্ধু' প্রথম ও প্রধান দৃষ্টান্ত।

'বিষাদ-সিন্ধু' উপন্যাসে লেখক ভারতবাসীর জাতীয় স্বাধীনতার স্পৃহাকেও জাগ্রত করার প্রয়াস পেয়েছেন। 'বিষাদ-সিন্ধু' রচনাকালে দেশ ছিল পরাধীন। লেখক হোসেন পরিবারের বন্দিদশা থেকে মুক্তির প্রশ্নটিকে যেভাবে এবং যে-ভাষায় সামনে নিয়ে আসেন, তাতেই শিল্পীর সে-আকাঙ্ক্ষাটি স্পষ্ট হয়। লেখকের উক্তি: "অমূল্য রত্ন স্বাধীনতাধন যে স্থানে বর্জিত, সে স্থান অমরাপুরী সদৃশ মনোমুগ্ধকর সুখ-সম্ভোগের স্থান হইলেও মানবচক্ষে অতি কদাকার ও জঘন্য।" "কত বন্দি ভ্রমে, পক্ষপাতিত্বে, অনুরোধে, বিভ্রাটে আজীবন ফটকে আটক রহিয়াছে।" লেখকের এই উক্তিতে শুধু এজিদ শাসনামূলের বিচার ব্যবস্থার ত্রুটির দিকটিই তুলে ধরা হয়নি, এর মধ্যে দিয়ে ব্রিটিশ ভারতের বিচার পদ্ধতির নানা দুর্বলতাকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে। 'বিষাদ-সিন্ধু'র শিল্পীর দৃষ্টি সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি দ্বারা কখনওই আচ্ছন্ন হয়নি। লেখক কাফের বলতে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী নয়, হাসান-হোসেনের শত্রুপক্ষ মুসলমান হলেও কাফের বলে অভিহিত করেছেন। অসাধারণ ত্যাগে সমর্থ আজর দম্পতিকে সামনে এনে শিল্পী তাঁর ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টির এক অবিশ্বাস্য দৃষ্টান্তও স্থাপন করেছেন।

"এই জন্যই 'বিষাদ-সিন্ধু'র প্রধান চরিত্রসমূহ, কিস্‌সা-কাহিনির ক্রোড়োদ্ভূত হয়েও অনেক দূর পর্যন্ত মৃত্তিকা সংলগ্ন, প্রিয়-পরিজনবেষ্টিত, শত্রু-মিত্র পরিবৃত, সজীব নরনারী।" সমালোচকের বক্তব্যের সঙ্গে আমরা কিছুটা দ্বিমত পোষণ করি। 'বিষাদ-সিন্ধু'র প্রধান চরিত্রসমূহ

> মুসলমান পরিবারের বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায় মশাররফের 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী' (১৮৯৯) উপন্যাসে। এটি মূলত ব্যঙ্গমূলক উপন্যাস।

মৃত্তিকা সংলগ্ন মানুষের স্বভাবকে কিছুটা ধারণ করলেও, তারা মৃত্তিকা সংলগ্ন মানুষ নন। তারা উভয় দিকেই রাজপরিবার ও তাদের অমাত্য-পরিবারবর্গের অন্তর্গত। উপন্যাসের ঘটনাধারায় নিয়ন্ত্রক চরিত্রের মধ্যে মায়মুনাই মৃত্তিকা সংলগ্ন মানুষদের প্রতিনিধি, কিন্তু লেখক তাকে অতি নীচাশয় নারীর দৃষ্টান্তরূপে উপন্যাসে উপস্থিত করেছেন। রাজা-রাজড়ার এ বিখ্যাত কাহিনিতে সাধারণ মানুষের স্থান বড়ো একটা নেই। যাই হোক, বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রমুখ লেখকেরা মশাররফের 'বিষাদ-সিন্ধু'র ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' 'ভারতী' প্রভৃতি পত্রপত্রিকায় তাঁর 'বিষাদ-সিন্ধু'র অনুকূল সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা'র মন্তব্য: "মুসলমানদিগের গ্রন্থ এরূপ বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় অল্পই অনুবাদিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।" 'ভারতী'তে বলা হয়েছিল, "ইতিপূর্বে একজন মুসলমানের এত পরিপাটি বাঙ্গালা রচনা আর দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।" কিন্তু মনে রাখতে হবে, 'বিষাদ-সিন্ধু'র অত্যাশ্চর্য সাফল্য ছাড়া তাঁর সমগ্র সাহিত্যকর্ম বস্তুতই তেমন প্রশংসার দাবি করতে পারে না।

'বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগে'র বার্ষিক প্রতিবেদনে (১৮৮৭) 'বিষাদ-সিন্ধু'র 'উদ্ধার পর্ব' সম্পর্কে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সংক্ষিপ্ত মন্তব্য গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান। এই মন্তব্যে মশাররফের শিল্পপ্রতিভার যে-মূল্যায়ন করা হয়, তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ: "Mir Mosharraf Hossain's Bishad-Sindhu, based on the events before and after the great battle of Karbala, is one of the best works in the Bengali Language. The earnestness and pathos of the work, its elevated moral tone and dignified diction, raise it to a high level, and mark a distinct departure, both in matter and in manner, from the current examples of imaginative writing in Bengali."।

'উদাসীন পথিকের মনের কথা' (১৮৯০—১৮৯২) মশাররফের জীবনীমূলক উপন্যাস। এতে মীর সাহেবের চরিত্রে মশাররফকে কিছু অংশ দেখতে পাওয়া যায়। কেনীর সঙ্গে বন্ধুত্বে ও নীলকরদের সমর্থন এবং সাহায্য করার মধ্যে মীর সাহেবের যে-পরিচয় আছে, তাতে লেখকের পিতৃজীবনের প্রতিবিম্বন। মীর সাহেবের দ্বিতীয় পত্নীর অপঘাতে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিকের প্রণয়িনী লতিফনের বেদনাময় পরিণতির ছায়াও চোখে পড়বে।

মশাররফ একটি সুশৃঙ্খল কাহিনি গড়ে তুলেছেন 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'য়। একদিকে নীলকর কুঠিয়াল কেনী, অপরদিকে তিন-চারজন জামিদার— মীর সাহেব, শা গোলাম, প্যারিসুন্দরী এবং ভৈরববাবু। আর তাদের সহচর এবং পরিচারকেরা— রয়েছে জকির স্ত্রী ময়না, দৌলতুন্নেসার মা, কেনীর খানসামা, সোনাউল্লাহ দারোগা, মহম্মদ বক্স, মীর সাহেবের চাকর মাঙন, গরিবুল্লাহ, বসিরুদ্দিন, নীলকুঠির কর্মচারী কালু, দৌলতুন্নেসার অন্তঃপুরের পরিচারিকারা। উপন্যাসে কতকগুলো উত্তেজক ঘটনার মধ্য দিয়ে পরিবেশিত হয়েছে দেশীয় জমিদারদের সঙ্গে নীলকর জমিদার ইংরেজ কেনীর স্বার্থগত দ্বন্দ্ব। দু-পক্ষের লাঠিয়ালদের জমি দখলের সংঘর্ষ, খাজনা-লুঠ, বিরুদ্ধ-দলের কাছারি আক্রমণ প্রভৃতির অত্যন্ত জীবন্ত অথচ বাস্তব বিবরণ মশাররফ দিয়েছেন।

মুসলমান পরিবারের বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায় মশাররফের 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী' (১৮৯৯) উপন্যাসে। এটি মূলত ব্যঙ্গমূলক উপন্যাস। এতে কোনো কোনো ঘটনা এবং চরিত্র বাস্তব জীবন অবলম্বন করে লেখা— লেখক মশাররফ হোসেনের নিজ অভিজ্ঞতার ব্যাপার। ভেড়াকান্ত এবং তাঁর স্ত্রী স্বয়ং ঔপন্যাসিক এবং বিবি কুলসুমের (মশাররফের স্ত্রী) প্রতিকৃতি। লেখকের নিজ জীবন এই উপন্যাসের উপাদান হয়ে উঠেছে।

উপন্যাসটিতে মেয়ে-জমিদারের নেতৃত্বে পরিচালিত দুটি পরিবারের ঘনিষ্ঠ ছবি আছে। সোনা বিবি মণি বিবি সম্পর্কে দু-বোন, কিন্তু এই দু-বোন পরস্পর পরস্পরকে সর্বস্বান্ত করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। একে অপরের বিরুদ্ধে জঘন্যতম চক্রান্ত করেছে, দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধিয়েছে, লাঞ্ছনা ও অপমানের কঠিন হাতিয়ার প্রয়োগ করেছে। অর্থ দিয়ে জজ-ম্যাজিস্ট্রেটকে বশ করা, পুলিশ লাগানো, জেলে দেওয়া, জেল ছাড়ানো— সমস্ত রকমের আইন-বহির্ভূত কাজ ও অবাধে জোচ্চুরি চালিয়েছে। দুই জমিদারনির স্বভাব-চরিত্রে তফাত রয়েছে, নৈতিক অবস্থানও সম মাপের নয়।

'কলিকাতা গেজেটে' 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী' সম্পর্কে অন্য যে-সমালোচনাটি প্রকাশিত হয়, তাতে বলা হয়েছে: "It is a story relating mainly to the quarrel between two female and Muhammedan Zamindars in Northern Bengal. It is full of graphic realistic sketches illustrating the life led by the local Muhammedan gentry, the vogury of the Zamindari amla, the corruption of the police and the highhanded proceedings of the native judiciary and magistracy in the mufassal. Among the characters, that of Begum Saheba is very cleverly drawn. The writer is no friend of female emancipation, and he comments in strong language on Begum Sahib's not conforming to the system of Parda prevalent among high class Muhammedan ladies. The writer though a Muhammedan; writes Bengali with ease and possess a wonderful command over the vocabulary of the language. But his style is nevertheless ungrammatical and marked by East Bengalism and an absence of literary grace."।

'তহমিনা' উপন্যাসটি কবি ফেরদৌসির বিখ্যাত মহাকাব্য 'শাহনামা'য় বর্ণিত সোহরাব-রোস্তমের কাহিনি অবলম্বনে রচিত। মীর মশাররফ হোসেনের এ-রচনাটি ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে ধারাবাহিকভাবে প্রথম প্রকাশ লাভ করে মাসিক 'হাফেজ' পত্রিকায় (জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি ও মার্চ-এপ্রিল সংখ্যায়), কাজী আব্দুল মান্নান তাঁর 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম-সাধনা' গ্রন্থে সর্বপ্রথম এ-তথ্য প্রদান করেন।

মৃগয়া উপলক্ষে মহাবীর রোস্তমের আগমন ঘটে সামান গাঁ নগরের প্রান্তসীমায়। 'দিবা দ্বিপ্রহর অতীত'। মৃগয়ান্তে অশ্ব থেকে অবতরণ করে বীরবর রোস্তম তাঁর প্রিয় অশ্বকে বিচরণ করতে ছেড়ে দিয়ে বৃক্ষতলে অশ্বসাজে শয্যা রচনা করেন। তারপর 'মৃগমাংসে ক্ষুধা নিবৃত্তি' করে রচিত শয্যায় নিদ্রাভিভূত হন। (প্রথম পরিচ্ছেদ)।

মশাররফ হোসেন বলেছেন, "কবিগুরু ফেরদৌসি মহোদয়ের পদাঙ্ক চিহ্ন লক্ষ করিয়াই এই তহমিনা।" সোহরাব-রোস্তম সম্পর্কে 'শাহনামা'য় বর্ণিত কাহিনিকে অবলম্বন করে পল্লবিত ভাষায় মশাররফ 'তহমিনা'র মধ্যে

মশাররফ হোসেন সাহিত্যচর্চা শুরু করেন উনিশ শতকের সপ্তম দশকে, শেষ করেন বিশ শতকের প্রথম দশকে। চল্লিশ বছরের যুগ ও পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর মনোভাব ও চিন্তাজগতের পরিবর্তন ঘটে। বিশেষ করে বাংলার মুসলমান সমাজের তখন সংকটকাল এবং সংকট থেকে উত্তরণের কাল।

একটি রোমান্টিক প্রেম-উপাখ্যান রচনা করেছেন।

'রাজিয়া খাতুন' সম্পর্কে তেমন কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। মীর মশাররফ হোসেন ১৩০৬ সালে (১৮৯৯ খ্রি.) 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'র শেষ পৃষ্ঠায় যে-বিজ্ঞাপন ছেপেছিলেন, তাতে অন্যান্য পুস্তকের সঙ্গে 'রাজিয়া খাতুনে'র প্রকাশ সংবাদ প্রচারিত হয়েছিল। উক্ত বিজ্ঞাপন ছাড়া এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশের অপর কোনো সংবাদ আমাদের জানা নেই। মীর মশাররফ হোসেন কখনও রচনার কাজ সমাপ্ত হওয়ার আগেই বিজ্ঞাপন দিতেন, এমন সংবাদ পাওয়া যায় 'বিবি কুলসুম' গ্রন্থে: "নাম রাখিলে, বিজ্ঞাপন দিলে, পুস্তকের খোঁজ নাই।" কাজেই 'রাজিয়া খাতুন' পুস্তকাকারে বেরিয়েছিল এ-কথা সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় না। তবে টাঙ্গাইল থেকে প্রকাশিত মীর মশাররফ হোসেনের 'হিতকরী' পত্রিকায় 'রাজিয়া খাতুন' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশলাভ করার সংবাদ পাওয়া যায়। ড. আশরাফ সিদ্দিকী 'হিতকরী' পত্রিকা আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, "মীর সাহেবের 'রাজিয়া খাতুন' উপন্যাসটিও টাঙ্গাইলের এই 'হিতকরী'তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল। অধ্যাপক আবদুল হাই 'রাজিয়া খাতুন'কে উপন্যাস শ্রেণীভুক্ত করলেও, প্রকৃতপক্ষে এটি উপন্যাস কি না, সে-সম্পর্কে সন্দেহও প্রকাশ করেছেন।" অধ্যাপক আশরাফ সিদ্দিকী 'রাজিয়া খাতুন'কে উপন্যাস বলেই উল্লেখ করেছেন।

মশাররফ হোসেন রচিত 'এসলামের জয়' ইতিহাসও নয়, উপন্যাসও নয়— ইসলামের শৈশবেতিহাসের কতকগুলো ধারাবাহিক এবং বিচ্ছিন্ন কাহিনি নিয়ে রচিত আন্তরিকতাপূর্ণ আবেগময় সন্দর্ভ। ইতিহাসের ঘটনা এর আখ্যান ভাগের মূল কথা, তবু রচনার মননশীলতা, দৃষ্টিভঙ্গির গভীরতা এবং ভাবময়তা 'এসলামের জয়' রসসন্দর্ভটিকে উপন্যাসের পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছে। 'ঐতিহাসিক উপন্যাসের ঢঙে' লেখা রচনাটিতে 'চরিত্র চিত্রণোপযোগী ঔপন্যাসিকের গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও বিশ্লেষণী শক্তির প্রকাশ' ঘটেছে। মদিনায় অবস্থানকালে হজরত মোহাম্মদের (স.) জীবনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এর প্রধান শাখায় দশটি মুকুলে বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় শাখায় তেরোটি মুকুলে বিবৃত হয়েছে মক্কা বিজয় এবং তার পরবর্তী ঘটনাসমূহ। হজরত মোহাম্মদের (স.) নেতৃত্বে ইসলামের বিজয়-পতাকা কীভাবে একের পর এক রক্তাক্ত সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে প্রতিষ্ঠিত হল, তারই ঘটনালেখ্য রচিত হয়েছে এই গ্রন্থে। হজরত মোহাম্মদের (স.) কঠোর সাধনা ও অটলতা, চারিত্রিক মাহাত্ম্য ও আদর্শে কেমন করে এই জয় সূচিত হল, সেই কাহিনিই রূপ লাভ করেছে এই গ্রন্থে। দুঃখে মহীয়ান তিনি, বিপদে স্থির এবং আদর্শে অনমনীয়। দুঃখের মধ্যেও মানুষ হজরত মোহাম্মদের (স.) যে উন্ন দীপ্তির মহিমোজ্জ্বল ছবি মীর সাহেব এঁকেছেন, তা তাঁকে হজরত মোহাম্মদের (স.) আদর্শ ও জীবনের সৌন্দর্যমুগ্ধ ভক্তের পর্যায়ে পৌঁছে দেয়। ইসলাম ও হজরত মোহাম্মদের (স.) অনমনীয় দৃঢ়চেতা শত্রু কোরেশ দলপতি আবু সুফিয়ানের মুখের বিদ্রূপবাণ ও বক্রোক্তি আল্লাহ্‌র রসুল হজরত মোহাম্মদের (স.) অন্তর্জীবন ও ব্যক্তিত্বের বর্ণনায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে এই গ্রন্থে। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও আদর্শের মহিমায় হজরত আবুবকর (র.), হজরত উমর (র.), হজরত উসমান (র.) ও হজরত আলি (র.) একে একে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। অতঃপর বিজয়ীর বেশে হজরত মোহাম্মদ (স.) মক্কা প্রবেশ করেন, তাঁর ক্ষমাসুন্দর মন কীভাবে মক্কাবাসীকে মোহিত করল, তার স্মৃতি রোমন্থন করেছেন লেখক।

এই সময়ের ইসলামের প্রধান সেনাপতি মোহাম্মদ খালেদের অসীম বীরত্বের ছবিও আছে এই গ্রন্থে। রোমানদের সঙ্গে মুসলমানদের যুদ্ধে সেনাপতি হন মোহাম্মদ খালেদ। এই যুদ্ধে একাধিক বার তাঁর অসি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। তবুও তাঁর অসীম বীরত্ব ও দক্ষতায় মুসলমানরাই এই যুদ্ধে জয়লাভ করে।

'এসলামের জয়' প্রকাশিত হয় ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে। এ-সময়ে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন চলছে এবং তা রদ করবার জন্য বাংলাজোড়া তুমুল আন্দোলন চলছে। মীর সাহেব এই রাজনৈতিক ঝড়ঝঞ্ঝা থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করলেও, অবচেতন মনে স্বাধীনতার স্পৃহার কথা প্রকাশিত হয়ে পড়েছে এই গ্রন্থে। রোমান সৈন্যদের মাতোয়া প্রান্তরে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে গিয়ে দলপতি বলছেন, "স্বরাজ্যে স্বরাজ অপেক্ষা গৌরবের কথা অস্থায়ী জগতে আর আছে কি ভাই? স্বারাজই যদি পররাজ্য হইল, তবে গোলামী করিয়া জীবন-ধারণ করা অপেক্ষা জীবনপাত করাই শ্রেয়। জননী জন্মভূমির মায়া যে নরাধম পামরের হৃদয়ে নাই, তাহার জীবন বৃথা। নিজ জীবন রক্ষা করিতে স্বদেশের স্বাধীনতা-রত্ন যাহারা পরহস্তে তুলিয়া দেয়, তাহাদের ন্যায় কুলাঙ্গার দেশবৈরী আর কে আছে?"

মশাররফ হোসেন সাহিত্যচর্চা শুরু করেন উনিশ শতকের সপ্তম দশকে, শেষ করেন বিশ শতকের প্রথম দশকে। চল্লিশ বছরের যুগ ও পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর মনোভাব ও চিন্তাজগতের পরিবর্তন ঘটে। বিশেষ করে বাংলার মুসলমান সমাজের তখন সংকটকাল এবং সংকট থেকে উত্তরণের কাল। উপন্যাসে তার ছাপ স্পষ্ট। উপন্যাস ছাড়া তিনি ধর্মভাব নিয়ে দশখানা পুস্তক লেখেন, যা তাঁর সমগ্র রচনার প্রায় তিরিশ ভাগ। রূপকথা-পুরাকথাধর্মী গল্প ও ছোটো ছোটো নকশা-প্রহসনের সংখ্যাও প্রায় তিরিশ ভাগ। এই দুই শ্রেণির রচনা বাদ দিলে, বাকি চল্লিশ ভাগ রচনা অর্থাৎ চোদ্দো-পনেরোটি গ্রন্থের ভিত্তির ওপরে মশাররফের প্রকৃত সাহিত্যকীর্তি দাঁড়িয়ে আছে। তাঁর মানবপ্রীতি, স্বদেশপ্রীতি, জাতীয়তাবোধ, সমাজের হিতচিন্তা এসব রচনায় সহজ স্ফূর্তি লাভ করেছে।

উপসংহারে বলা যায়, বাংলা সাহিত্যে মশাররফের স্থান নির্দেশ করতে গিয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর প্রতিতুলনা করে যে-মন্তব্য করেছিলেন, 'বিষাদ-সিন্ধু'র প্রেক্ষাপটে মশাররফ হোসেনের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে সেই উক্তি বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য: "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'সীতার বনবাস' বাংলাদেশের ঘরে ঘরে যেমন এককালে পঠিত হইয়াছিল, 'বিষাদ-সিন্ধু' তেমনই আজও পর্যন্ত জাতীয় মহাকাব্যরূপে বাঙালী মুসলমানের ঘরে ঘরে পঠিত হয়; বাংলা সাহিত্যের অপূর্ব সম্পদ হিসাবে সকল সমাজেই এই গদ্যকাব্যখানির সমান আদর। ... তাঁহার সাহিত্য-প্রতিভা এমনই উচ্চশ্রেণীর ছিল যে, সুদূর অতীতের কারবালা-প্রান্তরের ট্রাজেডিকে তিনি সমগ্র বাংলাভাষাভাষীর ট্রাজেডি করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন।" ■

উনিশ শতকে বাংলার মুসলমান সমাজ যখন ব্রিটিশদের অবিশ্বাসের চোখে দেখত আর পাশ্চাত্য শিক্ষা থেকে দূরে থাকতে চাইত, সেই সমাজেরই একজন মানুষ তখন এগিয়ে এসে বলেছিলেন আধুনিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা। সেই মানুষটিকে আজ স্মরণ, তাঁর ১৮৬-তম জন্মবর্ষে।

নবাব আবদুল লতিফ খান বাহাদুর

(১৮২৮—১৮৯৩)

ফ্রান্সিস ব্র্যাডলি ব্র্যাডলি-বার্ট

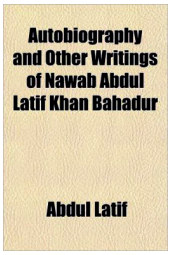

অনুবাদ: তাজউদ্দিন আহ্‌মেদ

ফ্রান্সিস ব্র্যাডলি ব্র্যাডলি-বার্ট (১৮৭৪—১৯৬৩) ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন। কালেক্টরের জীবন থেকে ক্রমে অনেক উঁচু পদে পৌঁছোন। নানা বিষয়ে খুঁটিনাটি আগ্রহ ছিল তাঁর। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সঙ্গেও ছিলেন যুক্ত। আখ্যানগ্রন্থসহ স্বনামে মোট ন-টি বই লিখেছেন। ছদ্মনামে (শিল্যান্ড ব্র্যাডলি) লিখেছেন পাঁচটি। বই প্রকাশের দিক থেকে তাঁর লেখকজীবন ১৯০২ থেকে ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। ১৯১০ সালটি ছিল লেখক ব্র্যাডলি-বার্টের ব্যস্ততম বছর। ওই বছর তাঁর তিনটি বই প্রকাশ পায়। ছদ্মনামে 'দ্য অ্যাডভেঞ্চারস অফ অ্যান এ ডি সি' এবং স্বনামে 'পার্সিয়া, থ্রো পার্সিয়া ফ্রম দ্য গালফ টু দ্য কাস্পিয়ন' এবং 'টুয়েলভ মেন অফ বেঙ্গাল ইন দ্য নাইনটিন্থ সেঞ্চুরি।' শেষোক্ত বইয়েই রয়েছে 'নবাব আবদুল লতিফ খান বাহাদুর সি আই ই' নামে তাঁর লেখাটি, যেটি আজ থেকে কমপক্ষে ১১০ বছর আগে রচিত। সেই লেখাটিরই বাংলা অনুবাদ এ-বার 'স্মরণ' বিভাগে ছাপা হল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মুসলমান ইতিহাসে নবাব আব্দুল লতিফ খানের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। যদিও প্রায় পঁয়তিরিশ বছরেরও বেশি সময় তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চেয়ে কোনো উচ্চতর সরকারি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন না, কিন্তু নিজের আদর্শ রূপায়ণে নিরলস প্রচেষ্টা এবং স্বকীয় দক্ষতার ফলে কেবলমাত্র মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে নয়, ইউরোপীয় সমাজেও এক বিশেষ স্থান অধিকার করেন। তিনি সেইসব প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম, যাঁরা প্রথম, মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ আধুনিক শিক্ষা প্রসারের আন্দোলন থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখে যে-ভুল করছিলেন, তা অনুধাবন করেছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে দায়িত্ব-সচেতনতা জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাঁর অন্তরে লালিত পরধর্মসহিষ্ণুতা এবং হিন্দু-মুসলমান, দুই সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক স্থাপনের ইচ্ছা, তাঁকে সর্বজনশ্রদ্ধেয় করে তুলেছিল। সরকারি চাকরির প্রাত্যহিক কর্মের প্রবল চাপ সত্ত্বেও তিনি মুসলমান সম্প্রদায় তথা দেশের ভাগ্যহীন দরিদ্র মানুষদের উন্নতিবিধানের যেকোনো আন্দোলনে মনপ্রাণ দিয়ে অংশ নেওয়ার জন্য সময় বের করতেন। বেঙ্গাল প্রভিন্সিয়াল সার্ভিসে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাজ ছাড়াও তিনি জীবনে আরও বহু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। উল্লেখযোগ্য হল— কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো, বেঙ্গাল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের (বঙ্গীয় বিধান পরিষদ) সদস্য, অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট, প্রেসিডেন্সি কলেজের একজন প্রতিষ্ঠাতা, জাস্টিস অফ পিস, কলকাতা শহরের প্রথম নিয়মানুগ জনগণনা পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠিত কমিটির সদস্য এবং ক্যালকাটা লিটেরারি সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, নবাব আব্দুল লতিফের বিপুল কর্মপরিধি এবং কর্ম-উৎসাহের অতি সামান্যই পূর্ব-উল্লিখিত তালিকা থেকে অনুধাবন করা সম্ভব।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বৃহদংশ জুড়ে তাঁর দীর্ঘ জীবন। তাঁর জন্ম হয়েছিল ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে। ফলে সামাজিক আর্থিক এবং নৈতিক যে-পরিবর্তন ভারতবর্ষ, বিশেষত বাংলায় সেই সময় সাধিত হয়েছিল, তার তিনি সাক্ষী ছিলেন। তাঁর শৈশবকালে রেলপথ এবং টেলিগ্রাফ— আধুনিকতার এই দুটি অভিজ্ঞান পাশ্চাত্যেও অজানা ছিল। তিনি তাঁর জীবনেই দেখে গিয়েছিলেন, কীভাবে এই দুইয়ের প্রসার বিশ্বের অন্যতম মন্থর এবং রক্ষণশীল দেশে আমূল পরিবর্তন এনেছিল। ১৮২৮ সালে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে ছিল সনদ এবং ভারতবর্ষ আরও ছয় বছর তাদের কাছে ছিল বিধি-নিষেধের নিগড়ে বাঁধা দেশ। লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক তখন সদ্য কার্যভার নিয়েছেন, কিন্তু তাঁর প্রশাসনের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য আইন সতীদাহ প্রথার অবলুপ্তি তখনও দূরস্থ।

আব্দুল লতিফের জন্ম পূর্ববঙ্গের এক অভিজাত পরিবারে, যাঁরা বংশপরম্পরায় পূর্ববঙ্গে বাস করতেন। এই পরিবারের পূর্বপুরুষের মধ্যে ছিলেন খালেদ, যিনি ধর্মযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে তাঁর বীরত্বের জন্য 'ঈশ্বরের তরবারি' হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এ ছাড়াও এই পরিবারের পূর্বপুরুষদের

কলিকাতা মাদ্রাসা, ছাত্র যখন নবাব আবদুল লতিফ। এক ব্রিটিশ চিত্রকরের আঁকা।

মধ্যে অনেকেই শিক্ষা, ঈশ্বরভক্তি এবং উদ্যোগের পরিচয় রেখেছেন। খালেদের পরবর্তী প্রজন্ম বাস করতেন মক্কা শহরে। পরবর্তীকালে দেশের অন্য অনেক ব্যক্তি যখন রোমাঞ্চের সন্ধানে পূর্ব পানে যাত্রা করেন, এই পরিবারের এক সদস্য শাহ আজিমুদ্দিন ভারতের পথে পাড়ি দেন। দিল্লিতে পৌঁছে তিনি তৎকালীন সম্রাটের তত্ত্বাবধানে সেখানে বসবাস শুরু করেন এবং অচিরেই ধর্মানুরাগ এবং শিক্ষার বলে বিখ্যাত হন। তাঁর পুত্র আব্দুর রসুল পূর্ববঙ্গের বিচারকের পদ লাভ করার ফলে আরও অন্তর্দেশে যাত্রা করেন এবং শেষ পর্যন্ত ফরিদপুর জেলার ইয়াজপুরে নিজ বাসস্থান গড়ে তোলেন। সে বড়ো বিপদসংকুল সময়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রান্তভাগে তখনও আইনের শাসন বলে কিছু ছিল না। বড়ো নদীগুলি ছিল যাতায়াতের পথ এবং সেগুলি ছিল ডাকাতে পরিপূর্ণ। ফলে, দেশের গভীরতর এলাকায় নদীর উভয় প্রান্তে বসবাস করা ছিল অসম্ভব। আব্দুল রসুল সেই এলাকার একটি শান্ত এবং নিরাপদ স্থানে নিজের বসত গড়ে তোলেন, যা এখনও তাঁর বংশধরদের মালিকানাতেই রয়েছে। পরবর্তীকালে বিচারকের পদ পান তাঁর পুত্র এবং তিনি আরও একটি জমি অধিকার করেন এবং পরিবারের যশ বৃদ্ধি করেন। কিন্তু আরও অনেক মুসলমান পরিবারের মতোই, এই পরিবারের বাড়বাড়ন্তের মধ্যেই নিহিত ছিল পতনের বীজ, কারণ, বহু বংশধরদের মধ্যে ভাগবাটওয়ারা হবার ফলে কারো কাছেই পর্যাপ্ত সম্পত্তি ছিল না, যার দ্বারা জীবন নির্বাহ করা সম্ভব। রাজাপুরে আব্দুর রসুলের বংশধরদের সাথে একই ঘটনা ঘটার ফলে, তাঁদের অনেককেই নিজেদের পারিবারিক পরিধির বাইরে গিয়ে জীবিকার সন্ধান করতে হয়েছিল। এঁদের মধ্যে শাহ আজিমুদ্দিনের ষষ্ঠ উত্তরপুরুষ কাজি ফকির মোহাম্মদ ভাগ্যের সন্ধানে কলকাতা পাড়ি দিলেন। কলকাতায় তিনি সদর দেওয়ানি আদালতের আইনজীবীর পেশা গ্রহণ করেন, যা কিনা সেই সময়কার উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদের কাছে কোম্পানির চাকরির বাইরে একমাত্র সম্মানজনক পেশা ছিল। সদর আদালতের আইনজীবী যে-স্বাধীনতা উপভোগ করতেন, তা ফকির মোহাম্মদকে আকর্ষণ করেছিল। আবার তাঁর ব্যক্তিগত উৎসাহ আইনি পেশার বাইরে বহুদূর প্রসারিত ছিল। ইতিহাসের অধ্যয়ন তাঁর কাছে ছিল এক প্রবল আকর্ষণ। তাঁর সেই গবেষণার ফল হল ফারসি ভাষায় লেখা ইতিহাস 'জাম-ই-উল তওয়ারিক'। ১৮৩৬ সালে প্রকাশিত হওয়া এই গ্রন্থ যথেষ্ট সুনাম লাভ করেছিল। এর আট বছর পরে কাজি ফকির মোহাম্মদ, তাঁর রাজাপুরের গৃহে মারা যান। লক্ষণীয় যে, জীবনের বৃহত্তর পরিসরে বিপুল সাফল্যও তাঁর পারিবারিক বাসভূমি থেকে তাঁকে বিচ্ছিন্ন করতে পারেনি।

কাজি ফকির মোহাম্মদের দ্বিতীয় সন্তান, ভবিষ্যতের নবাব আব্দুল লতিফ, এই জীবনকথার নায়ক। তাঁর দুই ভাইয়ের সাথে তিনি কলকাতা মাদ্রাসাতে শিক্ষালাভ করেন এবং জীবনের প্রথম থেকেই তাঁর মধ্যে পরিলক্ষিত হয় এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনা। কলকাতা মাদ্রাসা স্থাপিত হয়েছিল তৎকালীন ভারতবর্ষের দক্ষতম প্রশাসক ওয়ারেন হেস্টিংসের প্রচেষ্টাতে। তিনি এই প্রতিষ্ঠানটি কোম্পানির কাজ এবং আইনের শাসন পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মীদের প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে স্থাপন করেছিলেন। নতুন বাংলা, যা ধীরে ধীরে মাথা তুলছিল, তার মাঝে এই প্রতিষ্ঠানটি ছিল আরবি এবং ফারসি শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র, কিন্তু সময়ের সাথে সাথে সেটি প্রগতি ও সংস্কারের বিপরীতে রক্ষণশীলতা ও ঐতিহ্যের পীঠস্থান হয়ে ওঠে। অথচ পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছিল। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন মজবুত হবার সাথে সাথে প্রয়োজন পড়ে পাঠক্রমের আধুনিকীকরণের। এবং ইংরেজি ভাষাকে এই আধুনিকীকরণের একটি মুখ্য বৈশিষ্ট্য হিসেবে গণ্য করা হয়। এই মাদ্রাসাতে পাঠরত অবস্থায় আব্দুল লতিফ প্রথম সেই সমস্যার সম্মুখীন হলেন, যা তাঁর পরবর্তী জীবনের প্রধানতম কর্মকাণ্ডের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সেই সময়ের ভারতবর্ষের মুসলমান সম্প্রদায়, তাদের প্রাচীন প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থাকে আঁকড়ে ধরে ক্রমবর্ধমান আধুনিকতার স্রোত থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখেছিল। স্বভাবত তারা ছিল কঠোরভাবে রক্ষণশীল এবং প্রতিযোগিতার কোনো অভ্যাস তাদের ছিল না। তারা অনুভব করতে পারেনি যে, আইন এবং ধ্রুপদি শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের কৌলিন্য কোনোদিন ক্ষুণ্ণ হতে পারে। দেশের অন্য সম্প্রদায় সহজে বুঝতে পেরেছিল যে, পরিস্থিতি চিরকালের জন্য এমনভাবে বদলে গেছে, ইংরেজি ভাষার জ্ঞান এখন অত্যাবশ্যক। কিন্তু মুসলমান সম্প্রদায় এই সত্য অনুভব করতে ব্যর্থ হয়েছিল। বর্তমান যুগের আধুনিকতার আলোকে, তৎকালীন মুসলমান সম্প্রদায়ের এই চূড়ান্ত অনমনীয় মনোভাব এবং সময়ের সাথে পা ফেলার সমস্ত পথ প্রত্যাখ্যান করাকে বিস্ময়কর মনে হতেই পারে। ঊনবিংশ শতকের চতুর্থ দশকে, যখন আব্দুল লতিফ কলকাতা মাদ্রাসার ছাত্র, তখন বহু বিতর্কের পর সেখানে ইংরেজি প্রবর্তিত হয়। কিন্তু বিরোধিতা এতটাই প্রবল ছিল যে, ছাত্ররা প্রায় সবাই আরবি এবং ফারসি পাঠক্রম এবং দ্রুত অপ্রাসঙ্গিক হতে থাকা আইনশিক্ষার পরিধিতে সীমাবদ্ধ থেকে ইংরেজি ক্লাস বয়কট করেছিল। তাদেরকে বোঝানো সম্ভব হয়নি যে, নতুন শাসনতন্ত্রে ইংরেজির জ্ঞান অত্যন্ত জরুরি এবং ফারসি, আরবি এবং ইসলামি আইনশাস্ত্রের জ্ঞান তাদের পূর্বগৌরব এবং গুরুত্ব হারিয়েছে। আজ প্রায় পঁচাত্তর বছর পরেও আমরা বিস্মিত হই, কীভাবে সরকার-সৃষ্ট নানা সুযোগের তারা বিরোধিতা করেছিল, যেগুলির দ্বারা এই সম্প্রদায়ের মঙ্গল সাধনের সম্ভাবনা ছিল। অন্যদিকে হিন্দু সম্প্রদায় এইরকম কোনো ভ্রান্ত ধারণা দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে, সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে সুযোগ কাজে লাগায়, যার ফল এখন স্পষ্ট। আব্দুল লতিফ এবং তাঁর জনা কয়েক সহপাঠীর মতো অল্পসংখ্যক মুসলমানদের মধ্যেই ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট ও প্রকৃত ধারণা ছিল। তাঁরা পরিবর্তিত সময়ের প্রয়োজন অনুযায়ী নিজেদের প্রস্তুত করতে ইংরেজি ও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হবার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন। মুসলমান সম্প্রদায়ের দ্রুত অবনতি লক্ষ করে, এই সময় থেকেই আব্দুল লতিফ সেইসব সংস্কার ও ভ্রান্ত ধারণার বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করলেন, যার ফলে মুসলমানেরা যুগের সাথে অগ্রসর হতে কিংবা পরিস্থিতির সাথে নিজেদের পরিবর্তন করতে পারেনি। আব্দুল লতিফের ইংরেজিতে দক্ষতা যেমন একদিকে তাঁর সহধর্মীয়দের মধ্যে তাঁকে বিশিষ্টতা প্রদান করেছিল, তেমনি অনেক উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীদের সাথে তাঁর সরাসরি যোগাযোগ ঘটিয়েছিল। তৎকালীন ব্রিটিশ প্রশাসন কলকাতা মাদ্রাসাতে ইংরেজি প্রবর্তনের বিষয়টি গভীর মনোযোগের সাথে লক্ষ রাখছিল, কারণ, তারা যেকোনো প্রকারে বিষয়টির গুরুত্ব মুসলমান সম্প্রদায়ের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছিল। ফলে যে সামান্য কয়েক জন ছাত্র ইংরেজি ক্লাসের সদ্ব্যবহার করেছিল, তাদের উৎসাহিত করার জন্য চিহ্নিত করা হত। ফলে আব্দুল লতিফ একটি সরকারি বৃত্তি লাভ করেছিলেন এবং নিজের বিনয়, সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার ও সর্বোপরি ইংরেজি ভাষার ওপর সুগভীর দখলের জন্য দেশের সর্বোত্তম সমাজে নিজের স্থান পাকা করেছিলেন। কিন্তু আজকের তুলনায় সে-যুগে সামান্য কিছু পদই ভারতীয় ছাত্রদের জন্য বরাদ্দ

প্রেসিডেন্সি কলেজ।

ছিল। ফলে স্থায়ী সরকারি পদে যোগ দিতে আব্দুল লতিফের বেশ কিছু সময় লেগে যায়। কলকাতা মাদ্রাসাতে পাঠ শেষ করে তিনি প্রথম চাকরি পান সিন্ধের আমিরের সচিব হিসেবে, যিনি সে-সময় রাজনৈতিক ভাতা নিয়ে দমদমে বাস করছিলেন। তারপর এক বছর তিনি ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকের পদে ছিলেন। আইসিএস অফিসার মিস্টার স্যামুয়েলসের অধীনে একটি তদন্ত কমিশনে একটি অস্থায়ী চাকরি করার পর তিনি কলকাতা ফিরে এসে কলকাতা মাদ্রাসাতে অ্যাংলো-আরবি অধ্যাপকের পদে যোগ দেন। এর মধ্যে অবশ্য তাঁর নাম সাব-অর্ডিনেট এক্সিকিউটিভ সার্ভিসের জন্য প্রস্তাবিত হয়েছে এবং তা মনোনীতও হয়েছে। ফলে তাঁকে নিয়োগপত্রের জন্য প্রতীক্ষা করতে হয়নি। ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে একুশ বছর বয়সে তিনি বাংলা দেশের তদানীন্তন ডেপুটি গভর্নর স্যার হার্ভার্ড হ্যাডক দ্বারা একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিযুক্ত হন। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মর্যাদাভুক্ত পদের মধ্যে সর্বনিম্নটিতে, মাসিক দু-শো টাকা বেতনে তিনি চব্বিশ পরগনার হেড কোয়ার্টারে নিযুক্ত হলেন। এরপর পঁচিশ বছরেরও বেশি সময় তিনি সাব-অর্ডিনেট এক্সিকিউটিভ সার্ভিসে কাটিয়েছিলেন। লক্ষণীয় যে, আব্দুল লতিফ কর্মজীবনে তুলনামূলকভাবে সাধারণ পদে আসীন থাকলেও, ব্যাপকভাবে বিস্তৃত ছিল তাঁর প্রভাব এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান নেতা হিসেবে তিনি বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষে সর্বজনস্বীকৃত ছিলেন। আব্দুল লতিফের কর্মজীবনের এই বৈশিষ্ট্য তাঁর চারিত্রিক শক্তি এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দিককেই নির্দেশ করে।

তিন বছর আব্দুল লতিফ আলিপুরে থেকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাজ শিখলেন এবং এই পর্বের পর তাঁকে প্রথম শ্রেণির ক্ষমতা দেওয়া হয় এবং তিনি জাস্টিস অফ পিসের দায়িত্ব পান। ১৮৫৩ সালে কর্মক্ষেত্রে তাঁর স্বাভাবিক পদোন্নতি হয় এবং তিনি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার অন্তর্গত, সদ্য প্রতিষ্ঠিত কালোরো সাবডিভিশনের সাবডিভিশনাল অফিসারের দায়িত্ব পান। এক বছর এই পদে থাকার সময় তিনি নীল চাষে রায়ত এবং মালিকদের মধ্যে যে-সমস্যার সৃষ্টি হয়, যা পরবর্তী কালে ১৮৬০ সালে লেফটেন্যান্ট গভর্নর জন পিটার গ্রান্টের নেতৃত্বে বিখ্যাত ইন্ডিগো কমিশনের জন্ম দেয়, তার প্রতি মনোযোগ দিয়েছিলেন। কর্মজীবনের এই প্রারম্ভিক বছরগুলিতেই আব্দুল লতিফ তাঁর কর্মশক্তি, দক্ষতা এবং সর্বোপরি তাঁর ঔদার্য ও কুশলতা, যা তাঁকে পরবর্তীকালেও বিখ্যাত করেছে, এর জন্য সুনাম অর্জন করেছিলেন। এই কারণেই কালোরোতে এক বছর কাটাবার পর, তাঁকে এমন একটি পদের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল, যার জন্য দক্ষতা এবং কৌশল উভয়ের প্রয়োজন ছিল। জেহনাবাদ সাবডিভিশন বাংলা দেশের প্রশাসনের কাছে ছিল একটি বহু দিনের পুরোনো সমস্যা। এই এলাকাটি সবসময়ই অশান্ত এবং সমস্যাসংকুল বলে উল্লিখিত হত। ১৮৫৪ সালে আইনশৃঙ্খলার অধিকতর অবনতি হবার দরুন এলাকাটিতে বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। সেখানের কঠিন পরিস্থিতি সামলানোর জন্য উদ্‌বিগ্ন প্রশাসন চেয়েছিল সুদক্ষ সাবডিভিশনাল অফিসার, এবং আব্দুল লতিফকেই সে-কাজে নির্বাচিত করা হয়েছিল। তরুণ অফিসারের প্রতি এ ছিল এক ধরনের আস্থাজ্ঞাপন এবং আব্দুল লতিফ এই আস্থার মর্যাদা রক্ষা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। কলকাতা সন্নিহিত একটি জেলা আজ থেকে ষাট বছর আগে কীভাবে সম্পূর্ণ আইনশৃঙ্খলারহিত হতে পারে, তা আমাদের বিস্মিত করে। দাঙ্গাহাঙ্গামা, পথেঘাটে ছিনতাই ও ডাকাতি ছিল অতি সাধারণ ঘটনা এবং মূল জেহানাবাদ ছাড়া আর কোথাও জীবন এবং সম্পত্তি নিরাপদ ছিল না। তরুণ সাবডিভিশনাল অফিসার আব্দুল লতিফ এই পরিস্থিতি প্রতিকারের জন্য কোমর বেঁধে নামলেন। শুধুমাত্র যে তাঁর কাজ কঠিন ছিল, তা নয়, যাদের সবরকম সহায়তা তাঁর পাওয়ার কথা, তারাই সর্বপ্রকারে বাধা সৃষ্টি করেছিল। আব্দুল লতিফের পূর্বতন অফিসারের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল ধূর্ত আর বেপরোয়া সব গেঁয়ো উকিল, জমিদারদের গোমস্তা এবং মামলাবাজ মানুষজন। এদের সাথে তাল মিলিয়েছিল সরকারি কর্মচারীরাও, যারা তাঁকে সবসময় সমস্যায় জর্জরিত করে রাখত। এরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে ক্রমাগত অভিযোগ জানিয়ে চলত। ফলে অফিসারকে সদাই ব্যস্ত থাকতে হত অভিযোগের জবাব দিতে এবং নিজের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা দিতে। ফলত যে পাঁচ বছর আব্দুল লতিফ জেহানাবাদে ছিলেন, তাঁর কাজ ছিল কঠিন এবং নিজের কর্মকৌশলের সবটুকু তাঁকে কাজে লাগাতে হয়েছিল। তিনি যে-দক্ষতায় সেই কাজ সম্পন্ন করেছিলেন, তা সর্বস্তরেই স্বীকৃত হয়েছিল। যে জেহানাবাদ সাবডিভিশনের দায়িত্ব তিনি নিয়েছিলেন এবং যা তিনি ছেড়ে গিয়েছিলেন, তার মধ্যে ছিল বিস্তর ফারাক। আব্দুল লতিফ তাঁর পদ ছেড়ে নতুন দায়িত্ব নিয়ে স্থানান্তরিত হবার আগে হুগলির ম্যাজিস্ট্রেট লর্ড উলিক ব্রাউন সরকারিভাবে চিঠি দিয়ে তাঁর অবদানের জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন যে, আব্দুল লতিফ জেহানাবাদের মতো কঠিন একটি সাবডিভিশনের দায়িত্ব অত্যন্ত সন্তোষজনকভাবে পালন করেছেন এবং সেখানে তাঁর অভাব গভীরভাবে অনুভূত হবে।

১৮৫৭ সালে আলিপুরে ফিরে আসার পর আব্দুল লতিফ পুনরায় তাঁর সামাজিক এবং লোকহিতকর কাজকর্ম শুরু করতে পারলেন, যা কিনা জেহনাবাদে থাকা অবস্থায় প্রায় বন্ধই হয়ে গিয়েছিল। মুসলমান সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য যাবতীয় কর্মকাণ্ডে তিনি পুনরায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন এবং সর্বত্রই দক্ষ এবং সক্রিয় মিত্র হিসেবে সাদর অভ্যর্থনা লাভ করেন। ১৮৬০ সালে তিনি সিভিল এবং মিলিটারি সার্ভিস পরীক্ষার পরিচালন সমিতির সদস্য নির্বাচিত হন এবং অবসর পর্যন্ত সেই পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। কর্মজীবনের বারো বছর পূর্ণ না হওয়া সত্ত্বেও, এর পরের বছরই স্যার জন গ্রান্ট সদ্য প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে তাঁকে নির্বাচন করেন এবং তিনিই ছিলেন এর প্রথম মুসলমান সদস্য। কর্মজীবনে নবীন এবং তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন একজনের পক্ষে এই নির্বাচন ছিল অত্যন্ত সম্মানের। সেই একই সময়ে আয়কর প্রথা প্রচলনের সরকারি চেষ্টা প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হয় এবং তা মোকাবিলা করার জন্য তৈরি হওয়া 'বোর্ড অফ কমিশনসে'র সদস্য হিসেবেও তিনি নির্বাচিত হন। দুই বছরের কার্যকালের পর তিনি যখন বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্যের দায়িত্বভার ছাড়েন, তৎকালীন লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার সিসিল বিডন তাঁকে তাঁর অবদানের জন্য বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানান। এরপর আরও চার বছর তিনি আলিপুরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কাজ করেন এবং ১৮৬৭ সালে ক্রমবর্ধমান কলকাতা নগরী এবং দক্ষিণ শহরতলির প্রয়োজনে সদ্য প্রতিষ্ঠিত সাবার্বান কোর্টের প্রথম ম্যাজিস্ট্রেট পদে নির্বাচিত হন। দশ বছর তিনি এই কঠিন এবং শ্রমসাপেক্ষ দায়িত্ব পালন করেন। পুলিশ কোর্টের বদ্ধপরিবেশে সারাদিন প্রবল পরিশ্রমের পরেও যেভাবে তিনি সর্বান্তঃকরণে নিজের প্রিয় লক্ষ্যগুলিকে বাস্তবায়িত করার জন্য নানাবিধ শ্রমসাধ্য কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তেন, তা তাঁর শক্তি ও উদ্যমের পরিচায়ক। ১৮৭০ সালে তিনি স্যার উইলিয়াম গ্রে দ্বারা পুনরায় বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে মনোনীত হন। পরবর্তীকালে স্যার জর্জ ক্যাম্পবেল তাঁকে তৃতীয় বারের জন্য সেই পদে মনোনীত করার সময়, ১৮৭২ সালের ৩০ ডিসেম্বরে লেখা একটি পত্রে উল্লেখ করেছিলেন, "আমার মনে হয় না, লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব আপনার চেয়ে আর কেউ ভালোভাবে করতে পারেন।" ১৮৭৯ সালে কয়েক মাসের জন্য তিনি বেতনভুক প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কাজ করেন। এর অব্যবহিত পরে তিনি শিয়ালদহের সাবার্বান পুলিশ কোর্টের দায়িত্ব পান। ১৮৮৭ সালে সরকার প্রদত্ত বিশেষ পেনশন নিয়ে অবসর গ্রহণের আগে পর্যন্ত সাত বছরেরও বেশি সময় এই পদে তিনি আসীন ছিলেন ।

সংক্ষেপে এই হল আব্দুল লতিফের কর্মজীবনের সরকারি বিবরণ। নিঃশব্দ এবং ধারাবাহিকভাবে সফল এই কর্মজীবনে তেমন বড়ো কোনো সুযোগ না থাকলেও লক্ষ করা যায়, সীমিত সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশের ছাপ। কিন্তু উল্লেখ্য যে, উনিশ শতকের বাংলা দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে তাঁর স্থান সরকারি কাজে দক্ষতা দেখানোর জন্য তিনি লাভ করেননি, তাঁর সামাজিক এবং জনকল্যাণমূলক কাজের জন্যই তিনি মুসলমান সম্প্রদায়ের স্মৃতিতে আজও অমলিন হয়ে আছেন। আজ যখন জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই মুসলমান মানুষজন অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন, তখন তৎকালীন মুসলমান সমাজে আব্দুল লতিফের অনন্য স্থান এবং সেই সমাজের উন্নতিকল্পে তাঁর বিরাট অবদানের মর্মার্থ অনুধাবন করা কঠিন। উনিশ শতকের দ্বিতীয় পর্যায়ে যে প্রগতিবাদী আন্দোলন তাঁর সহধর্মীয়দের মধ্যে দেখা যায়, তার পথপ্রদর্শক হিসেবে আব্দুল লতিফ অনেকাংশেই ছিলেন একা। বিভিন্ন সামাজিক জমায়েতে এবং অন্যান্য জনসভাতে তিনি একমাত্র মুসলমান হিসেবে উপস্থিত থাকতেন। জাতি-স্বাতন্ত্র্যের পুরাতন যুগ যে গত হয়েছে, তা অনুভব করে তিনি সর্বত্র যেতেন এবং সবাইকে জানার ও বোঝার চেষ্টা করতেন। সামাজিক জীবনের এমন কোনো অংশ ছিল না, যাতে তিনি যোগ দিতেন না এবং স্বধর্মী তথা সমগ্র সম্প্রদায়ের উন্নতিকল্পে নেওয়া এমন কোনো উদ্যোগ ছিল না, যা তিনি আন্তরিকভাবে সমর্থন করতেন না। তাঁর যোগাযোগ ছিল বিশাল। সব শ্রেণির মানুষ তাঁর কাছে সাহায্য এবং পরামর্শ চাইত। বহু প্রতিষ্ঠান তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা অথবা তাদের সভাতে তাঁর উপস্থিতি কামনা করত। মুসলমান সম্প্রদায়ের শিক্ষার উন্নতিকল্পে তাঁর অবদান সম্পর্কে কোনো প্রশংসাই অতিশয়োক্তি নয়। তাঁর জীবনের প্রথম পর্যায়ে মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা প্রায় ছিল না বললেই চলে। তাঁর কর্মজীবনের শুরুতেই তিনি মুসলমানদের অনীহা এবং ঔদাসীন্য থেকে মুক্ত করার জন্য ছোটো ছোটো পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। আধুনিক বিষয়ে তাদের আগ্রহ জাগিয়ে তোলার জন্য তিনি নিজের বাসগৃহে আলাপ-আলোচনার আসর বসাতেন। এইসব আসরে বিভিন্ন বিষয়, যেমন ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা, নৌবিদ্যা ও বাণিজ্যের উন্নতি, আমেরিকার আবিষ্কার, মানবসভ্যতার ইতিহাস এবং মুসলমান আইন নিয়ে নিবন্ধ পাঠ করা হত। কলকাতা মাদ্রাসার ছাত্রদের মধ্যে চিন্তন এবং অনুসন্ধিৎসাকে উৎসাহ দেবার উদ্দেশ্যে তিনি ফারসি ভাষাতে প্রবন্ধ লেখার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন। বিষয় ছিল: 'ভারতবর্ষের বর্তমান পরিস্থিতিতে ইংরেজি ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার ফলে মুসলমান ছাত্রদের কতটা উপকার হবে এবং কীভাবে এই চর্চা বাস্তবায়িত করা সম্ভব'। শিক্ষা দপ্তরের অনুমতিক্রমে এই পুরস্কারের লক্ষ্য সারা দেশে বিজ্ঞাপিত হয়েছিল এবং 'ক্যালকাটা গেজেটে'ও প্রকাশ করা হয়েছিল, যাতে সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ-উন্নতিকল্পে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই প্রশ্নের প্রতি সমগ্র সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। আধুনিক পরিস্থিতিকে সাদরে মেনে নেওয়া এবং তার সাথে সাযুজ্যপূর্ণ পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুতির ওপর নির্ভর করছিল নতুন ভারতবর্ষে মুসলমান সম্প্রদায়ের অবস্থা। প্রবন্ধ পাঠাবার জন্য পাঁচ মাস সময় দেওয়া হয়েছিল এবং সেই সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিশাল সংখ্যক লেখা জমা পড়ে। আশ্চর্যজনকভাবে বেশির ভাগ প্রবন্ধ ইংরেজি শিক্ষার সমালোচনা করে এবং পবিত্র কোরআন থেকে সেই মতের সমর্থনে যুক্তি দেখায়। কয়েকটি লেখাতে তো পুরস্কারদাতাকে নিজের ধর্মের প্রতি বিশ্বাসঘাতক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। কাউন্সিল অফ এডুকেশনের অনুমতিক্রমে প্রবন্ধগুলি বিচারের জন্য চার সদস্যের একটি কমিটি তৈরি করা হয়, যার প্রেসিডেন্ট হবার জন্য বাংলার প্রথম লেফটেন্যান্ট গভর্নর ফ্রেডরিক হ্যালিডে সম্মতি দিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত সেরা প্রবন্ধ হিসেবে নির্বাচিত হয় বোম্বাইয়ের পারসি বেনেভোলেন্ট ইন্সটিটিউশনের আরবি এবং ফারসির শিক্ষক সৈয়দ আব্দুল ফতেহ্‌র লেখা প্রবন্ধটি।

১৮৬৩ সালের এপ্রিল মাসে প্রতিষ্ঠিত হওয়া মহামেডান লিটেরারি সোসাইটি আব্দুল লতিফের উৎসাহ ও প্রচেষ্টার আরেকটি ফসল, যা মুসলমান সম্প্রদায়ের উল্লেখযোগ্য উপকার সাধন করেছিল। তাঁর নিজ বাসগৃহে বহু বছর চলা আলোচনাসভাগুলির মতো এই লিটেরারি সোসাইটিরও লক্ষ্য ছিল, এর সদস্যদের সংস্কার এবং ভেদভাব দূর করে সাম্প্রতিক রাজনীতি, আধুনিক চিন্তা ও শিক্ষায় উৎসাহিত করা। এই প্রথম বার মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ এক মঞ্চে জমায়েত হয়ে নিজ মতামত এবং আকাঙ্ক্ষা খোলামনে সমবেদী শ্রোতাদের সামনে ব্যক্ত করার সুযোগ পায়। বিপুল সংখ্যা এবং রাজনৈতিক গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও, মুসলমান সম্প্রদায়ের এর আগে পর্যন্ত সেরকম কোনো স্বর ছিল না, যার সাথে সরকার আলোচনা চালাতে পারে অথবা যা সরকারকে পরামর্শ দিতে পারে। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সবচেয়ে শিক্ষিত মানুষদের এই নিয়মিত জমায়েত দ্রুত ফলপ্রসূ হয়। এটি একদিকে যেমন মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষদের চিন্তা এবং ভাবনাকে সঠিক দিকনির্দেশ করে, তেমনি সার্বজনিক বিষয়গুলিতে তাদের আগ্রহ বাড়ায়। এই লিটেরারি সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা আব্দুল লতিফ সদস্যদের বাৎসরিক যে-আলোচনাচক্রের সূচনা করেন, তা ছিল মুসলমানদের মধ্যে সামাজিক জমায়েতের প্রথম নিদর্শন, যার দ্বারা সমস্ত শ্রেণির মুসলমান মানুষ প্রভাবিত হয়। দ্বিতীয় বৎসরে টাউন হলে অনুষ্ঠিত হওয়া এই আলোচনাচক্রে তৎকালীন লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার সিসিল বিডন আব্দুল লতিফের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। তাঁর বক্তব্যের শেষ অংশে তিনি আব্দুল লতিফকে সরাসরি উদ্দেশ্য করে বলেন, "মহামেডান লিটেরারি সোসাইটি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আপনি বাংলা দেশ তথা ভারতবর্ষের মুসলমানদের নিজেদের সংকীর্ণ গণ্ডি ছেড়ে ইংরেজি ভাষাতে জ্ঞান ও চিন্তার যে বিপুল সম্পদ রয়েছে, তা সন্ধানের পথ দেখিয়েছেন। বিভিন্ন সময়ে আপনি সক্রিয় এবং যুক্তিসংগত বক্তব্যের দ্বারা প্রশাসনের লক্ষ্য এবং নীতি সম্পর্কে তাদের মধ্যে সঠিক ধারণা তৈরি করেছেন এবং তারা নিজেদের বক্তব্য স্বাধীনভাবে পেশ করতে পেরেছে। এইভাবে এই সম্প্রদায় এবং তাদের শাসকদের মধ্যে বোঝাপড়া সৃষ্টিতে আপনি সাহায্য করেছেন। সম্পর্কের এই পরিবর্তন ও উন্নতি আপনার নিজ উদাহরণ, আপনার সক্রিয় বদান্যতা এবং আপনার বিচক্ষণ প্রভাবেরই ফল। আমি আপনাকে আপনার দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা এবং সরকারের বিনীত স্বীকৃতির যোগ্য হিসেবে গণ্য করি।" তৎকালীন ভাইসরয় স্যার জন লরেন্স সেই একই অনুষ্ঠানে আব্দুল লতিফের সুচারু কর্মপ্রচেষ্টার স্বীকৃতি হিসেবে সানন্দচিত্তে একটি অভিজ্ঞান দেবার কথা বলেন। অভিজ্ঞানটি ছিল 'এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা'র একটি সম্পূর্ণ সেট, যার ওপরে ভাইসরয় নিজের হাতে লিখেছিলেন: "মৌলভি আব্দুল লতিফকে দেশে, বিশেষত মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারে অবদানের জন্য এই অভিজ্ঞান প্রদত্ত হল— ২৫ মার্চ, ১৮৬৭। গভর্নর জেনারেল।"

১৮৫৬ সালে তিনি ইঙ্গ-ফারসি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে মাদ্রাসাকে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু সে-চেষ্টা ফলপ্রসূ না হবার পর, তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রতিষ্ঠার কাজে সাগ্রহে এগিয়ে আসেন। ১৮৭৩ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি লর্ড নর্থব্রুক দ্বারা কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের অনুষ্ঠানে আব্দুল লতিফ নিজের বক্তৃতায় বলেন যে, প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রতিষ্ঠা হবার পূর্বেও হিন্দু

তিন বছর আব্দুল লতিফ আলিপুরে থেকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাজ শিখলেন এবং এই পর্বের পর তাঁকে প্রথম শ্রেণির ক্ষমতা দেওয়া হয় এবং তিনি জাস্টিস অফ পিসের দায়িত্ব পান।

সম্প্রদায়ের ইংরেজি উচ্চশিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠান ছিল, কলকাতার খ্রিস্টানদের ইংরেজি উচ্চশিক্ষার জন্যেও কলেজ রয়েছে, কিন্তু মুসলমানদের জন্য সেরকম কিছু নেই। সেই অভাব মেটাবার জন্যে সরকার প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছে, যার লক্ষ্য হওয়া উচিত, জাতি ও শ্রেণি নির্বিশেষে ইংরেজি শিক্ষা প্রদান করা। তিনি মহসিন ফান্ডের পরিচালনার দিকে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে মুসলমান সম্প্রদায়ের আরেকটি উপকার করেছিলেন। তিনি দেখিয়েছিলেন যে, মুসলমান সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তির দ্বারা সেই সম্প্রদায়ের উন্নতিকল্পে প্রতিষ্ঠিত ফান্ড দ্বারা মুসলমানেরা সেভাবে উপকৃত হচ্ছিল না, যেভাবে তার সুবিধা ভোগ করছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষজন। ব্রিটিশ সরকার লতিফের দাবির যৌক্তিকতা অনুধাবন করে ফান্ডের পরিচালন ব্যবস্থাতে পরিবর্তন আনেন। ফান্ডের বড়ো একটি অংশ সরিয়ে রেখে, সেখান থেকে সারা বাংলার মুসলমান ছাত্রদের বিদ্যালয়ের পঠনপাঠন ফি-র দুই তৃতীয়াংশ দেওয়া হয় এবং এর ফলে সম্প্রদায়ের মানুষ খুবই উপকৃত হয়।

১৮৬৩ সালের শীতকালে আলিপুরে অনুষ্ঠিত হয় সারা ভারতবর্ষের প্রথম কৃষি-প্রদর্শনী। আজকের দিনে যখন এই ধরনের প্রদর্শনী ভারতবর্ষে নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয় এবং এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সবাই কমবেশি ওয়াকিবহাল, তখন সেই প্রথম প্রদর্শনীকে ঘিরে তৈরি হওয়া উত্তেজনা আমাদের বিস্মিত করে। সরকার এই প্রদর্শনী আয়োজনের পরিকল্পনা ঘোষণা করা মাত্র অশিক্ষিত সাধারণ জনগণের মধ্যে নিরর্থক এবং ভিত্তিহীন গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল। নবাব আব্দুল লতিফ, যিনি এই প্রদর্শনীর পরিচালন সমিতির একজন সদস্য ছিলেন, দ্রুত এইসব গুজব নিরসনের ব্যবস্থা করলেন। তিনি এই প্রসঙ্গে বাংলা এবং হিন্দুস্থানিতে একটি প্রবন্ধ লেখেন এবং সরকারি অনুমোদনে সেটি প্রকাশ করেন। তাতে তিনি উল্লেখ করেন যে, সরকারি এই প্রচেষ্টার লক্ষ্য দেশের সম্পদ এবং উৎপাদনক্ষমতার পরিসংখ্যান নিয়ে নতুন কর চাপানো নয়। সরকার জনগণের পরিস্থিতির উন্নতি করতে আগ্রহী এবং নতুনতর আধুনিক প্রযুক্তির সাথে পরিচয় ঘটানোর উদ্দেশ্যেই এই প্রদর্শনী। আব্দুল লতিফের এই বহুল প্রচারিত প্রবন্ধ ছিল বলিষ্ঠ এবং যুক্তিনিষ্ঠ, যা জনসাধারণের মনে আত্মবিশ্বাসের সঞ্চার করে এই কৃষি-প্রদর্শনীকে সফল করে তোলে। দুই বছর পরে, ১৮৬৫-১৮৬৬ সালের প্রথম সেনসাস বা জনগণনার সময়ও একইরকম অযৌক্তিক সন্দেহ এবং উত্তেজনা নিম্নবর্গীয় মানুষদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। কমপক্ষে একশো আটানব্বইটি পরিবার জনগণনা এড়াবার জন্য বাসস্থান ত্যাগ করে। তারা এই প্রক্রিয়াটিকে নিজেদের পারিবারিক জীবনের গোপনীয়তার ওপর হস্তক্ষেপ এবং নতুন কর লাগু করার চেষ্টা বলে মনে করে। আব্দুল লতিফ ছিলেন জনগণনা পরিচালনার জন্য তৈরি হওয়া বিশেষ কমিটি অফ জাস্টিসের সদস্য। কৃষি-প্রদর্শনীর মতো এ-বারও তাঁর লেখা একটি প্রবন্ধ মুসলিম লিটেরারি সোসাইটির সামনে পাঠ করা হয়। বাংলাতে অনুবাদ করে সেটিকে নিজের অর্থ ব্যয়ে তিনি জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেন। প্রবন্ধটি সরকারি এই প্রচেষ্টা সম্পর্কে একটি সদর্থক এবং বাস্তবসম্মত দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার করে। এই একই সময়ে ভারত সরকারের লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে খ্রিস্ট ধর্মান্তরিতদের পুনর্বিবাহকে আইনি বৈধতা দেবার জন্য একটি বিল আনা হয়। মুসলমান

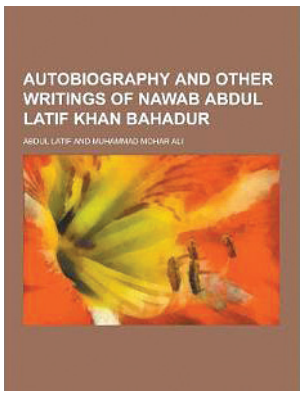

সম্প্রদায়ের মধ্যে এই নিয়ে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়, কারণ, বিলটির কয়েকটি ধারা মুসলমান আইনের পরিপন্থী ছিল। যেসব পরিবর্তনের প্রস্তাব এই বিলে ছিল, সেগুলির গুরুত্ব অতিরঞ্জিত হয়ে নিম্নবর্গীয় মানুষদের মধ্যে প্রচারিত হবার ফলে, তারা এটিকে ধর্ম এবং নারীসম্মানের প্রতি আক্রমণ বলে মনে করেছিল। এই ভ্রান্ত ধারণাগুলি প্রতিরোধের জন্য মৌলভি আব্দুল লতিফ নিজের বাসস্থানে মুসলমান সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নিয়ে একটি সভার আয়োজন করেন। সেখানে বিনীতভাবে বিলটি নিয়ে মুসলমান সমাজের আপত্তির কথা উল্লেখ করে একটি স্মারকলিপি রচনা করে লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে পাঠানো হয়। এর ফলে মুসলমান সম্প্রদায়কে এই বিলের আওতায় রাখা হয়নি, যা অতি শীঘ্রই আইনে পরিণত হয়।

১৮৭১ সালে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হওয়া বিখ্যাত দিল্লি দরবার (ইম্পিরিয়াল অ্যাসেম্বলি) এবং মহারানির ঘোষণাপত্রের সাথে আব্দুল লতিফের জন্য আসে প্রথম সরকারি খেতাব। পরের বছর আগস্ট মাসে 'খান বাহাদুর' খেতাব তাঁকে নিজের হাতে দিয়েছিলেন লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার অ্যাশলে ইডেন। পুরস্কার প্রদানের সময় তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে, পুরস্কারপ্রাপক তাঁর সহধর্মীয়দের উন্নতিকল্পে বিপুল অবদান রেখেছেন এবং মূলত তাঁর জন্যেই তারা আজ ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করে দেশের অন্যান্য সম্প্রদায়ের তরুণদের সাথে প্রতিযোগিতার যোগ্য হয়ে উঠছে। পরের বছর ইংল্যান্ডের হাউস অফ কমন্সের একটি কমিটি গড়া হয়েছিল, যার লক্ষ্য ছিল, ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অবস্থার পর্যালোচনা করা। এর জন্য ভাইসরয়কে বলা হয়েছিল ভারতীয় প্রতিনিধি নির্বাচিত করে ইংল্যান্ডে পাঠাতে, যারা সেই কমিটির সামনে তথ্যপ্রমাণাদি দেবে। আব্দুল লতিফ লর্ড নর্থব্রুকের দ্বারা মুসলমান সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হবার সম্মান লাভ করেন। তাঁর স্বদেশীয় মানুষদের প্রয়োজনের কথা ইংল্যান্ডে উপস্থাপিত করার এই সুযোগ আব্দুল লতিফ সাদরে গ্রহণ করেন এবং বিদেশযাত্রার জন্যে প্রস্তুতি শুরু করেন। কিন্তু পার্লামেন্ট ভেঙে যাবার দরুন এই পরিকল্পনা বাতিল হয়। সাত বছর পর আব্দুল লতিফ সরকারি কর্মের সংকীর্ণ বৃত্তের বাইরে নিজের কর্মোপযোগিতা কাজে লাগানোর আরেকটি সুযোগ পেলেন। ১৮৮৫ সালের ডিসেম্বর মাসে অতি সামান্য সময়ের প্রস্তুতিতে তাঁকে ভূপালের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নিতে বলা হয়। এই পদ ছিল অস্থায়ী এবং এক বিশেষ পরিস্থিতির ফলে ভারতবর্ষের সরকার এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। আব্দুল লতিফ এই পদ ছাড়ার পর ১৮৮৬ সালের ৫ জুন স্যার লেপেল গ্রিফিন, মধ্য-ভারতের তদানীন্তন গভর্নর জেনারেলের এজেন্ট, তাঁকে যে-চিঠি লিখেছিলেন, তা ওই পদে থাকাকালীন আব্দুল লতিফের কর্মকুশলতার সাক্ষ্য বহন করে। গ্রিফিন লিখেছিলেন, "ভারত সরকারের নির্দেশ অনুসারে আমি অত্যন্ত আনন্দিত চিত্তে ২৮ মে বিদেশ সচিবের লেখা চিঠি থেকে কিছু মন্তব্য আপনাকে জানাচ্ছি: 'আব্দুল লতিফ অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে ভূপালে যে-দায়িত্ব পালন করেছেন, তার জন্য তাঁর প্রতি ভারত সরকারের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার জন্য আপনাকে অনুরোধ করা হচ্ছে। মহামান্য ভাইসরয় তাঁর স্থানে একজন ইংরেজ মন্ত্রী নিযুক্ত করাতে সায় দিয়েছেন, কিন্তু এর সাথে নবাব লতিফের কর্মদক্ষতার কোনো বিরোধ নেই। মহামান্য ভাইসরয় তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করেছেন কর্মদক্ষতা ও দৃঢ়তা। নবাব আব্দুল লতিফ যখন ভূপাল ছাড়বেন, তাঁর খ্যাতি ও সুনাম কোনোভাবেই হ্রাস পাবে না। উপরন্তু বিগত কয়েক মাসের ঘটনার প্রেক্ষিতে তা বৃদ্ধিই পাবে।' " মহামান্য ভাইসরয় এবং ভারত সরকারের এইসব প্রশংসাসূচক বাক্যের সাথে স্যার লেপেল যোগ করেছিলেন নিজের অনুভব: "আপনার কর্মের প্রশংসায় আমি যোগ করতে চাই আমার ব্যক্তিগত সাক্ষ্য। ১৮৮৫ সালের ডিসেম্বর মাসে আমার অনুরোধে মাত্র এক দিনের মধ্যে আপনি ভূপাল রওনা হন, কঠিন পরিস্থিতিতে অস্থায়ী এক পদের দায়িত্ব নিতে, যতদিন না ভূপালের মহামান্যা রানির ইচ্ছানুসারে ইংল্যান্ড থেকে কোনো ইংরেজ অফিসার মন্ত্রী হিসেবে সেই পদে যোগ দেন। আপনার অস্থায়ী দায়িত্ব মহারানির সম্পূর্ণ সম্মতিক্রমেই প্রদত্ত হয়। সেই ক্ষণ থেকে আজ পর্যন্ত ভূপালে আপনার দায়িত্ব দক্ষতা সততা এবং বিচক্ষণতার সাথে পালন করে আপনি আমার সন্তুষ্টি বিধান করেছেন। আমি ঐকান্তিকভাবে আপনাকে এই পদে দেখতে চাই, কারণ, আমি সর্বদা বিশ্বাস করি যে, ভূপালের মতো মুসলমান রাজ্যে মুসলমান মন্ত্রীই যোগ্য। মহামান্য ভাইসরয় এবং ভারত সরকারেরও একই অভিমত। দৃঢ় চরিত্রের এবং প্রশাসনিক কর্মে দক্ষ একজন ইংরেজ মন্ত্রী নিঃসন্দেহে ভূপাল রাজ্যকে নানাভাবে উপকৃত করবেন। কিন্তু ন্যায়ের খাতিরে সরকারিভাবে স্বীকার করা প্রয়োজন যে, ভূপালে আপনার কাজে ভারত সরকার একান্ত সন্তুষ্ট এবং একজন ইংরেজ মন্ত্রীকে মহামান্য ভাইসরয় নির্বাচিত এবং নিযুক্ত করেছেন কেবলমাত্র মহামান্য

বেগমের উপর্যুপরি অনুরোধের কারণে। ইংরেজ প্রশাসনের নীতি অনুযায়ী তারা দেশীয় রাজ্যের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে, অত্যন্ত জরুরি কারণ ছাড়া হস্তক্ষেপ করে না। কেবলমাত্র মহারানির ইচ্ছার প্রতি শ্রদ্ধা এবং সম্মান জ্ঞাপনের জন্য মহামান্য ভাইসরয় মন্ত্রীর পদে একজন উপযুক্ত ইংরেজকে নির্বাচিত করেছেন। ভারত সরকার আপনাকে নিশ্চিতভাবে জানায় যে, ভূপালে বিগত কয়েক মাসে আপনার কাজ আপনার সুনাম হ্রাস করবে না, তা বৃদ্ধিই পাবে। এই আশ্বাসের সাথে আমি কেবলমাত্র যোগ করি, আপনার উন্নতির জন্য আমার শুভেচ্ছা এবং সেইসমস্ত অফিসার, যাঁরা মধ্য-ভারত সম্পর্কে আপনার জ্ঞান দ্বারা উপকৃত হয়েছিলেন, তাঁদের উষ্ণ বন্ধুতা।"

এরপর আব্দুল লতিফ এত বছরের সরকারি কর্মের বাঁধন থেকে মুক্তি পেয়ে মনোযোগ দিলেন তাঁর প্রিয় বিষয়গুলিতে। তাঁর ছত্তিরিশ বছরের কর্মজীবনে তিনি অসুস্থতার কারণে মাত্র চার মাস ছুটি নিয়েছিলেন। ব্রিটিশ সরকারের অধীনস্থ কর্মচারীদের মধ্যে খুব অল্প কয়েক জনই এরকম নিষ্ঠা দেখিয়েছেন। সরকারি চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর, তাঁকে সেই সময়ের প্রেক্ষিতে খুবই উচ্চ হারে মাসিক ছ-শো টাকা পেনশন দেওয়া হয়। এর দুই বছর আগে তাঁকে 'কম্প্যানিয়ন অফ দ্য মোস্ট এমিনেন্ট অর্ডার অফ দ্য ইন্ডিয়ান এম্পায়রে' ভূষিত করা হয়। ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ যে-বছর ব্রিটেনের মহারানির রাজত্বের সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়, সেই বছর আব্দুল লতিফকে 'নবাব বাহাদুর' খেতাব দেওয়া হয়। মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষদের যেসব সম্মান ব্রিটিশ সরকারের তরফ থেকে দেওয়া হত, এটি ছিল তার মধ্যে সর্বোচ্চ। এই সম্মান ভারত সরকার তথা জাতি-ধর্ম ব্যতিরেকে দেশবাসীর প্রতি করা তাঁর কর্তব্যের যোগ্য পুরস্কার হিসেবে মনে করা হয়। আরও ছয় বছর তিনি অক্লান্তভাবে নিজের কর্ম সম্পাদন করে চলেন। নিজের সহধর্মীয়দের মঙ্গলসাধনে তাঁর উৎসাহে কখনওই ভাটা পড়েনি। তিনি এই পর্বে নিজের জীবনভর কর্মের সাফল্যচিহ্নও দেখতে পেয়েছিলেন। সবার শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসার পাত্র হিসেবে তিনি তাঁর জীবনের শেষের বছরগুলি সুখে কাটিয়ে ছিলেন এবং তাঁর বিস্ময়কর জীবনীশক্তি প্রায় শেষ পর্যন্ত তাঁর সঙ্গী ছিল। ১৮৯৩ সালের ১৮ জুলাই তিনি পঁয়ষট্টি বছর বয়সে কলকাতাতে মারা যান। তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে অনেক শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদিত হয়। ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত সংবাদপত্রে তাঁর মহৎ কর্মজীবনের বিবরণ প্রকাশিত হয় এবং এ-ক্ষেত্রে ইংরেজি সংবাদপত্রগুলিও পিছিয়ে ছিল না। ১৮৯৩ সালের ৪ সেপ্টেম্বর 'দ্য টাইমস' পত্রিকাতে আব্দুল লতিফের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনস্মৃতি প্রকাশিত হয়। আব্দুল লতিফের গৌরবময় কর্মজীবন ব্রিটিশ জনসাধারণকে কতটা প্রভাবিত করেছিল, তার প্রমাণ এই লেখাটি। এই শ্রদ্ধার্ঘ্যটি এই উপলক্ষ্যে প্রকাশিত আরও অনেক লেখার ধাঁচটি বুঝতে সাহায্য করে। "যে দক্ষতা, দৃঢ় সংকল্প, অক্লান্ত কৌশল ও ধৈর্যের সাথে তিনি চল্লিশটি বৈচিত্র্যপূর্ণ বছর নিজের বেছে নেওয়া দায়িত্ব পালন করেছেন, তা জীবনীকারের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় বিষয়বস্তু হতে পারে। আমরা এখানে কেবলমাত্র যাঁরা ভারতবর্ষের ভালো করার চেষ্টা করে চলেছেন, তাঁদের বিপুল ক্ষতির কথা স্মরণ করে পরিতাপ করতে পারি। স্বভাবগতভাবেই তিনি নিজের ব্যক্তিগত উদ্যোগে নয়, ধীরে ধীরে সমবেত প্রচেষ্টার মাধ্যমে উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করতেন। তিনি রেখে গেলেন একদল দক্ষ অনুগামী, যাঁরা তাঁর কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে কৃতসংকল্প। ঠিক তিরিশ বছর আগে 'মহামেডান লিটেরারি সোসাইটি'— এই বিনম্র নাম দিয়ে যে-সমিতি তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তা একটি উল্লেখযোগ্য শক্তিতে পরিণত হয়েছে এবং উত্তর ভারত জুড়ে আরও অনেকগুলি শাখা-সমিতির জন্ম দিয়েছে। এটি বললে অত্যুক্তি হয় না যে, বাংলা দেশের সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায় এখন তার সেইসমস্ত মত গ্রহণ করেছে, যা নিয়ে তাদের নেতৃবর্গ চল্লিশ বছর আগে এই তরুণ সংস্কারকের সাথে আলোচনাও করতে চায়নি। এটিই তাঁর সর্বোত্তম সমাধিলিপি। ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর কোমল ব্যবহার, আন্তরিক এবং কিছুটা প্রাচ্যদেশীয় সৌজন্য, পঁয়ষট্টি বছরের ঘটনাবহুল জীবনে আহরণ করা অভিজ্ঞতা এবং গল্পগাছা তাঁকে বন্ধুদের কাছে প্রিয় করেছিল। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে পদ এবং খেতাব দ্বারা তাঁর প্রাপ্য দিয়েছে। কিন্তু একজন মুসলমান তাঁর দেশবাসীকে যে নতুন দিশা দেখিয়েছেন,

১৮৭১ সালে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হওয়া বিখ্যাত দিল্লি দরবার (ইম্পিরিয়াল অ্যাসেম্বলি) এবং মহারানির ঘোষণাপত্রের সাথে আব্দুল লতিফের জন্য আসে প্রথম সরকারি খেতাব। পরের বছর আগস্ট মাসে 'খান বাহাদুর' খেতাব তাঁকে নিজের হাতে দিয়েছিলেন লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার অ্যাশলে ইডেন।

সেই হিসেবে আব্দুল লতিফ ভারতের ইতিহাসে নিজের জায়গা করে নিয়েছেন।"

স্যার রিচার্ড টেম্পল তাঁর সম্পর্কে যথার্থই বলেছেন, "বাংলা দেশের মুসলমানদের মধ্যে সবচেয়ে প্রগতিশীল এবং আলোকপ্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব।" একজন আত্মকৃত মানুষ, যিনি জীবনের শুরুতে নিজের জন্ম তথা বংশপরিচয়ের কোনো সুবিধা পাননি, তিনি পরবর্তীকালে সরকারের অন্যতম বিশ্বাসভাজন পরামর্শদাতা এবং দেশের প্রধানতম ব্যক্তির বন্ধু হিসেবে উন্নীত হন। একদিকে তাঁর মধুর ব্যবহার এবং সহজাত সৌজন্য তাঁকে যেমন যেকোনো সমাজে আদৃত করে তুলত, তেমনি বিবিধ বিষয় ও মানবপ্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞান এবং বাক্‌মাধুর্য তাঁকে সবার আনন্দদায়ক ও আকর্ষণীয় বন্ধু করে তুলেছিল। সর্বোপরি তাঁর ছিল মানুষের জন্য অপরিসীম সহানুভূতি এবং সবরকমভাবে তাদের সুখ ও উন্নতিবিধানের তীব্র ইচ্ছা। তাঁর নিজের সম্প্রদায়ের প্রকৃত উন্নতির দিশা তিনি সহজেই চিহ্নিত করতে পারতেন এবং তীব্র বিরোধিতার মুখেও দ্রুত নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে সেই পথ নির্দেশ করতেন। তাঁর চরিত্রে প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের সর্বোত্তম বৈশিষ্ট্যগুলির মিলন পরিলক্ষিত হয়। তাঁর মধ্যে ছিল অ্যাংলো-স্যাক্সনদের কর্মশক্তি, যা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল প্রাচ্যদেশীয় সতর্কতা এবং কৌশল দ্বারা। ছিল পাশ্চাত্যের দ্ব্যর্থহীন দুর্দমনীয়তা এবং তার সাথে যুক্ত হয়েছিল পূর্বের ধৈর্য। তিনি যখন কোনো পন্থা গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিতেন, সাফল্য না আসা পর্যন্ত ভালো মন্দ সবরকম পরিস্থিতিতে স্থির প্রত্যয়ে সে-পথে চলতেন। তাঁর সম্বন্ধে যথার্থই কথিত ছিল যে, তিনি ছিলেন কলকাতার ভারতীয় সমাজের কেন্দ্র ও প্রাণস্বরূপ, কারণ, তিনি ইউরোপীয় মুসলমান এবং হিন্দু সবারই সমান বন্ধুতা অর্জন করেছিলেন এবং তাঁর সহৃদয়তা ও সহানুভূতির প্রভাবে সবাই পারস্পরিক ভেদভাব এবং ঈর্ষা ত্যাগ করেছিল। তাঁর সমাধিলিপিতে অনায়াসেই লেখা যায়: "এই ব্যক্তির কোনো মিত্র কখনও তাঁকে ত্যাগ করেননি এবং এঁর কখনওই কোনো শত্রু তৈরি হয়নি।" আব্দুল লতিফের প্রতি মুসলমান সম্প্রদায়ের যে-ঋণ তা কখনওই বিস্মৃত হবার নয়। তিনি এই সম্প্রদায়কে পেয়েছিলেন অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারে নিমজ্জিত অনগ্রসর এবং নিস্পৃহ এক গোষ্ঠী হিসেবে, যাদেরকে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষেরা জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে ছাড়িয়ে চলে গেলেও, তারা নির্বিকারভাবে তাদের প্রাচীন ধারণা ও নীতিসমূহকে আঁকড়ে ধরে পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করত। নবাব আব্দুল লতিফের চেষ্টায় তারা জাগরিত হয়ে পায়ের তলায় মাটি উদ্ধারে আগ্রহী হল এবং সমস্ত প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়ে সেইসব শস্ত্র হাতে তুলে নিল, যা তারা চিরকাল অবজ্ঞা করে এসেছে। মুসলমান সম্প্রদায় অগ্রগতির যে-পথে আজ বহুদূর হেঁটে এসেছে, তার প্রথম পথপ্রদর্শকদের মধ্যে অন্যতম হিসেবে নবাব আব্দুল লতিফ স্মরণীয়। ■

শুধু ধ্বনি কিংবা প্রতিধ্বনি নয়, ভাষার উৎস আরও বহুতর। দেহের বিভঙ্গে, রঙের বিন্যাসে, আলোর বিচ্ছুরণে ভাষা হয়ে ওঠে বর্ণময়, ব্যঞ্জনাগর্ভ। সেসব কেমন? মনুষ্যেতর প্রাণীদের ভাষা নিয়ে একটি বৃশ গ্রন্থের নির্বাচিত অংশ। লিখেছেন

ইউরি দ্‌মিত্রিয়েভ

রং আলো আর লেজের ভাষা

ঘ্রাণের ভাষা। নাচের ভাষা। ধ্বনির ভাষা। চলনের ভাষা। এগুলিও পশুপাখিদের মেলামেশার, সংকেতপ্রদানের সমস্ত উপায় নয়, তাদের কথাবার্তা চালানোর সব ভাষা এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়।

পশুপাখিরা রঙের তফাত ধরতে পারে। এক সময় একটা কৌতূহলজনক পরীক্ষা করা হয়— মশারা রঙের তফাত ধরতে পারে কি না, এই নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে বিতর্ক দেখা দেয়। এটা যাচাই করে দেখার জন্য একটা ঘনক্ষেত্র নিয়ে, তাকে নানা রঙে রাঙানো হল। তারপর ঘনক্ষেত্রটিকে

সোনাব্যাং।

মশকসংকুল স্থানে রেখে পর্যবেক্ষণ করা হতে লাগল। এতে দেখা গেল যে, একটা রঙের ওপর খুব বেশি সংখ্যক মশা এসে বসেছে, অন্য রঙের ওপর অপেক্ষাকৃত কম, আরেকটির ওপর আরও কম, আর কোনো একটা রঙের ওপর মশারা একেবারেই বসেনি। তার মানে, এই নয় যে, যেকোনো জায়গায় বসলেই তাদের চলে! লোকে এ থেকে এক বাস্তব সিদ্ধান্তে এল: যারা মশকসংকুল স্থানে কাজ করে, তাদের পোশাক মশাদের অপ্রীতিকর রঙে রাঙাতে লাগল।

এদিকে মশারা কিন্তু অমনি অমনি, নিছক সৌন্দর্যের খাতিরে রঙের পার্থক্য করে না। তাদের কাছে রঙের ব্যাবহারিক তাৎপর্য আছে। তা না হলে তাদের অনেকেই খাদ্যই খুঁজে বার করতে পারত না। কিন্তু, দেখা গেছে, রং তাদের পরস্পরের মধ্যে কথাবার্তা চালাতে এবং বন্ধু ও শত্রুকে জানতেও সাহায্য করে।

রং যোগাযোগের অতি সাধারণ উপায় হিসেবেও কাজ করে। "আমাকে ছুঁয়ো না, আমি বিচ্ছিরি"— গুবরে পোকার গোটা চেহারা যেন এই কথাই বলছে, তার লাল পিঠ ভালোমতো দৃষ্টিগোচর হয় এবং সহজেই মনে রাখা যায়। ওই পিঠ দেখিয়ে সে নিশ্চিন্তভাবে ডালের ওপর ঘুরঘুর করে বেড়ায়।

সোনাব্যাংও এই পন্থা অবলম্বন করে। তারা নিজেদের জ্বলজ্বলে চাকা চাকা দাগওয়ালা পেট আর গলা দেখিয়ে যেন বলতে চায় যে, তাদের ছোঁয়া ঠিক হবে না। শত্রুদের ভয় দেখানোর এরকম অনেক উপায় আছে। কিন্তু

খঞ্জন।

ছোপ ও রঙের সাহায্যে নিজেদের মধ্যে কথা বলার বেশ কিছু উপায়ও আছে।

বহু পাখির রঙিন ছোপ তাদের শনাক্তকরণের চিহ্ন হিসেবেও কাজ করে: যেমন হাঁসের ডানায় আরশির মতো চকচকে পালক। এর সাহায্যে তারা অন্য জাতের হাঁস থেকে নিজের জাতের হাঁসদের পার্থক্য নির্ণয় করে, জ্বলজ্বলে পালকের উদ্দাম দেখে স্ত্রী-হাঁসেরা পুরুষ-হাঁসদের চিনতে পারে। কিন্তু সবচেয়ে কৌতূহলজনক ব্যাপার হল রঙিন ছোপের সাহায্যে কথোপকথন।

খঞ্জন পাখির লেজের দুই প্রান্তবর্তী পালকের শেষভাগ সাদা। কিন্তু তা সবসময় চোখে নাও পড়তে পারে, চোখে পড়ে একমাত্র তখনই, যখন পাখি কিছু একটা বলতে চায়। এই উদ্দেশ্যে সে হাতপাখার মতো করে লেজ ছড়িয়ে দেয়, তার ফলে ছোপ স্পষ্ট দেখা যায়।

খঞ্জন পাখি নিশ্চিন্তে উপকূল ধরে চলেছে লেজ নাচাতে নাচাতে। হঠাৎ লেজ পরিণত হল হাতপাখায়, দেখতে দেখতে এই খঞ্জনটির কাছে এসে জুটল আরও একটি খঞ্জন।

কালোশিরা পাখিদের লেজে এ-ধরনের ছোপ আছে। পাখি খাবারের খোঁজ পেল কি না পেল অমনি লেজের ছোপের সাহায্যে পাঠিয়ে দিল সংকেত: "এখানে, আমার কাছে এসো, এখানে খাবার আছে!"

শীতকালে বনে কিংবা বাগানে যদি কখনও বুকের কাছে লাল রংওয়ালা সুন্দর বুলফিঞ্চ পাখি আর তাদের ছাইরঙা সঙ্গিনীদের দেখতে পাও, তাহলে লক্ষ করে দেখো। পাখিদের অসাধারণ কথাবার্তার পরিচয় পাবে।

বুলফিঞ্চরা যতক্ষণ নিশ্চিন্তে বসে আছে ততক্ষণ কথোপকথনের তেমন একটা আবশ্যক নেই। কিংবা তারা তাদের জিউ-জিউ ডাক বিনিময় করে বাক্যালাপ করতে পারে। কিন্তু পাখিদের ঝাঁক হয়তো ঠিক করল যে স্থানান্তরে উড়ে যাবে। তৎক্ষণাৎ পাঠানো হল সংকেত: "অবগতির জন্য বলছি, ওড়ার জন্য তৈরি হও!" এই সংকেত হল পাখিদের কটিদেশের সাদা ছোপ। যতক্ষণ তারা বসে থাকে ততক্ষণ ছোপ দেখা যায় না, ডানায় ঢাকা থাকে। কিন্তু ওড়ার আগে পাখিরা ডানা নামিয়ে দেয়, তাতে ছোপগুলি দৃষ্টিগোচর হয়, এমনকী দূর থেকেও তাদের বেশ লক্ষ করা যায়। যাতে সকলেই সেগুলি দেখতে পায়, সেই উদ্দেশ্যে বুলফিঞ্চরা বার কয়েক বিভিন্ন দিকে ঘোরে। ওড়ার সময় যারা পিছিয়ে পড়ে, তাদের কাছে এই ছোপগুলি দিব্যি দিকনির্দেশের কাজ করে।

> **ঘ্রাণের ভাষা। নাচের ভাষা। ধ্বনির ভাষা। চলনের ভাষা। এগুলিও পশুপাখিদের মেলামেশার, সংকেতপ্রদানের সমস্ত উপায় নয়, তাদের কথাবার্তা চালানোর সব ভাষা এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়।**

চিতেল হরিণদেরও সংকেত অনেকটা এই ধরনের। তাদের পশ্চাৎদেশে আছে বেশ বড়ো আয়তনের সাদা ছোপ, আরশির মতো ঝকঝকে। চিতেল হরিণ ঝোপের ভেতরে, গাছপালার মাঝখানে ভালোমতো লুকিয়ে পড়তে পারে— এটা তার আত্মরক্ষার উপায়। বিপদ দেখা দিলে সে পালায়। ঘন ঝোপঝাড়ের মধ্যে হরিণছানার পক্ষে তার মাকে ভালো করে নজরে আনা কঠিন, বিশেষত, মা যদি ইতিমধ্যে পালিয়ে কয়েক পা দূরে সরে যায়। হরিণছানা যাতে হারিয়ে না যায়, তার জন্য মা-হরিণের আরশি আছে। এই আরশি সবুজ গাছপালার মাঝখানে দিব্যি চোখে পড়ে, তা যেন হরিণছানাকে বলে: "আমি এখানে, ছুটে এখানে চলে আয়!" কিন্তু মা-হরিণ যদি সাদা লোমে ঢাকা তার ছোট্ট লেজটা নামিয়ে দেয়, তার অর্থ দাঁড়াবে: "দাঁড়া! এগোস না!"

বুলফিঞ্চ।

মরুভূমিতে ছোটো এক জাতের গিরগিটি বাস করে। মরুভূমির বহু বাসিন্দার মতো এই গিরগিটিও বালিরঙা। তবে সে এমনভাবে লুকিয়ে পড়তে পারে যে, তার জ্ঞাতিগোত্রদেরও সাধ্যি নেই তাকে খুঁজে বার করে। গিরগিটি যখন মনে করে যে, তাকে অন্যেরা দেখুক, তখন সে তার লেজ তোলে। লেজের তলার দিকটা ডোরাকাটা— ফ্রন্টিয়ার পোস্টের মতো হালকা আর গাঢ় রঙে ছোপানো। গিরগিটি তার লেজ উঁচায়, পোস্টটাও তখন দূর থেকে চোখে পড়ে। এর সাহায্যে সে যেন বলে: "আমি এখানে, চলে এসো!"

রেডস্টার্ট পাখিদের পুরুষবর্গ ছোপানো রঙের সাহায্যে অন্য বিষয়ে কথাবার্তা বলে: পুরুষ-রেডস্টার্ট স্ত্রী-রেডস্টার্টের আগে উড়ে এসে উপযুক্ত কোটরের ভেতরে বাসার খোঁজখবর করে। কিন্তু এখানেই একটা মুশকিল দেখা দেয়, বাসা আছে অথচ সঙ্গিনী নেই। সঙ্গিনীর সন্ধানে যদি বের হওয়া যায়, তাহলে অন্য পাখি এসে বাসা দখল করে নেবে। কিন্তু পুরুষ-রেডস্টার্ট এই পরিস্থিতি থেকে উদ্ধারলাভের উপায় বার করেছে: সে কোটর থেকে নিজের জ্বলজ্বলে বাদামি রঙের লেজটি বার করে দিয়ে হাতপাখার মতো ছড়িয়ে দেয়। লেজ দূর থেকে নজরে পড়ে, লেজটা জ্বলজ্বলে বেরিয়ে থাকে পতাকার মতো।

চিতেল হরিণ।

স্ত্রী-পাখিরা বেশ ভালোমতোই বুঝতে পারে এর অর্থ কী, তারা আর কালবিলম্ব করে না।

ছোপধরা রঙের ভাষা বহুবিচিত্র, পশুপাখিরা বলতে গেলে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে তা ব্যবহার করে থাকে। পশুপাখিরা আলোঝলমলে ছোপেরও আশ্রয় গ্রহণ করে, কথা বলে আগুনের সাহায্যে। সে-আগুন সত্যিকারের হওয়া সত্ত্বেও পুরোপুরি সত্যিকারের নয়।

আমাদের অঞ্চলে জোনাকি পোকারা বাস করে, এরা হল ধূসর-বাদামি রঙের খুদে পোকা। দিনের বেলায় তার কোনো লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে না। কিন্তু রাতের বেলায় সে হয়ে যায় উড়ন্ত একরত্তি বাতি। ঘাসের ভেতরে স্থির হয়ে বসে থাকে আরেক জাতের জোনাকিরা, তাদের বাতি আরও উজ্জ্বল। এই পতঙ্গারা কীটের মতো দেখতে, আসলে এরা মোটেই কীট নয়, এরাও উড়ন্ত পোকার মতোই পোকা। কেবল স্ত্রী-জাতের। তোমাদের সম্ভবত জানা আছে যে, কোনো কোনো কীটপতঙ্গের পুরুষ-সম্প্রদায়ের সঙ্গে স্ত্রী-সম্প্রদায়ের পার্থক্য বিরাট।

রেডস্টার্ট।

পুরুষ-জোনাকি উড়তে উড়তে আলোকসংকেত দেয়: "আমি তোমাকে খুঁজছি! তুমি কোথায়?" স্ত্রী-জোনাকি ঘাসের ভেতরে বসে থাকে, সে জবাব দেয়: "আমি এখানে!" পুরুষ-জোনাকি আলোর সংকেত দেখামাত্রই তার দিকে উড়ে যায়।

আমাদের দেশে এক জাতেরই জোনাকি আছে, তাই তাদের সংকেত ততটা ভাবব্যঞ্জক নয়। পোকামাকড়দের নিজেদের কথা বলার দরকার হয় না, তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হল পরস্পরকে দেখতে পাওয়া। কিন্তু গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বনভূমিগুলিতে, যেখানে বহুবিধ জাতের জোনাকি আছে, সেখানে আগুনের ভাষা বহুবিচিত্র। এ না হয়ে উপায় নেই: সকলের যদি একইভাবে আলো মিটমিট করে, তাহলে ওরা নিজেদের জাতিগোত্রকে চিনবে কী করে? তারা তাহলে যেকোনো আলোর ওপর উড়ে আসত, আর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হয়তো ভুল করে বসত। এই কারণে এখানে প্রতিটি জোনাকির আছে নিজস্ব দীপের ভাষা। যেহেতু বিভিন্ন জাতের জোনাকি অনেক, সেই হেতু ভাষাও অনেক। কারো কারো বাতি স্থিরভাবে জ্বলে, কারো-বা এই নেভে এই জ্বলে। কিন্তু এটাও সব না: কারো কারো আলো ঘন ঘন নেভে আর জ্বলে, কারো কারো কদাচিৎ, কারো কারো অনেকক্ষণ জ্বলে, কারো কারো অল্পক্ষণ, কেউ কেউ ওপরে ওড়ার সময় বাতি জ্বালায়, কেউ-বা নীচে নামার সময়। কোনো কোনো জোনাকি একা সংকেত দেয়, কেউ কেউ গোটা দল বেঁধে আলো জ্বালায় আর নেভায়। আবার তাদের বাতিও নানান আকারের, আছে গোল ও লম্বাটে, আছে তারের মতো দীর্ঘ। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় আমেরিকায় এক জাতের পতঙ্গ আছে, যাদের বুকের ওপর কিংবা পিঠের ওপর বড়ো বড়ো দুটো বাতি। বাতিগুলি হেডলাইটের মতো, তাই পতঙ্গদের নাম দেওয়া হয়েছে মোটরগাড়ি। এরা তাদের হেডলাইটের তেজ কম-বেশি করতে পারে। তাদের আরও একটা বাতি আছে লেজের কাছে। এটি মাটিতে নামার সময় ও আকাশে ওড়ার মুহূর্তে হালকা সবুজ কিংবা হালকা হলুদ আলো জ্বালে।

জোনাকি।

গ্রিনফিঞ্চ।

আবার এমন পতঙ্গও আছে, যাদের বাতি লাল আর সবুজ। এদের নাম ট্রাফিক লাইট পোকা। এই পোকাদের স্ত্রী-সম্প্রদায় বড়ো আকারের সাদা শুঁয়োপোকার মতো দেখতে, তাদের দু-পাশে আছে সবুজ বাতির সারি আর মাথার ওপর একটা লাল বাতি। এরা দরকার হলে একসঙ্গে সবগুলি কিংবা মাত্র একটি লাইটও জ্বালাতে পারে।

সমুদ্রের গভীরে আলোকসজ্জার বৈচিত্র্য আরও বেশি। সেখানে প্রায় চোখে না পড়ার মতো একরত্তি সামুদ্রিক জীব থেকে শুরু করে গভীর জলের বিশাল বিশাল মাছ পর্যন্ত, অনেকেই আলোর ভাষায় কথা বলে। কোনো কোনো মাছের শরীর আলোক বিচ্ছুরণ করে, কারো-বা মাথার ওপর উজ্জ্বল সার্চলাইট। এমন মাছ আছে, যারা উৎসবকালীন জাহাজের মতো আলোকমালায় সজ্জিত, আবার এমন মাছও আছে, যারা মুখ খুললেই মনে হয় তাদের ভেতরে অগ্নিশিখা লকলক করছে।

আলোজ্বলা মাছ।

অন্ধকারের মধ্যে পরস্পরকে চিনতে হলে, খুঁজে বার করতে হলে, কথা বলতে গেলে এটাও অবশ্যপ্রয়োজনীয়। ■

প্রতি বছর মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক-সহ নানা পরীক্ষা হয়। ফল বেরোলে সংবাদপত্রে নাম ওঠে কোনো কোনো ছাত্রছাত্রীর। গর্বিত হন বাবা-মা। গৌরব বাড়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেরও। কিন্তু, র‍্যাঙ্ক করা ছাত্রছাত্রীর সাফল্যের পেছনে কী রসায়ন কাজ করে? শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেরই-বা কী ভূমিকা? এই সংখ্যায় ২০১৪ সালের মেডিকেলে ৩২-তম স্থানাধিকারী

উমর আলি

নিরক্ষরতার অন্ধকার থেকে আল-আমীনের আলোয়

❑ ২০১৪ সালে রাজ্যে চৌষট্টি হাজার জয়েন্ট এন্ট্রান্স মেডিকেল পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৩২-তম স্থানাধিকারী এবং আল-আমীন মিশনের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থানাধিকারীর নাম উমর আলি, না ওমর আলি?

❍ উমর আলি। মাধ্যমিকের আগে ছিল উম্মর আলি। রেজিস্ট্রেশনের পর থেকে উমর আলি।

❑ উমরদের বাড়ি কোথায়?

❍ গ্রামের নাম নতুনপাড়া। মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গা থানার মধ্যে পড়ে। ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশেই আমাদের গ্রাম।

❑ বাড়িতে কে কে আছেন?

❍ আব্বা-মা আর আমরা তিন ভাইবোন, এই আমাদের পরিবার।

❑ আব্বা-মার নাম কী?

❍ আব্বার নাম সেখ মোজ্জামেল হক। মা ময়না বিবি।

❑ আব্বা কী করেন, পড়াশোনা কতদূর?

❍ আব্বা পড়াশোনা জানেন না। আর তাঁর পেশার কথা কী বলব! সারাজীবন ধরে তাঁর কোনো নির্দিষ্ট পেশা দেখিনি। সময়ের সঙ্গে যেমন ঋতু পরিবর্তনের কথা জানি, তেমনই মনে হয় আমার আব্বার মতো মানুষদের জীবনের এক-একটা ভাগে এক-একরকম পেশা। ছোটোবেলায় আব্বাকে চটকলের মজুর হিসেবে কাজ করতে যেতে দেখেছি বহুদিন। গ্রামে জনমজুরিও করেছেন। এখন ঘরামির কাজ করেন। ঘরামি বোঝেন তো?

❑ হ্যাঁ। ঘরের কাঠামো তৈরি, ঘর ছাওয়ার কাজ।

❍ সবসময় ওই কাজও গ্রামের দিকে হয় না। তখন আব্বা আমার অন্যান্য চাচাদের মতো শিলিগুড়িতে ফেরি করতে যান। ফেরি মানে পুরোনো টিন, লোহা, ইত্যাদি কিনে বিক্রি করার কাজ।

❑ আর মা?

❍ মাও পড়াশোনা জানেন না। ঘর সামলে যেটুকু সময় বাঁচাতে পারেন, সে-সময় বিড়ি বাঁধেন।

❑ ভাইবোন কি পড়াশোনা করছে, না অন্যকিছু?

উমর আলি।

❍ দাদা আকবর আলি আর দিদি মর্জিনা কারোরই পড়াশোনা করার সুযোগ হয়নি। দাদা ফেরি করেন। দিদির বিয়ে হয়ে গেছে।

❑ গ্রামের দিকে প্রায় সবারই কিছুটা জমিজমা থাকে। তোমাদের আছে নাকি?

❍ আমাদের বসতবাড়ির ওই দু-তিন কাঠার মতো জায়গা হবে বোধ হয়। আর আমার দাদাজির নামে থাকা জমির মধ্যে আমরা হয়তো আট-দশ কাঠা পাব, সেটা এখনও চাচাদের কাছেই আছে, ভাগ হয়নি।

❑ এবার তোমার পড়াশোনার কথা কিছুটা জানাও।

❍ আমাদের গ্রামের নওপুকুরিয়া নতুনপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাথমিকের

পাঠ নিয়েছি। এই স্কুলটা এখন অনেক ভালো হয়েছে পরিকাঠামোর দিক দিয়ে। আমরা যখন পড়ি, ক্লাস থ্রি পর্যন্ত গাছতলায় ক্লাস হত। যদিও গাছতলায় ক্লাস করতে আমাদের খুবই ভালো লাগত। আর ফোরের ক্লাস শ্রেণিকক্ষে হলেও, সে-কক্ষে বসার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। মেঝেতে জমাটি হয়ে বসতে হত। প্রতিটা ক্লাসেই একশোর ওপর ছাত্রছাত্রী ছিল।

❑ ক্লাসেও কি ফার্স্ট হতে?

❍ ওয়ান-টুয়ে হতে পারিনি। থ্রি-ফোরে হয়েছিলাম।

❑ আর হাইস্কুল?

❍ ২০০৫ সালে আমাদের গ্রাম থেকে কিলোমিটার পাঁচেক দূরে হরেকনগর আব্দুল মোমেন ইনস্টিটিউশনে ক্লাস ফাইভে ভর্তি হই। ওখানেই ক্লাস টেন পর্যন্ত পড়েছি।

❑ তাহলে আল-আমীনে এসেছ টেনের পর। কিন্তু গ্রামের স্কুলে পড়ার সময়কার পরিবেশ-পরিস্থিতি, পড়াশোনার হালহকিকত খানিকটা শোনাও।

❍ কষ্ট করে যে পড়াশোনা করেছি,তার তো খানিকটা আন্দাজই করা যায়। তবে আব্বা-মা আর পরিবারের সকলের কাছে কৃতজ্ঞ যে, তাঁরা আমাকে সবসময় পড়াশোনা করার কথা বলে উৎসাহ জুগিয়েছেন। অভাবের অসহায়তা তাঁদেরকে বাধা হয়ে দাঁড় করায়নি। আব্বা-মা সবসময় বলতেন, আমাদের বংশে কারো লেখাপড়া হয়নি, অন্তত মাধ্যমিক পাস করতে হবে।

❑ মাধ্যমিকের গণ্ডি টপকাতে তোমাকে কতটা কষ্ট সইতে হয়েছে?

❍ তেমন বিশেষ কিছু না। প্রথম দু-বছর পায়ে হেঁটে স্কুলে যেতে হয়েছিল, পরে সাইকেলে যেতাম। তখন দুটো মাত্র ঘর ছিল। একটায় আব্বা-মা, একটায় আমরা। পরিকাঠামোর সঙ্গে পরিবেশও ছিল না। তবে আমি স্কুল আর টিউশনে ভালো করে পড়া করে নিতাম বলে বাড়িতে বেশিক্ষণ পড়তে হত না। ঘণ্টা দুয়েকের পড়াতেই সবটা করে নিতাম।

❑ ক-টা টিউশন ছিল?

❍ ক্লাস সেভেন পর্যন্ত পাশের বাড়ির মফিজুর রহমান স্যারের কাছে, আর এইট থেকে স্কুলের স্যার মাহফুজুর রহমান মোল্লার কাছে টিউশন নিয়েছিলাম। নাইন-টেন আরও একজনের কাছে পড়েছিলাম অর্থাৎ নাইন আর টেনে দুটো টিউশন ছিল।

❑ হাইস্কুলে কেমন রেজাল্ট করতে?

❍ হাইস্কুলে ফার্স্ট হতে পারিনি একবারও। প্রতি ক্লাসে সব সেকশান মিলে তিনশোর মতো ছাত্র ছিল। মাধ্যমিকে স্কুলের মধ্যে সেকেন্ড হয়েছিলাম। অন্যান্য ক্লাসে থার্ড-ফোর্থও হয়েছি। ক্লাস সেভেনে একবার ইউনিট টেস্টে অঙ্কে তো শূন্য পেয়েছিলাম।

❑ সে কী! অঙ্কে শূন্য থেকে জয়েন্ট মেডিকেলে ৩২-তম স্থান!

❍ হ্যাঁ, সত্যিই। আমি প্রথম দিকে সব বিষয় হুবহু মুখস্থ করতাম। তাতেই নম্বরও পেতাম। অঙ্কও ছিল মুখস্থের লাইনেই। কিন্তু ওই শূন্য পাওয়ার পর দেখলাম, মুখস্থ আর কমন পাওয়া দিয়ে হবে না। তারপর আমি অঙ্ক সত্যিকার শিখতে শুরু করি। এরপর স্কুলের বই ছাড়াও আরও অন্য অঙ্ক বই কিনেও প্র্যাকটিস করি। তার ফল পাই মাধ্যমিকে। অঙ্কে ৯৮ নম্বর পেয়েছিলাম।

❑ মাধ্যমিকে সার্বিকভাবে কেমন ফল হয়েছিল?

❍ আমি ২০১১ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৬৭২ নম্বর পেয়েছিলাম, ৮৪ শতাংশের মতো।

❑ আল-আমীন মিশনে কীভাবে এলে?

❍ আমাদের বেলডাঙ্গায় আল-আমীন মিশনের একটা শাখা আছে। তা ছাড়া অনেক আগে থেকেই আল-আমীন মিশন সম্পর্কে অনেকেই জানেন। এই জানার সূত্র ধরেই অনেকেই আল-আমীন মিশনে ভর্তি হওয়ার জন্য এক বা একাধিক বার ভর্তির পরীক্ষায় বসে। যেমন আমি ক্লাস এইটে পরীক্ষায় বসে পাস করতে পারিনি। কিন্তু প্রশ্ন সম্পর্কে একটা আইডিয়া তৈরি হয়। এবং এই পরীক্ষা দিয়ে দেখেছিলাম অঙ্কতে স্ট্রং হতে হবে। এরপর মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার পর আমাদের স্কুলের দশ-পনেরোজন ভর্তির পরীক্ষায় বসেছিল। ছ-জন ভর্তি হলেও শেষ পর্যন্ত তিনজন মিশনে থেকে ঠিকঠাক এগিয়েছে।

❑ তুমি তো এমন চমকপ্রদ ফল করলে, আর বন্ধুরা? তাদের রেজাল্ট আর লড়াইয়ের কথা দু-এক লাইনে শোনাও।

❍ আমাদের স্কুলের মধ্যে ৬৮৪ নম্বর পেয়ে প্রথম হয়েছিল মহ. বিন্নুর। ওর আব্বা অসুস্থ, কিছু করেন না। মা আইসিডিএস কর্মী। আল-আমীনের খলতপুর শাখা থেকে উচ্চমাধ্যমিক দিয়ে স্টার মার্কসের বেশি নম্বর নিয়ে পাস করেছে, এখন অঙ্কে অনার্স করছে। ডব্লিউবিসিএস

অফিসার হওয়ার লক্ষ্যে ও জয়েন্টে বসেনি। দ্বিতীয় জন আবু হাসেম। মাধ্যমিকে ৮২ শতাংশের মতো নম্বর পেয়ে আল-আমীনের পাথরচাপুড়ি শাখায় ভর্তি হয়েছিল। ওর আব্বা নেই। মা গৃহবধূ। দাদারা চাষবাস করে সংসার চালান। ও আল-আমীনে পাথরচাপুড়ি শাখা থেকে উচ্চমাধ্যমিক দিয়ে ৮০ শতাংশের মতো নম্বর পেয়েছিল। আর এ-বার জয়েন্ট ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ৮২১ র‍্যাঙ্ক করেছে। শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তি হয়েছে। যাদবপুরেও সুযোগ পেতে পারত, কিন্তু শিবপুর থেকে একেবারে এম টেক পাস করে বের হওয়ার সুযোগ থাকায়, ওখানেই ভর্তি হয়েছে।

❍ তুমি যে আল-আমীনে এসে হস্টেলে থেকে পড়াশোনা করার কথা ভাবলে, খরচের বিষয়ে ভেবেছিলে কিছু, কীভাবে চালাবে?

❑ না, সেভাবে কিছু ভাবিনি। কারণ, আমরা জানতাম, আমাদের হাতের কাছে উদাহরণ ছিল যে, ভালো পড়াশোনা করলে আল-আমীন মিশনে ফ্রিতেও পড়াশোনার সুযোগ আছে।

❑ কীরকম উদাহরণ ছিল?

❍ আমাদের স্কুলের ছাত্র, পাশের গ্রাম নবাববাড়ির রফিকুল ইসলাম মিশনে পড়াশোনা করে ডাক্তার হয়েছেন। ওঁর আব্বা সবজি বিক্রি করতেন। সম্পূর্ণ ফ্রিতে রফিকুলদা পড়াশোনা করার সুযোগ পেয়েছিলেন।

❑ তুমিও কি ফ্রিতেই পড়েছ?

❍ হ্যাঁ, ফ্রিতেই বলা যায়। মাসে চারশো আশি টাকা করে দিতাম। আর এই খরচের বিষয়ে বলার সময় আর-একজনের কথা বলে নিই, আমার এই সাফল্যের পিছনে আল-আমীন মিশনের পাশাপাশি তাঁরও বিশেষ অবদান আছে। তিনি আমার স্কুলের শিক্ষক মাহফুজুর রহমান, যাঁর কাছে আমি টিউশন পড়তাম। মিশনকে যে-ফিজ দিতে হত, সেটা, এমনকী আমার মেডিকেলে ভর্তির টাকাটাও তিনি দিয়েছেন। শুধু আমাকে নয়, এলাকায় ভালো ছেলেমেয়ে থাকলে, তাদের আল-আমীন মিশনে ভর্তি করা থেকে সব রকমের সহযোগিতা করেন। একটু আগে যে বললাম, রফিকুলদার কথা, তাঁকেও ভর্তি করেছিলেন। আরও একজন ইঞ্জিনিয়ার হয়েছেন স্যারের হাত দিয়ে।

❑ মিশনে দু-বছর পড়ে উচ্চমাধ্যমিকে কেমন ফল করেছিলে?

❍ ভালো করতে পারিনি। আমি ২০১৩ সালে উচ্চমাধ্যমিক দিই। ৭৭ শতাংশের মতো নম্বর পেয়েছিলাম। বাংলা আর ইংরেজিতে ভালো নম্বর পাইনি। যদিও মিশনে ক্লাসে এক থেকে দশের মধ্যে থাকতাম।

❑ তার মানে গতবছর তুমি জয়েন্ট দাওনি?

❍ হ্যাঁ, রানিং ইয়ারেই দিয়েছিলাম। ওই বছর অল ইন্ডিয়া জয়েন্ট হয়েছিল বলে সার্বিক রেজাল্ট খুব একটা ভালো হয়নি। আমার পশ্চিমবঙ্গে র‍্যাঙ্ক

হয়েছিল ৪১৩০, আর অল ইন্ডিয়া লেভেলে ৫০০০০-এর কাছাকাছি।

❑ তাহলে শুধু জয়েন্টের জন্য কোচিং নিলে এক বছর?

❍ হ্যাঁ, তা নিলাম। কিন্তু উচ্চমাধ্যমিকে তত ভালো ফল করতে না পারা এবং জয়েন্টেও সফল না হতে পেরে কেমিস্ট্রি অনার্স পড়ব বলে বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে ফর্ম তুলেছিলাম। চল্লিশটা সিট ছিল। আর আমার নাম ছিল ১৭৭-তম স্থানে। ওখানে সুযোগ না পেয়ে আবার আল-আমীন মিশনের জয়েন্ট কোচিংয়ের জন্য নেওয়া ভর্তির পরীক্ষায় বসে পাস করে ইন্টারভিউ দিয়ে ভর্তি হই। কোচিংয়ের ফিতেও মিশন ছাড় দিয়েছিল। উচ্চমাধ্যমিকের চেয়ে দু-শো টাকা বেশি দিতে হত আমাকে।

❑ মোটামুটি তিন বছরের মতো পড়লে আল-আমীন মিশনে, কী কী বিশেষত্ব চোখে পড়ল?

❍ দুটো বিষয় আমার সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে। এক, গুণগত উচ্চমেধাসম্পন্ন পড়ার সাথি, যাদের সাথে ক্লাসের পড়া বুঝতে না পারলেও আলোচনা করে ধোঁয়াশা কাটিয়ে নেওয়া যায়। দুই, সব সময়ের টিচার। রাত বারোটাতেও শিক্ষক পাওয়া যায় এবং সেই শিক্ষকদের মধ্যে কোনো বিরক্তি নেই, যখনই যাই। আর-একটা বিষয়, স্কুলে দেখেছি ছেলেরা না বুঝতে পারলে চুপচাপ থাকে, জিজ্ঞাসা করে না। আর মিশনে, ছেলেরা অনবরত প্রশ্ন করে যায়, জানতে পারে অনেক বেশি এবং স্যারেরাও প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করেন।

❑ দৈনিক কতক্ষণ পড়াশোনা করতে?

❍ সবসময় যে বই মুখে নিয়ে পড়ে থাকতাম, তা না। আমি বন্ধুদের থেকে জানতাম যেমন, তেমন যেগুলো ভালো পারতাম, তা পড়াতাম ওদের। এই পড়ানো আমার খুব ভালো লাগত। তবে দশ-বারো ঘণ্টা পড়তেই হত।

❑ কেমন রুটিন ছিল পড়াশোনার?

❍ আমি বেশি রাত জেগে কোনোদিনই পড়াশোনা করতে পারি না। রাত্রের দিকে সাড়ে এগারোটা-বারোটা পর্যন্ত পড়তাম। সকালে ছ-টা সাড়ে ছ-টায় ঘুম থেকে উঠে পড়তাম। আর যে-পড়া যে-দিনকার সে-দিনই পড়ে নিতাম। পড়া ফেলে রাখতাম না।

❑ জয়েন্ট মেডিকেলে তো ফার্স্ট হতে পারনি, উচ্চমাধ্যমিকেও মোটামুটি রেজাল্ট। এখন কী মনে হয়, কীভাবে পড়লে আরও একটু ভালো রেজাল্ট হত?

❍ উচ্চমাধ্যমিকে সিলেবাস ধরে ধরে পড়িনি, যেটা জয়েন্টে করেছি। আমার মতে সেটা করলে উচ্চমাধ্যমিকের রেজাল্টটা আরও ভালো হত। আর জয়েন্টের জন্য আরও বেশি পড়াশোনা করলে হয়তো আরও ভালো রেজাল্ট হত।

❑ পড়াশোনা ছাড়া আর কী ভালো লাগে?

❍ সিনেমা দেখতে ভালো লাগে। শাহরুখ খানের। যদিও আমি শাহরুখ খানের ছাড়া, আর কারো সিনেমা বিশেষ দেখিনি। এখনও আমার হলে গিয়ে সিনেমা দেখা হয়নি, সব টিভিতে দেখেছি।

❑ ভবিষ্যতে কীভাবে এগোতে চাইছ?

❍ এমবিবিএস করে এমডি, তারপর ডিএম করার ইচ্ছে আছে।

❑ তোমার এই সাফল্যে কতটা খুশি আব্বা-মা, আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশীরা?

❍ প্রথমে গ্রামের লোকেদের কথা বলি। আমার এই রেজাল্ট শুনে তাঁরা এতটাই খুশি যে, কাটা-ছেঁড়া নিয়ে আমার কাছে চলে আসছেন। মনে করছেন, আমি ডাক্তার হয়ে গেছি। আর আব্বা-মা কতটা খুশি, বলে বোঝাতে পারব না। আপনাকে তো বললামই, আমার দাদাজি, বাপ-চাচারা, মা, ভাই, বোন, বোনাই সকলেই নিরক্ষর। এঁদের প্রত্যাশা ছিল মাধ্যমিক, তারপর হয়তো ওঁদেরই মতো কোনো পেশায় ঢুকব। তাহলে খুশিটা আন্দাজ করুন।

❑ প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বয়ে চলা নিরক্ষরতার অন্ধকারের মাঝে আলোকবর্তিকা হয়ে এসেছ। ওই আলোয় কি শুধু তোমার পরিবারই আলোকিত হবে, না সমাজেও খানিকটা এসে পড়বে?

❍ অবশ্যই আমি মনে করি, আমার পরিবার-পরিজনের মাঝে থাকা নিরক্ষরতার অন্ধকার দূর করার ভার আমার হাতেই দিয়েছেন আল্লাহ্। পরিবারকে দেখা আমার প্রাথমিক কর্তব্য। আর আমার গ্রামের যেসব ছেলেরা আমার বাপ-চাচা-ভাইয়েদের মতো ফেরি করে, ব্যাগের কাজ করতে বা এসির কাজ করতে বাইরে চলে গেছে যারা, আমি ডাক্তার হওয়ার আগেই আমার কাছে চিকিৎসার জন্য ছুটে আসছেন যাঁরা, তাঁদের আমি কোনোদিন ফিরিয়ে দিতে পারব না।

সেরার পরামর্শ

উমর আলি

● উচ্চমাধ্যমিক ও জয়েন্ট এন্ট্রান্স— সমস্ত ছাত্রছাত্রীকে প্রথমে সিলেবাস জানতে হবে। সিলেবাসের বাইরে যাবে না। পরীক্ষায় সিলেবাসের বাইরে খুব কম প্রশ্ন থাকে।

● সাফল্যের জন্য তোমার শেষ পরিশ্রমটুকু পর্যন্ত দেবে। কঠোর পরিশ্রম ছাড়া সাফল্য আসে না। তোমার ক্লাসের বা রুমের ভালো ছেলেদের বা মেয়েদের সঙ্গে প্রশ্ন আলোচনা করবে। সহপাঠীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলবে।

● ক্লাসে শিক্ষকরা যা পড়াবেন, তা মন দিয়ে শুনবে। ক্লাসে বুঝতে পারলে পড়ার চাপ কিছুটা কমে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে প্রশ্ন আলোচনা করবে।

● জয়েন্টের *Ten years question*-গুলি ভালো করে দেখবে এবং সমাধান করার চেষ্টা করবে। না পারলে সহপাঠীদের সঙ্গে বা শিক্ষক-শিক্ষিকার সাহায্য নেবে। জয়েন্টে কী ধরনের প্রশ্ন আসে, এটা জানা খুব জরুরি।

● বেশি জটিল প্রশ্ন সমাধান করার চেষ্টা করবে না। না পারলে কনফিডেন্স কমে। স্ট্যান্ডার্ড ও সহজ প্রশ্নগুলিই করবে। পরীক্ষায় খুব কঠিন প্রশ্ন খুবই কম আসে।

● সবসময় নিজের ওপর ভরসা রাখবে। পরীক্ষার হলে তুমি কোনো প্রশ্ন না পারলে ভাববে, তোমার অন্য বন্ধুরাও পারছে না। একেবারে কঠিন প্রশ্ন প্রথমে attend না করাই ভালো। অনেক সময় সমাধান করা যায় না, আবার সময়ও নষ্ট হয়। শেষে সময় থাকলে সমাধান করার চেষ্টা করবে।

● সবসময় সতেজ থাকবে। মন-মরা হয়ে বসে থাকলে পড়াশোনাতে মন বসে না। আবার যা পড়বে ভুলতে শুরু করবে।

● আগের পড়া পুনরাবৃত্তির চেষ্টা করবে। এতে পরীক্ষার আগে চাপ কিছুটা কম হয়।

● পড়া কখনও ফেলে রাখবে না। যে-দিনকার পড়া সে-দিনই পড়ে নেবে।

● সর্বোপরি আল্লাহ্ পাকের ওপর বিশ্বাস রাখবে। তোমার ও তোমার বন্ধুদের সাফল্যের জন্য আল্লাহ্র কাছে দোয়া করবে। ■

বেঁচে থাকবার প্রয়োজনে দেশে দেশে মানুষ ব্যবহার করে আসছে নানা খাদ্য, পানীয়, বস্ত্র আর বাসস্থান। কোনোটা যেমন সরাসরি প্রকৃতিজাত তেমনি কোনোটা মানুষেরই উদ্ভাবন। আবার কোনোটা সর্বজনীনতা পেলেও কিছু কিছু উদ্ভাবন নেহাতই আটকে থেকেছে আঞ্চলিকতায়। এই পাতায় দুনিয়াজুড়ে বিচিত্র জীবনযাপনের টুকরো পরিচয়।

জাভেদ ইকবাল

কলম

কিছু সময়ের জন্য দশ বছর আগে চলে যাই। রাস্তায় চলার সময় বাসে, ট্রেনে, পথেঘাটে কোনো নতুন বন্ধু জুটলে, তার ফোন নম্বরটা টুক করে মোবাইলবন্দি করার মতো মোবাইল ফোন তখন সবার পকেটে ছিল না। তাই বলে কি ঠিকানা আর ল্যান্ড নম্বরটি না নিয়ে, নতুন বন্ধুকে হারানো যায়? সঙ্গে সঙ্গে বুকপকেটে হাত। এ কী, কলমটা গেল কোথায়! তারপর আর কী, বসে থাকা পাশের যাত্রির থেকে নতুবা পথের ধারে কোনো মুদি বা চা-বালার হিসেব লেখা কলমটা চাওয়া। কিন্তু মোবাইল ফোনের মতো কলমও যদি দুষ্প্রাপ্য হত কিংবা কলমের অস্তিত্বই যদি না থাকত, তাহলে সেই নতুন বন্ধুকে খোঁজা মানে কালাহারিতে জল খোঁজা আর কী। যাই হোক, দশ বছর পরেও, বর্তমানে লেখার কথা ভাবলেই আমরা হাতে তুলে নিই ডট পেন বা বলপয়েন্ট পেন। কিন্তু এই কলমের বয়স তো খুব বেশি হলে চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর। প্লেটো, অ্যারিস্টটল, আর্যদেব, কৃত্তিবাস তবে কী দিয়ে লিখতেন? সে-কালের কলম দেখতেই-বা কেমন ছিল আর কীভাবেই-বা সেটা আজকের এই বলপয়েন্ট কলমে পরিণত হল? ব্যাটারি আর সিম ছাড়া যেমন মোবাইল ফোন অচল, তেমনি কলমের বিবর্তনের ইতিহাসের সঙ্গে কাগজ, কালি এবং লিখিত অক্ষরের রূপও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ছুরি দিয়ে দেওয়ালে বড়োহাতের A বর্ণটি লেখা সহজ কিন্তু ছোটোহাতের a কিংবা বাংলার অ বর্ণটি লিখতে হলে দরকার হয়ে পড়ে মসৃণ তল আর হাতের ইশারায় চলতে পারে এমন লেখনী।

বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে মানুষ করে চলেছে কঠিনকে সহজ করার চেষ্টা। পৃথিবীতে নানা সময়ে কলমকে নানান রূপ নিতে হয়েছে। খ্রিস্টজন্মের প্রায় তিরিশ হাজার বছর আগে, ইশারা ছিল যখন মানুষের একমাত্র যোগাযোগ মাধ্যম, তখন মানুষ গাছের ছাল আর পাতা জড়িয়ে নিজেদের দৈনন্দিন জীবনের ছবি, পশু শিকারের ছবি, চাষবাসের ছবি এঁকে রাখত গুহার দেওয়ালে। চিত্র অঙ্কনে তাদের কলম ছিল শিকারে ব্যবহৃত পাথরের ধারালো অস্ত্র। সেটাই কি লেখার প্রথম পদক্ষেপ? অস্ত্রের সেই কলমরূপ যে পরে অস্ত্রের চেয়েও শক্তিশালী হয়ে বিখ্যাত প্রবাদ pen is mighter than sword-রূপে আত্মপ্রকাশ করবে, তা কি সেই গুহাবাসীরা ভেবেছিল?

ডিজিটাল পেন। স্টাইলাস কলমের আধুনিক রূপ।

ধীরে ধীরে মানুষ পাথরের যুগ থেকে ধাতুর যুগে পা দিল। আদিম সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থা ব্যক্তিমালিকানায় রূপ নিল। প্রাকৃতিক সম্পদকে মানুষ ঘরে জমা করতে শিখল। পুঁজি বাড়াতে ব্যাবসা শুরু করল। ব্যাবসার জন্য দরকার পড়ল সহজে বহন করা যায়, এমন-কিছু লিখিত প্রমাণ। গুহার দেওয়ালকে তো আর বয়ে নিয়ে যাওয়া যায় না। সুতরাং বিভিন্ন ছবি ও চিহ্নযুক্ত কাদার ছোটো ছোটো টোকেন বণিকরা ব্যবহার করল, যে-টোকেনে আমদানি-রপ্তানি করা মালপত্রের পরিমাণ লেখা থাকত। সেসব অবশ্য খ্রিস্টজন্মেরও সাড়ে আট হাজার বছর আগের কথা। কেউ কেউ মনে করেন, মেসোপটেমিয়াতে (বর্তমান ইরাক) আজ থেকে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগে লেখা শুরু হয়। নরম কাদার ছোটো ছোটো ট্যাবলেট বা ফলকে ধাতুর দণ্ড দিয়ে খোদায় করে লেখা হত। কলমরূপী একদিক ছুঁচলো ধাতুর এই দণ্ড অর্থাৎ স্টাইলাস, ধাতু ছাড়াও হাড় এবং হাতির দাঁত দিয়েও তৈরি হত। তখনকার বর্ণগুলি দেখতে ছিল সরলরেখা আর ত্রিভুজের মতো। গোলাকার দেখতে বর্ণের ব্যবহার তখনও শুরু হয়নি। সুতরাং সুমেরিয়ান ভাষায় কুনেফর্ম মাধ্যমে লেখার জন্য স্টাইলাসই ছিল উপযুক্ত কলম।

কেউ কেউ মনে করেন, মেসোপটেমিয়াতে (বর্তমান ইরাক) আজ থেকে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগে লেখা শুরু হয়। নরম কাদার ছোটো ছোটো ট্যাবলেট বা ফলকে ধাতুর দণ্ড দিয়ে খোদায় করে লেখা হত।

দক্ষিণ এশিয়া এবং ভারতে তিন-চার হাজার বছর আগে তাল পাতাতে লেখা শুরু হয়ে গেছে। কলম হিসেবে ছিল ব্রোঞ্জের স্টাইলাস, যার লেখার

বাঁশের কঞ্চির তৈরি কলম। রিড পেন।

দিকটা ছিল তীক্ষ্ণ আর তাল পাতার অমসৃণ তলকে মসৃণ করার জন্য অপর প্রান্তটি ছিল চ্যাপটা ব্লেডের মতো। বিখ্যাত সংস্কৃত বিশারদ পাণিনি ঋষির তাল পাতার ওপরে লেখা ৭৯০ কলিযুগ তারিখ প্রমাণ করে, আজ থেকে চার হাজার একশো একষট্টি বছর আগে ভারতে স্টাইলাস কলমের ব্যবহার। এখনও কেরলের বিশেষ কিছু এলাকায় হিন্দু সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েরা তাল পাতা আর লোহার স্টাইলাস দিয়েই প্রথম বর্ণ লেখা শুরু করে। রোমের লেখকরাও কলম হিসেবে ভারতের মতো স্টাইলাস ব্যবহার করত এবং লেখার তল হিসেবে কাঠের বোর্ডে মোম লেপে রাখত। কাদা, কাঠ আর মোমের ট্যাবলেটের পর আধুনিকতার রূপ নিয়ে আজ সেই স্টাইলাস মোবাইল ট্যাবলেটের স্পর্শকাতর পর্দায় আঁচড় কাটতে কাজে লাগছে।

মেসোপটেমিয়া যখন নরম কাদার ওপর ধাতুর কাঠি দিয়ে লেখা শুরু করেছিল, প্রায় সমসাময়িক কালে অর্থাৎ তিন হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দে প্রাচীন মিশরবাসীরা হাতে তুলে নিয়েছিল শর আর বাঁশের কঞ্চির তৈরি কলম, যাকে বলা হত রিড পেন। কাদা, কাঠ আর মোমের বদলে হাতে তুলে নিল প্যাপিরাসের কাগজ। জলাভূমি বা জলের ধারে জন্মানো হোগলা বা এরকা জাতীয় এই প্যাপিরাসের কাণ্ডকে অতি সাবধানে লম্বালম্বি পাতলা স্লাইস পাঁউরুটির মতো কেটে, তাকে চাটাই বা তালাইয়ের মতো লম্বালম্বি আর আড়াআড়ি করে ভিজিয়ে রাখা হত। আঠা হিসেবে ব্যবহৃত হত নীল নদের কাদা। আড়াআড়ি আর লম্বালম্বি রাখা অংশের মাঝে এই কাদা রেখে চাপ দিয়ে সূর্যের তাপে শুকিয়ে তৈরি হত প্যাপিরাসের কাগজ। স্টিভেন রজার ফিসার, তাঁর লেখা বই 'A story of writing'-এ উল্লেখ করেছেন, "আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে রিড কলম ব্যবহার করা হত।" ওপর থেকে নীচে কিংবা ডান দিক থেকে বাম দিকে লেখার রীতিতে বিপ্লবাত্মক বদল এনে এই রিড কলম শুরু করল প্রথম বাম দিক থেকে গ্রিক লেখা। বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্ট লেখার সময়কালে এই রিড কলমের ব্যবহার ছিল সর্বাধিক। দীর্ঘ সাড়ে তিন হাজারেরও বেশি সময় ধরে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখে, শেষে, সপ্তম শতাব্দীতে আরও একটু সহজ উপায়ে পাওয়া পাখির পালকের তৈরি কুইল কলমের কাছে রিডকে হার মানতে হল, যদিও বিংশ শতাব্দী পর্যন্তও এর দেখা পাওয়া যেত। শরের কলমটি সংসার থেকে বিদায় নিলেও পুজোর সময় পুরোহিতের মুখে সংস্কৃত শোনার মতো এখনও পাকিস্তান এবং ভারতের কিছু এলাকার শিশু ছাত্রছাত্রীদের হাতে কিংবা কোনো আর্টিস্টেরক্যালিগ্রাফির সময় শরের কলম দেখা যায়। মনে পড়ে গেল ছেলেবেলার কথা। হাতের লেখা ভালো করার জন্য ক্লাস ফোর পর্যন্ত মা আমাকে বলপয়েন্ট পেনে হাত দিতে দেননি। তা ছাড়া শংকরবাবু যা বলেছেন, "আর্টিস্ট রেখে লেখা শেখালেই লেখা ভালো হয় না। আজকাল সাইকোলজিস্টরা বলছেন, কথাটা হল মানুষের সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন। মিতুর হাতের লেখা দেখলেই বোঝা যায়, ওর পার্সনালিটি কীরকম।" অতএব ছেলেকে ব্যক্তিত্ববান করতেই স্লেট-পেনসিল থেকে ধরিয়ে দেওয়া হয় শরের কলম, পরে নিবের কলমে হাত পাকা করে ক্লাস ফাইভে উঠে হাতে আসে প্রথম কলম রোটোম্যাক। পূর্ব দিকে গ্রামের শেষ প্রান্ত স্যাওড়ার পাড় পেরিয়ে গোটা চারেক চাষের জমি পেরোলেই শিয়ানা-পুকুর, তার কাজলস্বচ্ছ জলের চারপাশে শরকাঠির ঘন বন। সেই শরকাঠি এনে দিলে, মা তাকে ব্লেড দিয়ে ছুঁচলো করে সুন্দর নিব পেনের আকার দিতেন। তারপর প্রতিটা বর্ণ লেখার আগে কালির দোয়াতে ডোবাতাম। রিড কলমের ত্রুটি হল, এটি প্যাপিরাসের তৈরি এবড়োখেবড়ো কাগজে লিখতে বেশ মুশকিল হত। শুকিয়ে গেলে তাল পাতার মতো প্যাপিরাস ভঙ্গুর হয়ে পড়ত, তা ছাড়া মাদুরের মতো রোল করে গুটিয়ে রাখতে অনেক বেশি জায়গা দখল করত।

রিড পেনের নকশা।

কালির দোয়াত।

পালক কলম।

প্রথম-প্রথম খ্রিস্টানরা শরের কলম দিয়ে প্যাপিরাসে লিখলেও, ধীরে ধীরে চার্চগুলি অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে স্বল্প মেয়াদি প্যাপিরাস ছেড়ে, দামি পার্চমেন্ট বা চামড়ার তৈরি কাগজ ব্যবহার করতে লাগল। কিন্তু এই চর্মকাগজে লেখার জন্য তো উপযুক্ত কলম দরকার। শরের কলমে লেখা হলেও চর্মকাগজের মসৃণ তলের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জন্ম নিল পালক কলম বা কুইল পেন। ল্যাটিন ভাষায় পেন্না (penna) অর্থাৎ পালক, আর সেখান থেকেই Pen– এই নামকরণ। প্রথম প্রথম কালি ধরে রাখার মতো ক্ষমতা চামড়ার বিশেষ একটা ছিল না। তার ওপর সঠিকভাবে পরিষ্কারের অভাবে পশুর অবশিষ্ট লোম লেখার পক্ষে যথেষ্ট ব্যাঘাত ঘটাত। মানুষও ছেড়ে কথা বলবে না। লোমহীন করার জন্য পশুশাবকের চামড়া কেটে ভালো করে ধুয়ে চুনে চবচবে করে ফ্রেমে টান করে রেখে, চামড়ায় লেগে থাকা অতিরিক্ত মাংসকে চেঁছে ফেলা হত। তরপর তাকে খড়ি দিয়ে লিপ্ত করে ঝামাপাথর দিয়ে ঘষে, রোদে শুকিয়ে, অবশেষে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে লেখার উপযোগী করা হত। লেখার জন্য কাক, ইগল, বাজ পাখির পালক ব্যবহার করলেও, সবথেকে প্রিয় ছিল রাজহাঁসের পালক। লেখার সময় পালকের অগ্রভাগের বাঁকা অংশটা বাইরের দিকে রাখতে ডানহাতি মানুষরা ব্যবহার করত পাখির বাম ডানার পালক। প্রায় দেড় হাজার বছর আগে বাঁশের কলমকে বিলুপ্ত করলেও, পালক কলমটি পৃথিবীতে এসেছিল প্রায় দুই হাজার বছর আগে এবং কুমরানে এর ব্যাপক প্রচলন ছিল। হিব্রু ভাষার কথোপকথন নথিবদ্ধ করে রাখতে, সেই সময় এই পালক কলম ভীষণভাবে কাজে এসেছিল।

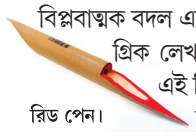

রিড পেন।

চর্মকাগজের মসৃণ তলের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জন্ম নিল পালক কলম বা কুইল পেন। ল্যাটিন ভাষায় পেন্না (penna) অর্থাৎ পালক, আর সেখান থেকেই Pen– এই নামকরণ।

রিড বা শর কলমের মতো এত বেশি সময় ধরে বিবর্তনের সঙ্গে সংগ্রামে টিকে থাকতে না পারলেও, ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে এই পালক কলম আমেরিকার সংবিধান রচনা করে পৃথিবীতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত নিজের অস্তিত্ব প্রমাণ করেছিল। অবশ্য কালির দোয়াতকে পাশে নিয়ে একটুকরো কাগজকে সামনে রেখে আঙুলের ফাঁকে পালক ধরে থাকা কবির ছবি এটাই প্রমাণ করে যে, ভারতীয়রা ঊনবিংশ, এমনকী বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেও পালক বা কুইল কলমকে নিজেদের আঙুল ছাড়া করেনি।

প্যাপিরাস আর চর্মকাগজে শর আর পালক কলমের লেখাকে আরও স্পষ্ট করতে এক চীনা দার্শনিক তিয়েন-চিউ খ্রিস্টজন্মের দু-হাজার ছ-শো সাতানব্বই বছর আগে ঝুল বা ভুসা, প্রদীপের তেল আর গাধার চামড়া বা মৃগনাভির রস দিয়ে তৈরি করেছিলেন কলমের কালি। ভারতও তাল পাতায় কালি দিয়ে লিখতে শুরু করেছিল প্রায় আড়াই হাজারেরও বেশি বছর আগে। পোড়া হাড় এবং আলকাতরা সংযোগে ভারতীয় কালির নাম ছিল মাসি। দাদি-নানির কাছে শোনা, স্বাধীনতা তখনও আমাদের দেশে আসেনি। প্রাথমিক শিক্ষা নিতে তাঁরা যেতেন মক্তবে। হাতে থাকত তাল পাতা, শরের কলম আর ঘরের তৈরি কালি। লেখাপড়ার এই সরঞ্জাম তৈরি করা যে কত কঠিন ছিল, তা তাঁদের মুখে না শুনলে উপলব্ধি করা বেশ শক্ত। তাল গাছের একদম মাঝের তুলনামূলক কচি পাতা, যেগুলো ঠিকমতো মেলতে শেখেনি, সেই পাতা আর শরকাঠি কেটে পাঁকে বা কাদায় ডুবিয়ে রাখতে হত। পাঁক থেকে তুলে পাতাকে এক হাত লম্বা মাপে কেটে রোদে মেলে দিতেন। ধান সেদ্ধ করার পর নান্দার (ধান সেদ্ধ করার বড়ো কড়াইয়ের মতো পাত্র) তলায় যে পুরু ভুসা কালি জমত, সেটা পাত্রে সংগ্রহ করে হালকা জল দিয়ে ভিজিয়ে রাখতেন। অন্য একটি পাত্রে ভাঙা চাল বা খুদকে ভাজতে হত, যতক্ষণ না তার রং কালচে লাল হয়ে যায়। সেই ভাজা খুদকে শিলে বেটে পাতলা কাপড়ে শক্ত করে বেঁধে পাত্রে রাখা ভুসা কালিতে ঘষে

ফাউন্টেন পেন।

ঘষে তৈরি করতেন লেখার কালি। তারপর শরের কলম দিয়ে কালিতে ডুবিয়ে ভাঁজ করা তাল পাতায় লিখতেন। তাল পাতা তো আর বেশি কাটা যাবে না, সুতরাং মক্তব থেকে ফিরে লেখা তাল পাতাগুলোকে ধুয়ে পুনরায় ব্যবহারযোগ্য পাতায় পরিণত করতেন।

প্রায় দু-শো বছর আগে পালককে হার মানাতে মিশর নিয়ে এল তামা এবং ব্রোঞ্জ ধাতুর তৈরি নিব। ১৮১০ সাল নাগাদ আমেরিকাও ধাতব কলম ডিপ পেনের ব্যবহার শুরু করে দিয়েছে, যদিও

বলপয়েন্ট পেন।

প্রথম-প্রথম এই নতুন কলমের লেখা শর বা পালকের মতো মসৃণ ছিল না। ১৮২২ সালে জন মিচেল নামক এক ইংরেজ ইংল্যান্ডের বারমিংহামে স্টিলের নিব তৈরির কারখানা শুরু করে আগের সমস্যাকে মিটিয়েছিলেন।

বাঁশকঞ্চির ক্যালিগ্রাফি কলম।

অবশ্য কালি সঞ্চয় করে রাখার মতো ক্ষমতা ডিপ পেনের তখনও তৈরি হয়নি। তাই এই ডিপ পেনের ভেতরে কালি রাখার চৌবাচ্চা বানিয়ে তৈরি হল ফাউন্টেন পেন। যার ফলে ড্রপারে করে একবার কালি ঢুকিয়ে কয়েক দিন ধরে কয়েক পাতা লেখা হলেও পকেটে রাখলে পকেটের চারপাশকে কালির রঙে রাঙিয়ে দিত। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে কিছু কলম নির্মাতা সংস্থা অক্লান্ত পরিশ্রম করে ফাউন্টেন পেনকে সমস্যামুক্ত করে বিপদমুক্ত কলম বলে পুনরায় বাজারে নিয়ে আসল। এখন তো সরু, মাঝারি, মোটা বিভিন্ন মাপের নিব তৈরি করে এই ফাউন্টেন পেন লিখতে সই করতে কিংবা ছবি আঁকতে কাজে আসে। তা ছাড়া উপহার হিসেবে তো সবার

ডিপ পেন।

পছন্দ এই ফাউন্টেন পেন। যদিও ক্লাস নোট নিতে, তিন ঘণ্টায় এক-শো দু-শো নম্বরের প্রশ্ন লিখতে গিয়ে কিংবা সাংবাদিকতা করতে বলপয়েন্ট পেনের কাছে সবাই অনেক পেছনে।

জীবনের গতি বাড়ার সাথে সাথে মানুষের প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কলম নির্মাতারা পিতল, স্টিল এবং টাংস্টেন কার্বাইট ধাতু দিয়ে বানিয়ে ফেলল ০.৫ থেকে ১.২২ মিমির ছোটো বল। এই বলটি সুন্দরভাবে কলমের মুখে আটকে দিয়ে তৈরি করল বলপয়েন্ট পেন। মানুষের সেই প্রয়োজনের তাগিদে অভিকর্ষহীন মহাকাশে যেকোনো কোণে লেখার উপযুক্ত কলম তৈরি হল দশ লক্ষ ডলার ব্যয় করে, যেটা দিয়ে -45^{o} সেন্টিগ্রেড থেকে $+200^{o}$ সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় অনায়াসে লিখতে পারা যায়।

সমাজে প্রভাবশালী অথবা বিলাসবহুল ব্যক্তির পকেটে উঁকি মারা দামি ফাউন্টেন পেন কিংবা সাধারণ ব্যবহারযোগ্য বলপয়েন্ট পেন ছাড়া কলমের বাকি প্রায় সমস্ত প্রাচীন রূপ আজ জাদুঘরে স্থান নিয়েছে। এই তো চলতি বছরের জুলাই মাসের সাত তারিখে 'আজকালে'র পাতা ওলটাতেই চোখদুটো ছানাবড়া হয়ে গেল। '৮০ বছরে ছাত্র' নামক হেড লাইনে খবরটা ছিল এইরূপ: "সত্যিই শেখার কোনো বয়স নেই। হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ৮০ বছর বয়সেও শিক্ষার্থী। শিখছেন মনিটরের পর্দায় আঙুলের ছোঁয়ায় কীভাবে কম্পিউটার চালানো যায়। বীরভদ্র আগে কখনও ব্যক্তিগত ই-মেল চালাচালি করেননি, এমনকি মোবাইল ফোনও ব্যবহার করেননি। রাজ্য বিধান সভায় কাগজপত্রের ব্যবহার উঠে গিয়েছে। ফলে প্রশ্নের উত্তরের জন্য কম্পিউটারের ডিজিটাল পাতা ওলটাতে হচ্ছে।" ভয় হয়, আগামী দিনে আমাদের হাতের এই কলমখানিও জাদুঘরের কোনো একটা কোনা না দখল করে নেয়। ■

আল-আমীনের নানা আবাসিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কয়েক হাজার ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে লেখাপড়া করছে দুঃস্থ পরিবারের কয়েক-শো মেধাবী ছেলেমেয়েও। আল-আমীনের আশ্রয় না পেলে হয়তো হারিয়ে যেত তারা। কেমন আছে এই কচিকাঁচারা, যারা একদিন দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে বলে আল-আমীনের বিশ্বাস? নিজেই বলছে উনসানি ক্যাম্পাসের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র

আসিফ বিশ্বাস

একা কিছু করা যায় না

আসিফ বিশ্বাস।

■ তোমার নাম কী?

❑ আসিফ বিশ্বাস।

■ আব্বা-মায়ের নাম বলো।

❑ আব্বার নাম আনোয়ার বিশ্বাস আর মা মিনু বেগম।

■ তাঁরা কী করেন?

❑ আব্বা রাজমিস্ত্রি। নিয়মিত কাজে যান না। মা আশা প্রকল্পে কাজ করেন।

■ আব্বা নিয়মিত কাজে যান না কেন?

❑ (কিছুক্ষণ চুপ। মাথা নীচু। তারপর এক সময় শুরু হয় তার কান্না। কাঁদতে কাঁদতে বলে) আব্বা নেশা করেন। সংসার চলে মায়ের চাকরির ওই ক-টা টাকায়। তাতে কিছুতেই চলে না বলে মাকে বাড়িতে এমব্রয়ডারির কাজও করতে হয়।

■ তোমরা ক-ভাইবোন?

❑ আমার এক দিদি। মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়ার পর তার বিয়ে হয়ে গেছে।

■ তোমাদের বাড়ি?

❑ স্বরূপপুর।

■ সেটা কোথায়?

❑ উত্তর চব্বিশ পরগনায়। শিয়ালদা থেকে হাসনাবাদ লোকালে উঠে চাঁপাপুকুর স্টেশনে নামতে হয়। সেখান থেকে ১০৭-এ উঠে খোলাপোতা। খোলাপোতা থেকে পাঁচ মিনিট হেঁটে স্বরূপপুর।

■ ওই স্বরূপপুর থেকে আল-আমীন মিশনের নাম জানলে কী করে?

❑ আমাদের গাঁয়ের কেউ আল-আমীনে পড়েনি। আমার এক নানাজি জানতেন আল-আমীন মিশনের নাম। যখন ফোরে পড়তাম, উনিই মাকে বলেন, ছেলেটা পড়াশোনায় ভালো। ফাইভে উঠলেই ওকে আল-আমীন মিশনে দাও। ভর্তির ফর্ম উনিই তুলে আনেন।

■ তুমি পড়াশোনায় ভালো ছিলে বলছ, সেটা কীরকম?

❑ প্রথম থেকেই প্রতি ক্লাসে আমি ফার্স্ট হতাম। সব সময়।

■ তারপর ভর্তির পরীক্ষা দিলে?

❑ হ্যাঁ। আমার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ছিল ১২৫২৯। খবরের কাগজে ওই নম্বর দেখে বুঝলাম, চান্স পেয়েছি। তারপর খলতপুর যেতে হল ইন্টারভিউ দিতে।

■ কে কে গিয়েছিলেন?

❑ আমি, মা আর সেই নানাজি। মা তো চিনতেন না। একা যাবেন কী করে? তাই সেই নানাজি সঙ্গে গিয়েছিলেন।

■ ক্লাস ফাইভে তোমাকে কত ফিজ দিতে হত?

❑ সব শুনে সেক্রেটারি স্যার আমার ফিজ ঠিক করেন পাঁচশো নব্বই টাকা। এ-বছর সিক্সেও ওই একই ফিজ দিই। আর বাড়েনি।

■ এই টাকাটা কীভাবে দাও?

❑ মায়ের উপার্জন থেকে। আরও তো খরচ আছে। দু-সপ্তাহ পর পর মা আসেন মিশনে, আমাকে দেখতে। তার খরচ। আর আছে বই, খাতা, পেন। কিছু খাবারও আনেন। সংসারখরচও অনেক লাগে। সব-মিলিয়ে এত খরচ সামলাতে মাকে এমব্রয়ডারির কাজটা করতেই হয়।

■ আল-আমীনে এসে, হস্টেলে মনখারাপ করত না?

❑ প্রথম-প্রথম খুব মনখারাপ করত। সিনিয়ররা সান্ত্বনা দিত। আর ছিল ফুটবল খেলা।

■ ফুটবল খুব ভালোবাস?

❑ খুব। আমি তো আর্জেন্টিনার সমর্থক। ঠিক আর্জেন্টিনার নই, মেসির। মেসির ফ্যান আমি।

■ মেসির পুরো নাম জান?

❑ লিওনেল মেসি। বার্সেলোনার প্লেয়ার। ক্লাবটাকে সংক্ষেপে বার্সাও বলে।

■ যদি লিওনেল মেসি আর্জেন্টিনা টিমে না থাকতেন, তাহলে তুমি কোন দেশের সমর্থক হতে?

❑ ব্রাজিলের।

■ কেন?

❑ নেইমারের জন্যে।

■ ওদিকে তো ওয়ার্ল্ড কাপ জিতে নিল জার্মানি। সেটার কী হবে?

❑ সে নিক। আমি লাতিন আমেরিকার সমর্থক।

■ লাতিন শব্দটা কোত্থেকে এল? উত্তর আমেরিকা থাকলে, তার দক্ষিণ থাকবে। আছেও। এর মধ্যে লাতিন শব্দটা এল কেন? মানে কী লাতিনের?

❑ (চুপ থেকে) ভাষা?

■ উঁহু। আন্দাজে বোলো না।

❑ (চুপ)।

■ কিছুটা ঠিক বলেছ। লাতিন একটা ভাষা। ভাষাটার জন্ম ইতালিতে। ইতালি দক্ষিণ ইউরোপে। ক্রমে গোটা দক্ষিণ ইউরোপে লাতিন ভাষা ছড়িয়ে পড়ে। স্পেন, পর্তুগালেও। দক্ষিণ আমেরিকায় উপনিবেশ তৈরি করে মূলত স্পেন আর পর্তুগাল। ব্রাজিলের মতো দেশ বাদ দিলে বাকি সব দেশের ভাষা স্প্যানিশ। কেননা, ও-দেশগুলো স্পেনের উপনিবেশ ছিল। ব্রাজিলের ভাষা পর্তুগিজ। কেননা, ব্রাজিল ছিল পর্তুগালের উপনিবেশ। যেমন আমাদের দেশ ছিল ব্রিটিশদের উপনিবেশ। তাই আমাদের দেশে ইংরেজির প্রচলন বেশি। লাতিন থেকে দক্ষিণ ইউরোপের ভাষাগুলো এসেছে বলে দক্ষিণ ইউরোপকে বলে লাতিন ইউরোপ। আর দক্ষিণ ইউরোপের ভাষা স্পেন আর পর্তুগালের হাত ধরে দক্ষিণ আমেরিকায় চলে যায়, তাই দক্ষিণ আমেরিকার আরেক নাম লাতিন আমেরিকা। বুঝেছ এবার?

❑ হ্যাঁ।

■ ফুটবলের কথা, ভাষার কথাও হল। এবার বলো, এ ছাড়া কী ভালো লাগে তোমার? পড়তে কী ভালো লাগে?

■ অঙ্ক।

❑ কেন, অঙ্ক কেন ভালো লাগে?

■ চট করে মাথায় ঢোকে। বুঝিয়ে দিলে বুঝি।

❑ আর কী ভালো লাগে?

■ গল্পের বই পড়তে।

❑ সে কী! অঙ্কের সঙ্গে গল্পের কী করে মিল হল?

■ গল্পেও মজা আছে। কৌতূহল আছে। এরপর কী হবে, জানার আগ্রহ থাকে। অঙ্কেও সেটা আছে। ক্লাসরুমে কে আগে পারবে অঙ্কটা।

❑ অঙ্ক শিখে কী হয়?

■ অঙ্ক হল মূল বিষয়। অঙ্ক জানতেই হবে। এই যে বাড়ি যাই যখন, সবাই প্রথমে জানতে চায়, অঙ্কে কত পেয়েছি। সায়েন্স গ্রুপের সব বিষয়েই অঙ্ক লাগবে। এমনকী ভূগোলেও অঙ্ক।

❑ অঙ্ক ছাড়া আর কোন বিষয় ভালো লাগে?

আব্বা রাজমিস্ত্রি। নিয়মিত কাজে যান না। মা আশা প্রকল্পে কাজ করেন। (কিছুক্ষণ চুপ। মাথা নীচু। শুরু হয় তার কান্না। কাঁদতে কাঁদতে বলে) সংসার চলে মায়ের চাকরির ওই ক-টা টাকায়। তাতে কিছুতেই চলে না বলে মাকে বাড়িতে এমব্রয়ডারির কাজও করতে হয়।

■ ইতিহাস।

❑ কেন?

■ বর্তমানে যা-কিছু আছে, তার অতীতটা তো জানা দরকার।

❑ আর কী ভালো লাগে?

■ আঁকতে। যখন কাজ থাকে না, বোর হয়ে যাই, তখন ছবি আঁকতে বসি। আঁকা শেষ হলে আনন্দ হয়। এ ছাড়া বন্ধুরা মিলে ওয়ার্ড ফাইটিং খেলি।

❑ গল্পের বই পড়, বলছিলে। কী বই পড়েছ?

■ শার্লক হোমসের বই আছে। একজনের ছিল বইটা। খদ্দের খুঁজছিল। আমার এক বন্ধু শাহিদ আফ্রিদি। সে আর আমি দুজনে মিলে ভাগে কিনেছি। আরও অনেক বই পড়েছি। কাকাবাবু সমগ্র।

❑ ফাইভ থেকে সিক্সে উঠতে কত নম্বর পেয়েছিলে?

■ ৮২ শতাংশ। একটু কম পেয়েছিলাম। ফার্স্ট যে হয়েছিল, ক্যানিংয়ের সিরাজ হোসেন মোল্লা, পেয়েছিল ৮৮.৩ শতাংশ। তবে এ-বার ফার্স্ট টার্মে সেকেন্ড আর সেকেন্ড টার্মে ফার্স্ট হয়েছি। আশা করি, আরও ভালো রেজাল্ট করব ইনশাআল্লাহ্।

❑ তুমি নামাজ পড়?

■ হ্যাঁ। আমার তো বারো বছর বয়স হয়ে গেছে। রোজাও রাখি।

❑ কী হতে চাও তুমি?

■ ডাক্তার। তবে ছোটোবেলায় ভাবতাম, ঐতিহাসিক হব। মা বলেছেন, যদি পারিস তো ডাক্তার হ।

❑ পারবে?

■ ইনশাআল্লাহ্ পারব।

❑ তুমি তো অনেক কিছু জান। কী করে এতসব জানলে?

■ গুগল সার্চ করে। বাড়িতে গেলে দোকানে যাই। দশ টাকা দিলে এক ঘণ্টা সার্চ করতে দেয়।

❑ কী খেতে ভালোবাস?

■ যেকোনো ভাজা জিনিস।

❑ একশো টাকা পেলে কী করবে?

■ মাকে দেব।

❑ পঞ্চাশ টাকা পেলে?

■ রঙিন পেন কিনব, ছবি আঁকার।

❑ এক ঘণ্টা ছুটি পেলে কী করবে?

■ যদি বন্ধুরা ছুটি পায়, তখন সবাই মিলে ফুটবল খেলব। একা কিছু করা যায় না। ■

দুনিয়ায় এমন জাতি নেই, যাদের নিজস্ব রূপকথা উপকথা নেই। এই পাতায় থাকছে দেশ-বিদেশের সেইসব কাহিনির সচিত্র উপস্থাপনা। এই সংখ্যায় দক্ষিণ আফ্রিকার জুলুদের গল্প। লিখেছেন

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

দুই ভাইয়ের গল্প

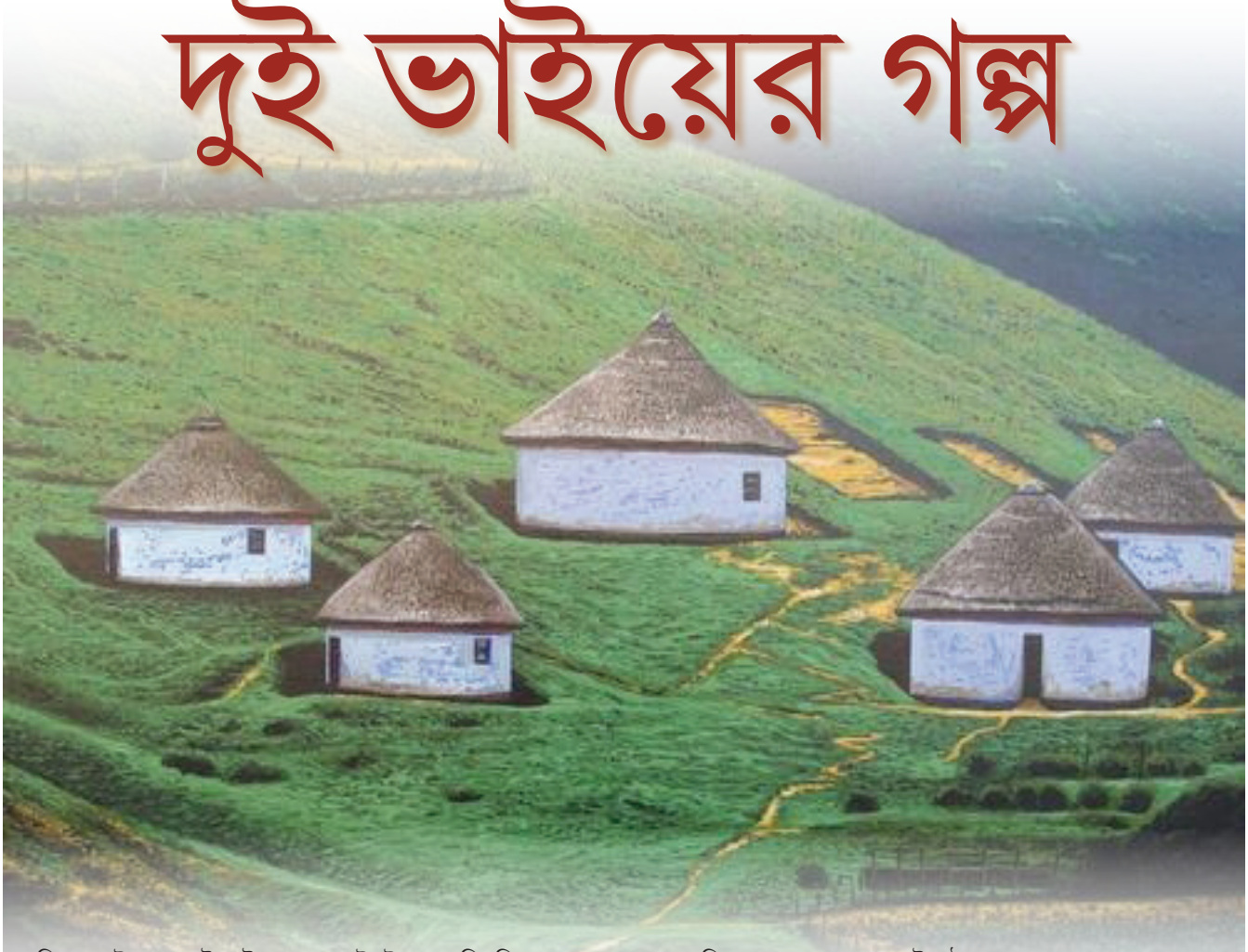

মুখিয়ার দুটো ছেলে দুই ভাই, সারাক্ষণ ছটফট করছে কিছুমিছু যা-হোক একটা শিকারে। তিরকশ ঝুলোনো পিঠে, সারাক্ষণ ঘুরছে বনে বনে— বাপ-মা মানা করে করে হার মেনেছে।

সক্কাল বেলা বাসি পচ্চি যা পায় খেয়ে বেরিয়ে পড়ে, গাঁয়ের বেলেমাটির পথ ছেড়ে খোঁচা ওঠা মাঠ, তারপর জঙ্গলের শুঁড়ি— যেতে যেতে পাখির ডাক জানোয়ারের গন্ধে গন্ধে এক-একদিন অজানিত ঢুকে যায় বিজুবনে; আলো থমথম করছে, চমকা দিয়ে এ-ডালের থেকে ও-ডালে উড়ে বসল একটা বনমোরগ, আর-একটু হলে পা পড়ে গিয়েছিল আলসে ঘুমে শুয়ে থাকা বোয়া সাপের চিত্রবিচিত্র পিঠটার ওপরে— ঈশ্‌শ্‌! ঠান্ডা দিয়ে ওঠে যেন বুকে।

নরম রাঙা হয়ে উঠেছে রোদ, খিদেতে ব্যথা করছে পেট, দেখে ছাড়া ছাড়া ঝাড়কাঁটায় ছাওয়া একটা অচেনা মাঠ— আগে তো আসিনি! কোন জায়গা এটা?

এমনি ভাবনায় চলতে চলতেই হঠাৎ সামনে পড়ে গেল— ও মা! একসার হাঁড়ি কে উপুড় করে রেখে গেছে রাস্তা আগলে? কী মুশকিল। এখন এগোও তো ডিঙিয়ে চলো।

লালপেট চিকচিকে হাঁড়ি। গাঁ-জন তো নেই কাছেপিঠে। কে রেখে গেল এমনি সাজিয়ে বিজুবনে?

বড়ো ভাই বলে, "ছুঁস নে রে ছোটো, কে জানে কী না কী আছে কার মনে। চল অন্য দিকে যাই, নয়তো ফিরেই যাই আজ, চল।"

কিন্তু ছোটোটার না-জানা জিনিসের 'পরেই যত বেয়াড়া টান। সে বলে, "কেউ তো নেই, উলটে দেখো না কেন দাদা কী আছে, কী রেখে গেছে হাঁড়ি চাপা দিয়ে।"

"যা খুশি করো তুমি, আমি নেই অকাজে।" বলে সে সত্যিই পিছু ফিরল। কিন্তু কী হয় না কী হয়, না দেখেও তো যাওয়া চলে না, খানিক তফাতে একটা ঝোপের আড়ালে সে দাঁড়িয়েই গেছে। আর দেখে ছোটো

ভাই ততক্ষণে বসে পড়েছে ওপাশের হাঁড়িটার গোড়ায়।

আর তুলেও ফেলেছে হাঁড়ি— কই, কিছু নেই তো চাপা! উলটে বসিয়েছে ফের— কই, ভেতরেও তো কিছু নেই!

তখন ফের পাশের হাঁড়িটা তোলে, সোজা করে বসায়— না, কিছুই নেই বাইরে ভেতরে।

এমনি পর পর উলটোতে উলটোতে শেষ হাঁড়িটা তুলেছে অবশেষে— আর সাত পা পিছিয়ে গেল হঠাৎ ঝটকা খেয়ে! বড়োসড়ো পুতুলের আকার এক বুড়ি, দিব্যি কাপড়চোপড়, কাঁধে ঝোলা— এক গাল হেসে বেরিয়ে আসছে হাঁড়ির নীচ থেকে—

না, সে নজরও করলে না ছোটোর দিকে, দূরে দাঁড়ানো বড়ো ভাইকে উদ্দেশ করেই বলে উঠল, "অমন ভয়-খাওয়া মেনির মতন কাঁপতে হবে না দাঁড়িয়ে, মারব না আমি। আর সাথে আসিস তো একটা আশ্চর্য জিনিসও দেখাব। আসবি তো আয়।"

কিন্তু বড়োর এমনই ভয় যে, লাগোয়া ঝোপটাই দুলছে তার কাঁপুনিতে।

বুড়ি বলে, "ভীতু কোথাকার! কার ছেলে তুই? কোন গাঁয়ে ঘর?"

এবারে চাইলে ছোটোর দিকে। "কী, তুই যাবি নাকি?"

বলার অপেক্ষা। সে তো পা বাড়িয়েই আছে।

তখন মাঠ জঙ্গল টুঁড়ে ঘুরে দুজনাতেই চলল তারা, চলছেই— হঠাৎ বিশাল এক মহীরুহ গাছ যেন পথ আগলে পড়ল।

পড়ুক আগলে, ওপাশ ঘুরে গেলেই হবে। কিন্তু বুড়ি দাঁড়িয়ে পড়েছে সেখানেই। দাঁড়িয়ে ঝুলি থেকে বের করে এনেছে খেলনা যন্তরের মতন একটা কুড়ুল। ছোটোর হাতে দিয়ে বলে, "যা তো কাট দিকি গাছটা!"

তারপর বলে, "না রে বাবা, গাছে উঠে ডাল কাটতে বলিনি। যদ্দূরে হাত যায়, গুঁড়িটা ফেঁড়ে ফেল সেখান থেকে। যা, দেরি করিসনি— "

খেলনা যন্তরের মতন কুড়ুল— কাটা যাবে এতে? যাই হোক, তাইতেই সর্বশক্তিতে ঘা দিয়ে গিঁথে ফেলল ছেলে কুড়ুলটা। তারপর যেই না টান দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়েছে— ও মা! ফাঁড়া জায়গাটা থেকে বেরিয়ে এসেছে মস্ত এক বলীবর্দ ষাঁড়— সে নেমে এসে শান্তমতো দাঁড়াল একটা পাশে।

হতচকিত হয়ে গেছে ছেলেটা। তো, বুড়ি অমনি চেঁচাচ্ছে পেছনে, "কী রে থামলি কেন, কাট? একটা বাড়ি মেরেই হয়ে গেল?"

হুঁশ পেয়ে তখুনি আবার আরেকটা বাড়ি মারলে গিয়ে সর্বশক্তিতে, তারপর গেঁথে যাওয়া কুড়ুলটা ছাড়িয়ে তুলতেই অমনি সেখান থেকে বেরিয়ে আসছে চিকন শামলি একটা গাই— নেমে এসে শান্তমতো দাঁড়াল একটা পাশে।

"মার, ফের মার!"

তো, আর বলার অপেক্ষা নয়। ছেলে একটার পর একটা এবারে মারতে লাগল ঘায়ের পর ঘা, আর গিঁথে যাওয়া কুড়ুল ছাড়িয়ে নেওয়া মাত্র কাটা জায়গা থেকে একটার পর একটা বেরিয়ে আসছে গোরু, নয়তো ভেড়া, নয় ছাগল— দেখতে দেখতে ছাগল ভেড়া গোরুর তিনটে পাল জমে উঠল মাঠে। গাছের গায়ে অনেক কুড়ুলের দাগ পড়েছে, কিন্তু বোঝা যায়, বছর ঘুরে গেলেও এ-ঘায়ে গাছ কাটা পড়বে না। তখন বুড়ি বলে, "থামো এবারে, তোমার মুরোদ বোঝা গেছে।"

"নাও, এবারে দাও দিকি আমার যন্তরটা।"

ছেলে ফিরে, দিলে কুড়ুলটা বাড়িয়ে। বুড়ি বলে, "নাও এবারে এই গাই-বলদ ভেড়া-ছাগল সব হাঁটিয়ে ঘরে নিয়ে যাও, আমি চলি।"

এমনই তাজ্জব লাগছে যে, মুখে শব্দ ফোটে না। বুড়ি যে কখন কোন পথে চলে গেল, তাও বুঝতে পারল না সে। খানিকটা এদিক সেদিক চেয়ে ঘুরে তারপর গাছের একটা ডাল ভেঙে পাতা মুড়িয়ে লাঠি বানিয়ে নিয়ে পুরো সেই দঙ্গলটাকে তাড়িয়ে নিয়ে চলল সে ঘরমুখো।

আর চলতে-চলতেই ফের এসে পড়ল সেই হাঁড়ি-পাতা মাঠ, দেখে ভাই বসে আছে তখনও ঝোপের পাশে, তো সে উচ্ছল হয়ে ছুটে যায়— "দেখ দেখ দাদা, কত্ত গোরু-ভেড়া", বলে সে এক-নিশ্বাসে বলতে থাকে কীভাবে সব পেল তার পুরো আশ্চর্য ঘটনা। "বল দাদা, সারা গাঁয়ের মিলিয়েও এত হবে এখন আমাদের মতন? কী আনন্দ হবে বল তো বাবা-মার?"

আনন্দ কি তাদেরই কম? আনন্দে ফুটতে ফুটতে দু-ভাই মিলে এবারে চালিয়ে নিয়ে চলল তিনটে আলাদা পাল। কিন্তু যাচ্ছে তো যাচ্ছে— "কদ্দূর এসে পড়েছিলুম বল তো আজ?"

খরা গ্রীষ্মের মাস। ফাটা মাটি, পোড়া ঘাস, হালকা হাওয়া— তেষ্টায় বুক ফাটছে, আবোলা জীবগুনোও থেকে থেকে চেঁচিয়ে উঠছে শুকনো গলায়। "ঠিক যাচ্ছি তো রে!"

ঠিকই তো। এই তো এসে পড়েছে পেল্লায় খাড়াই জায়গাটা— ও-পাশটা নেমে গেছে ওই পাতাল অন্ধকারে— মনে নেই?

কিন্তু খাড়াইয়ের মাথাতেই একটা হাওয়া উঠল, তাতে যেন জলসা একটা ছোঁয়া! জল আছে নিশ্চয় কাছেপিঠে। কিন্তু কোথায় জল? একদিকে তো খালি ঢেউ-দেয়া পাথুরে মাঠ। তা হলে, অন্যদিকে? সে তো সেই পাতাল খাদ! সে-দিকেই কিনারায় উপুড় শুয়ে গিয়ে বড়ো ভাই বলে ওঠে, "নদী! নদী রে ছোটো! দেখতে পাচ্ছিস? উই যে নীচে— "

অতখানি বিপুল খাড়াই জড়িয়ে আগাছা-লতা এক-এক জায়গাতে— কিন্তু কোনোখান দিয়েই বেয়ে নামা, বেয়ে ওঠা দুঃসাধ্য।

"নামবি কী করে? এতগুনো জন্তুকে ফেলেই-বা যাবি কী করে?"

"আচ্ছা, এক কাজ কর, বড়ো ভাই বলে তখন। বাউনি লতা কাট তো, একটা দড়ি বাঁধি। কোমরে বেঁধে তোকে নামিয়ে দি তারপর, তুই জল খেয়ে দড়ি টেনে নিশানা দিলে তোকে তুলব ফের টেনে। অমনি আমিও নামব, তুই তুলবি টেনে। পারবি না? আগে তো নিজেরা বাঁচি,

তারপর নয় ভাবব ওদের কথা।”

দড়ি বাঁধা হলে বড়ো ভাই বলে, “তেষ্টায় বুকটা জ্বলছে রে ছোটো, আমায়ই আগে নামা।”

বেশ, ছোটো ভাই তাকে নামিয়ে দিলে কোমরে ফাঁস বেঁধে। আকণ্ঠ জল খেয়ে সে উঠলে পরে তারপর ছোটোর পালা। তাকেও অমনি নামিয়ে দিলে বড়ো ভাই।

কিন্তু নামাবার পরেই হঠাৎ একটা দুর্বুদ্ধি ভর করলে তার মনে। আর সে ভাববারই কেবল অপেক্ষা! আচমকা তখুনি সে ছেড়ে দিলে হাতের দড়িগাছা— আর পুরো দড়ি গোল পাকিয়ে নীচে আছড়ে পড়ল চোখের নিমিষে।

অতটা নীচ থেকে কে চেঁচালে, কে কী বললে— কে আর সে শুনছে। ভাইকে সেখানেই বিসর্জন দিয়ে পুরো পশুর দঙ্গাল চালিয়ে নিয়ে জোর পায়ে হাঁটা তখন খালি ফেরা পথে। বাবা-মা দাঁড়িয়েই ছিল গাঁয়ের সীমানাতে— ছুটে গিয়ে বলে, “দেখো, দেখো, কত্ত দিয়েছে আমাদের জঙ্গালের দেব্‌তা।”

“এই এত দিলেন? কোথায় দেখা পেলি দেবতার?”

“ঘোর বিজুবনে ঢুকে গিয়েছিলাম যে নেশায় নেশায়, হঠাৎ— ”

“আর তোর ছোটো ভাই? ছোটো?”

“কেন, ফেরেনি ভাই? সে তো মাঝপথেই বললে পায়ে ব্যথা করছে, হাঁটতে পারছে না। আমি বললুম, ফিরে যা তা হলে তুই। সে তো ভালোমতো দুপুরই হয়নি তখনও। ফেরেনি?”

“কে জানে, ফেরা পথে হয়তো ফের অন্য পথে ঢুকে গেছে শিকারের গন্ধে।”

গোটা রাতেই সে ফিরল না।

বাপ-মা ভাবলে, হয়তো রাত হয়ে গেছে বলে কাটিয়েছে কোথাও

গাছে-মাছে উঠে। ফিরবে দিন হলে পরে।

কিন্তু সক্কাল বেলা গাঁয়ের মেয়েরা কুয়োয় জল তুলতে গিয়ে শোনে কাছে কোথায় একটা মৌটুসি ডাকছে ঘন ঘন। এখন, তারা জানে, মৌটুসি ডাকে কোথায় মধু আছে তার জানান দিতে, ডাক ঠাওর করে যেতে পারলে মধুর নিশানা মিলে যায়— তখুনি ঘরে গিয়ে পুরুষদের তারা বলে, “মৌটুসি ডাকতে লেগেছে সেই থেকে, তাড়াতাড়ি বেরোও তো বেরোও, দেখো পাখিটা কোথায়, কোন দিকে যেতে বলে— ”

অনেকেই বেরোল এ ওর দেখাদেখি, সেই দু-ভাইয়ের বাবাও।

ডাক শুনে শুনে

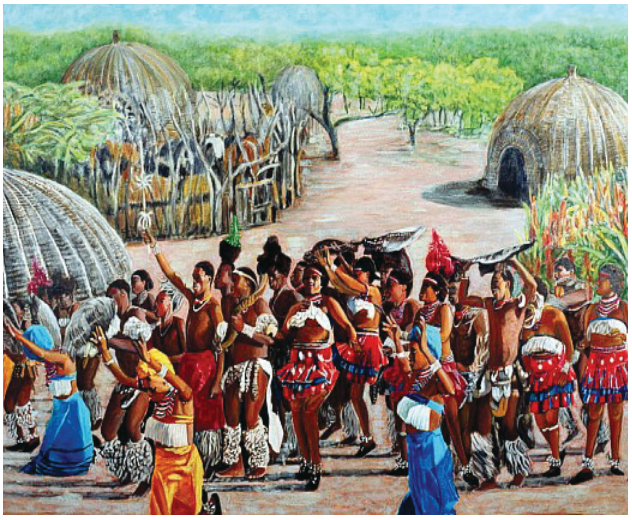

তারা গেল অনেকটাই পথ, রোদও চড়ে উঠল— কিন্তু না পাখি না মধু কিছুরই দিশা দেখা যায় না। তখন একজন বলে, “হাঁফ লাগছে গো মশায়। বেলাও তো হল, এরপরে ফিরবে কেমন করে?”

দোনোমোনো করছে সব— হারা উদ্দেশে আর না গিয়ে এবারে ফিরবে কি না— আর পাখি ছটফটিয়ে হঠাৎ উড়ে উঠল একেবারে মাথার ওপরে, তখ্‌খুনি আর দেখা নেই, কিন্তু উপুরিউপুরি খালি ডাক আর ডাক—

ধন্দে পড়ে গেল লোকগুনো। মনে হচ্ছে পাখিটা চাইছে আরও যাই। তা হলে যা থাকে বরাতে, চলো এগোই আরও খানিক।

যেতে যেতে ততক্ষণে এসে পড়েছে পাথুরে মাঠ, আর আর-একদিকে পেল্লায় খাড়াই সে-জায়গাটা, সচরাচর আসে না কেউই সেখানে— খাড়াই নেমে গেছে যেন পাতালে— হঠাৎ শোনে, মানুষের গলা না? একটা কচি ছেলে যেন চেঁচাচ্ছে না উই নীচ থেকে? বাপ গিয়ে খাড়াইয়ের কিনারাতে গিয়ে উপুড় শুয়ে নীচে ঝুঁকে দেখে, খাড়াইয়ের গায়ে আগাছা লতার জঙ্গাল এক-এক জায়গায়, বাকি নেড়া আর ফাঁক দিয়ে দেখা যায় নদী বইছে অনেক নীচে— আর

ওই তো পড়ে বসে চেঁচাচ্ছে একটা ছেলে— ছোটো না? হ্যাঁ, তারই মতো, ওই তো তারই তো ছেলে!

বাউনি লতা কেটে পাকিয়ে দড়ি বানাল তারা বসে, তরপর নামিয়ে দিল নীচে অবধি। আর কতক্ষণের মধ্যেই ছেলে উঠে এল। এসে এক-নিশ্বাসে বলতে থাকে কালকের ভরদিনের আশ্চর্য, আর সারারাতের কাঁপুনি ভয়ের কথা।

“এত বড়ো বজ্জাত নাকি বড়ো ছেলেটা!” বাপ আগুন হয়ে ওঠে। তো আর-পাঁচজনেও তাদের মনের তাপ চাপতে পারে না।

কিন্তু ঘরে ফিরে শোনে বড়োকে দেখা যাচ্ছে না অনেকক্ষণ, মা খেতে ডেকে, গলা করে চেঁচিয়েও তার সাড়া পায়নি।

কে জানে কী আঁচ পেয়েছিল আগে থাকতে, বড়ো আর ফিরলই না।

আর পাথরের মতন নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকা অতখানি পশুর দলটা? ছোটো বলে, “বাবা, বুড়ি যা দিয়েছে সে দেবতারই দান— এক ঘরে কি রাখা যায় এত?” বলে সে গাঁয়ের সব্বার সঙ্গে ভাগ করে নিলে অতগুনো মহামূল্য পশুপ্রাণী, সারা গাঁয়েরই অভাব নিরসন হয়ে গেল চিরতরে—

আর আমার কথাটিও ফুরোল, যদিও নটে গাছ, না মুড়িয়ে, বাড়তেই লাগল সামনে, আর উঠোনের কোণে নিত্যি ভেসে উঠতে লাগল একটা মৌটুসির ডাক। দিন তো যায়, কিন্তু ডাক আর থামে না। ■

বিচিত্র এই বিশ্বে কত তথ্য আর তত্ত্ব, তার সীমা নেই শেষ নেই কোনো। এই বৈচিত্র্যের কারণে জগৎ অপার আনন্দময় ও বিস্ময়ের। এসবের কোনোটা সংবাদ শিরোনামে আসে কোনোটা আসে না। এমনই সব গুরুত্বপূর্ণ টুকরো খবর নিয়ে এই পাতা। লিখছেন

ফরিদা নাসরিন

ডোম অফ দি রক

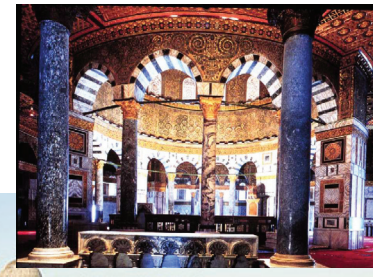

আত্মার কূপ।

গাজায় এখন আগুন জ্বলছে। ইসরায়েলি সেনার তাণ্ডব কবে থামবে, নাকি গাজার ফিলিস্তিনি জনপদটি নিশ্চিহ্ন না-করে থামবে না, কেউ আমরা জানি না। আসুন, এমন অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে আশ্চর্য একটি ইসরায়েলি শহরকে আমরা দেখি।

জেরুসালেম। এটির উৎস হিব্রু শব্দ 'ইয়েরুসালেম', অর্থ হল শান্তির পবিত্র ভূমি। আরবিতে শহরটির নাম আল-কুদস, মানে শান্তির অভয়ারণ্য। পৃথিবীর প্রাচীন শহরগুলোর একটি। ইসলাম, খ্রিস্টান আর ইহুদি— পৃথিবীর তিনটি প্রধান ধর্মের, আসলে দুনিয়ার সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষের, পবিত্র ভূমি এই শহর। গোটা শহরটি নয়, যেটাকে 'ওল্ড সিটি' বলা হয়, প্রাচীর-ঘেরা সেই অংশটিই ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুসলমান— এই তিন সম্প্রদায়ের কাছেই পবিত্র ভূমি, যার বারোটি দরজা রয়েছে, চারটি স্থায়ীভাবে বন্ধ। খোলা দরজাগুলোর নাম— জাফা গেট, জিয়ন গেট, দুঙ্গা গেট, গোল্ডেন গেট, হেরড'স গেট, দামাস্কাস গেট, লায়নস গেট এবং দ্য নিউ গেট। 'ওল্ড সিটি'টি রয়েছে মাউন্ট মরিয়া বা টেম্পল মাউন্ট নামে এক পাহাড়ের ওপর। জেরুসালেমের প্রাচীন অংশটি চার ভাগে বিভক্ত। মুসলিম কোয়ার্টার, ইহুদি কোয়ার্টার, আর্মেনিয়ান কোয়ার্টার আর খ্রিস্টান কোয়ার্টার।

কেন এই অংশটি দুনিয়ার একেশ্বরবাদীদের কাছে পবিত্রতম?

এই মাউন্ট মরিয়াতেই ১৮৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে হজরত ইব্রাহিম (আ.) তাঁর পুত্র ইসমাইলকে (আ.) আল্লাহ্‌র নির্দেশে কুরবানি করতে চেয়েছিলেন, পরে যেখানে তৈরি হয়েছে 'ডোম অফ দ্য রক' বা 'কুব্বত আস-সাখরাহ'। এখানেই প্রথম উপাসনাস্থল তৈরি করেন রাজা সুলাইমান ৯৬২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে, যেখানে পরে নির্মিত হয়েছে আল-আকসা মসজিদ। মিরাজের সময় এটিই ছিল হজরত মহম্মদের (স.) বিশ্রামস্থল। এবং, ৬১০ থেকে ৬২৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই স্থানটিই ছিল ইসলামবিশ্বাসীদের কিবলা। পরে কিবলা ঘুরে যায় কাবার দিকে।

টেম্পল মাউন্টের প্রায় প্রতিটি স্থাপত্য নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। তার কারণ, উল্লিখিত তিনটি ধর্মেরই উৎস এক। আর তাই, টেম্পল মাউন্টকে চারটি অংশে বিভক্ত করেও কিছু বিতর্ক আজও জারি আছে।

এখানকার সবচেয়ে আকর্ষণীয় স্থাপত্য কুব্বত আস-সাখরাহ বা ডোম অফ দ্য রক। মনে রাখতে হবে, ডোম অফ দ্য রক কিন্তু মসজিদ নয়। কাবা শরিফের মূল কক্ষটি যেমন, এটিও তেমনই একটি পবিত্র স্থান। এর ভেতরে রয়েছে একটি পাথর, যা মিরাজের সময় প্রিয় নবি (স.) বেহেস্ত থেকে এনেছিলেন। ৬৯১ খ্রিস্টাব্দে আট-কোনা-বিশিষ্ট স্থাপত্যটি তৈরি করেন উমাইয়া খলিফা আবদ আল-মালিক। বহুবার এটি নষ্ট আর সংস্কার হয়েছে। সবচেয়ে বড়ো সংস্কার হয়েছে তুরস্কের সম্রাট সুলাইমানের দ্বারা, যাঁকে ইতিহাসে সব সময় উল্লেখ করা হয় 'সুলাইমান দ্য ম্যাগনিফিসেন্ট' নামে। প্রায় দুশো বছর ক্রুশেডকারীদের দখলে ছিল ডোম অফ দ্য রক এবং পাশের মসজিদ আল-আকসা। বলতে গেলে এটিই ছিল তাদের হেড কোয়ার্টার। পরে ১১৮৭ খ্রিস্টাব্দে পারস্যরাজ আস-সালাহ আল-দিন এটি পুনর্দখল করেন। তারপর থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত এটি মুসলমান অধিকারে থাকে। তবে শেষ বড়ো সংস্কার হয়েছে জর্ডনের রাজা হুসেনের দ্বারা। তিনিই

ডোম অফ দি রকের অন্দরসজ্জা।

আশি কিলোগ্রাম সোনা দিয়ে এর গম্বুজটি মুড়ে দেন।

এখন এটি ইসরায়েলের অংশ। তবে টেম্পল মাউন্টের মুসলিম কোয়ার্টার, যেখানে রয়েছে আল-আকসা মসজিদ এবং ডোম অফ দ্য রক, তার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব এখন জর্ডনের ওয়াকফ দপ্তরের হাতে।

মেঘ

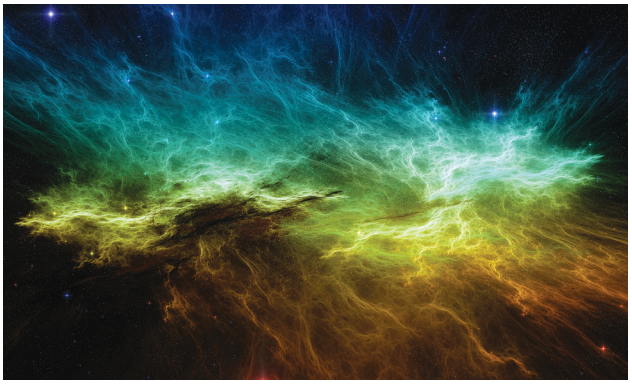

নেবুলা।

নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা। এ-দৃশ্য শরৎকালের বাংলায় অতিপরিচিত। মেঘকে নিয়ে কত কল্পনা, কত কবিতা। 'মেঘদূত' নামে সংস্কৃত ভাষায় একটি জগদ্‌বিখ্যাত কাব্যও রয়েছে কালিদাসের। দেখাই যাচ্ছে, মেঘ আমাদের কল্পনাশক্তি উসকে দেয়। কিন্তু মেঘ জিনিসটা কী?

মেঘ হচ্ছে কোনো গ্রহ বা উপগ্রহের আবহমণ্ডলে ভেসে বেড়ানো স্ফটিক অথবা জলকণার সমষ্টি, যা দেখতে পাওয়া যায়। মহাশূন্যে ভাসমান ইন্টারসেলার মেঘ অর্থাৎ নেবুলাকেও মেঘ বলা যেতে পারে। আবহাওয়া বিজ্ঞানে মেঘবিজ্ঞান নিয়ে পড়ার এবং গবেষণার সুযোগ আছে। বিষয়টির নাম— নেফোলজি।

মেঘ মোটের ওপর চার রকমের। এক: উঁচু মেঘ, দুই: মধ্য উচ্চতার মেঘ, তিন: নীচু মেঘ, চার: উলম্ব মেঘ। মেঘের উচ্চতা তার নীচের অংশ দিয়ে মাপা হয়। চূড়ার অংশ দিয়ে নয়। সবচেয়ে নীচের মেঘের উচ্চতা বড়োজোর সাড়ে ছ-হাজার ফুট। পাঁচশো ফুট নীচেও মেঘ নামতে পারে। এমনকী, তারও নীচে, একেবারে মাটি ঘেঁষে। তবে, তখন আমরা তাকে মেঘ বলি না। বলি, কুয়াশা।

মেঘ যখন কুয়াশা।

ইবোলা

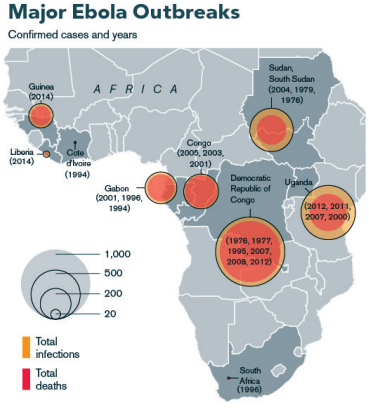

আমরা যখন এনসেফেলাইটিস নিয়ে ব্যতিব্যস্ত, বহু মানুষের প্রাণ যাচ্ছে এই রোগে, সেই সময় হঠাৎ একটা অচেনা মারণ অসুখ এসে ঘাড়ের ওপর পড়ল। কী তার নাম? ইবোলা।

এমন নাম তো শুনিনি। কোত্থেকে এল রোগটা? ইবোলা হলে কী হয়? কিছুই জানি না। কিন্তু এসে যখন পড়েছে, তখন আগন্তুককে তো জানতে হবে। না জানলে আমাদেরও বিপদ হতে কতক্ষণ!

ইবোলার জীবাণুবাহী বাদুড় মেরে ফেলা হচ্ছে।

খবরে পড়ছি, যেসব যাত্রী কঙ্গো বা নাইজেরিয়া বা সিয়েরা লিওন প্রভৃতি দেশ থেকে দমদম এয়ারপোর্টে নামবেন, তাঁদের দেহে ইবোলা ভাইরাস আছে কি না, পরীক্ষা না করে শহরে ঢুকতে দেওয়া হবে না। তা-ই নাকি? ইবোলা ভাইরাস কতটা মারাত্মক?

১৯৭৬ সালে একটা অদ্ভুত জ্বর দেখা দেয় জাইরে আর সুদানে। প্রথমে জ্বর। তারপর গলায় পেশিতে ব্যথা। প্রচণ্ড মাথাব্যথাও হয়। একে একে আসে বমির আর ডায়েরিয়ার উপসর্গ। লিভার আর কিডনিকে অকেজো করে দেয়। বুঝতে বুঝতেই বহু লোক মারা যায়। কেননা, রোগটার মারণক্ষমতা শতকরা ৫০ থেকে ৯০ শতাংশ। তৎকালীন জাইরে (এখন কঙ্গো)-র ইয়ামবুকু শহরে প্রথম শনাক্ত করা গিয়েছিল নতুন ভাইরাসকে। ইয়ামবুকু শহরের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে ইবোলা নদী, তাই ভাইরাসটির নাম ইবোলা। ক্রমে রোগটা ছড়িয়ে পড়ে আশপাশের দেশে, সাব-সাহারান আফ্রিকার দেশগুলোতে। সেখান থেকে পশ্চিম আফ্রিকার কয়েকটি দেশে।

ইবোলা আক্রান্তদের চিকিৎসায় বিশেষ সাবধানতা।

২০১৪ সালে এটি ছড়িয়ে পড়েছে কঙ্গো, গিনি, লাইবেরিয়া, নাইজেরিয়া, সিয়েরা লিওনের বিস্তীর্ণ এলাকায়। ২০১৪ সালের আগস্ট মাসে শুধু নাইজেরিয়াতেই ১৩২০ জনকে চিহ্নিত করা গেছে, যাদের ইবোলা হয়েছে। অর্থাৎ রোগটি ছড়িয়ে পড়ছে দ্রুত।

কোথা থেকে এল অসুখটি? ডব্লুএইচও (বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা)-র বিশেষজ্ঞ-দল পরীক্ষা চালিয়ে দেখেছে, মূলত বাঁদর আর বাদুড়ের শরীর এই ভাইরাসটির উৎস। তবে সব জাতের ইবোলা ভাইরাস মারাত্মক নয়। যেমন বাংলা দেশের বাদুড়ের শরীরের ইবোলা ভাইরাস বলতে গেলে সুপ্ত। তাই বলে অসতর্ক থাকলে চলবে না। পৃথিবী এখন গ্লোবাল ভিলেজ। সর্বদা সবাই সব জায়গায় যাচ্ছে। ইবোলা ভাইরাসেরও এক দেশ থেকে আরেক দেশে যেতে বাধা তো নেই, বা এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে! তাই, ইবোলা হতে সাবধান! ■

রোগীর কাছে যাওয়ার আগে প্রস্তুতি।

স্কলারশিপের আরও কিছু

মেধার মূল্য জগৎময়। বন্ধুর মতো হাত মেধাবী আর মেধাবিনীর দিকে বাড়ানো আছে সবখানে। সে-হাত ধরে এগিয়ে যেতে হবে, পৌঁছোতে হবে সোনার শিখরে। যারা নিঃসহায়, তাদের চলার পথে আলোর শিখা নিয়ে দাঁড়িয়ে অনেক সুজন। স্কলারশিপ যেন এমনই বন্ধুর হাত আর সুজনের শিখা, যার সুলুকসন্ধান এই বিভাগে।

মহম্মদ মহসীন আলি

বাবুলাল নাগরমল সাতনালিকা ফাউন্ডেশন স্কলারশিপ

গরিব মেধাবী যেসব ছাত্রছাত্রী অর্থের অভাবে পড়াশোনা করতে পারছে না, তাদের বাবুলাল নাগরমল সাতনালিকা ফাউন্ডেশন থেকে এই স্কলারশিপ প্রদান করা হয়। ভারতবর্ষের স্থায়ী নাগরিক দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পাঠরত ছাত্রছাত্রীরা এই স্কলারশিপের জন্য আবেদন করতে পারবে। পূরণ করা আবেদনপত্র প্রয়োজনীয় নথিপত্রসহ ৩১-১২-২০১৪ তারিখের মধ্যে নির্দিষ্ট ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

যোগ্যতা

ক. দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পাঠরত ছাত্রছাত্রীরাই কেবল আবেদন করতে পারবে।
খ. সর্বশেষ পরীক্ষার নম্বর ৮০ শতাংশ বা তার বেশি হতে হবে।
গ. পারিবারিক বার্ষিক আয় ৬০ হাজার টাকার মধ্যে হতে হবে।

আবেদনের পদ্ধতি

অনলাইনে অর্থাৎ www.bnsatnalikafoundation.org ওয়েবসাইট থেকে আবেদনপত্র ডাউনলোড করে প্রয়োজনীয় নথিপত্রসহ তা পূরণ করে নির্দিষ্ট ঠিকানায় পাঠাতে হবে। উক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনেও আবেদন করার সুবিধা রয়েছে।

প্রয়োজনীয় নথিপত্র

ক. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানের কাছ থেকে বোনাফাইড সার্টিফিকেট।
খ. সর্বশেষ পরীক্ষার মার্কশিটের প্রত্যয়িত নকল।
গ. রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট।
ঘ. ইনকাম সার্টিফিকেট।
ঙ. ব্যাঙ্কের পাস বইয়ের জেরক্স।

যোগাযোগ

Babulal Nagarmal Satnalika Foundation
C/O: Mr Debi Prasad Satnalika
92 M G Road, Raniganj, Dist.: Burdwan 7133 471
Ph.: (+91) 7679635152
e-mail: contactus@bnsatnalikafoundation.org
niraj.satnalika@bnsatnalikafoundation.org

নেশন ওয়াইড এডুকেশন অ্যান্ড স্কলারশিপ টেস্ট

একটি যোগ্যতা নির্ণায়ক পরীক্ষার মাধ্যমে এই স্কলারশিপ প্রদান করা হয়। এই স্কলারশিপের তিনটি বিভাগ রয়েছে। দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগে পাঠরত ছাত্রছাত্রীরা NEST-Junior হিসেবে বিবেচিত হয়। এমবিবিএস, বিএএমএস, বিএইচএমএস, বিইউএমএস, বিডিএস, বিসিএ এবং বিএসসি (সমস্ত) প্রথম এবং দ্বিতীয় বর্ষে পাঠরত ছাত্রছাত্রীরা ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং ফাইনাল ইয়ারে পাঠরত ছাত্রছাত্রীরা NEST-I বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। এমবিবিএস, বিএএমএস, বিএইচএমএস, বিইউএমএস, বিডিএস, বিসিএ এবং বিএসসি (শুধুমাত্র কম্পিউটার এবং আইটি) তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষের ছাত্রছাত্রীরা NEST-II বিভাগের অন্তর্ভুক্ত।

NEST-Junior

দশম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা ৫০০ টাকা রেজিস্ট্রেশন ফি বাবদ এই স্কলারশিপ পরীক্ষার জন্য নাম নথিভুক্ত করতে পারবে। এ-বছর ১০০ টাকা লেট ফি-সহ ৩১ মার্চ এবং ২০০ টাকা লেট ফি-সহ ৩০ জুন পর্যন্ত অনলাইনে আবেদনের সুযোগ ছিল। রেজিস্ট্রেশান ফি 'SEMCI INDIA' নামে একটি ডিমান্ড ড্রাফটের মাধ্যমে পাঠাতে হয়। প্রতিটি রাজ্যের রাজধানী শহর এবং অন্যান্য বড়ো শহরগুলিতে পরীক্ষাকেন্দ্র থাকে। তবে কোনো পরীক্ষাকেন্দ্রে ১০০-র কম সংখ্যক পরীক্ষার্থী হলে পরীক্ষাকেন্দ্র পরিবর্তিত হতে পারে। বাছাইকৃত প্রতিটি ছাত্রছাত্রীকে ২০ হাজার টাকা করে স্কলারশিপ প্রদান করা হয়। তা ছাড়া ৪০ শতাংশের ওপর নম্বর প্রাপক প্রতিটি ছাত্রছাত্রীকে একটি করে শংসাপত্র প্রদান করা হয়।

সিলেবাস

সাধারণত সিবিএসই, আইসিএসই এবং অন্যান্য রাজ্যের বোর্ড অনুমোদিত এসএসসি এবং এইচএসসি বই থেকেই প্রশ্নপত্র তৈরি করা হয়।

পরীক্ষার চারটি বিভাগ নিম্নরূপ

বিভাগ	বিষয়	প্রশ্ন সংখ্যা	নম্বর
ক	ফিজিক্স এবং কেমিস্ট্রি	৫০	৫০
খ	ম্যাথমেটিক্স/বায়োলজি	৫০	৫০
গ	ইংরেজি ভাষা	৫০	৫০
ঘ	লজিক এবং জিকে	৫০	৫০
মোট	সমস্ত বিভাগের সময় ২ ঘণ্টা	২০০	২০০

NEST-I

এমবিবিএস, বিএএমএস, বিএইচএমএস, বিইউএমএস, বিডিএস, বিসিএ এবং বিএসসি (সমস্ত) প্রথম এবং দ্বিতীয় বর্ষে পাঠরত ছাত্রছাত্রীরা ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং ফাইনাল ইয়ারে পাঠরত ছাত্রছাত্রীরা NEST-I বিভাগে স্কলারশিপ পরীক্ষার জন্য আবেদন করতে পারে। নাম নথিভুক্তির জন্য 'SEMCI INDIA' নামে ৬০০ টাকার ডিমান্ড ড্রাফট জমা দিতে হয়। এ-বছর অতিরিক্ত ১০০ টাকা দিয়ে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদনের সুযোগ ছিল। এবং অতিরিক্ত ২০০ টাকা দিয়ে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন করার সুযোগ পাওয়া যাবে। অনলাইনে বা বিভাগীয় ওয়েবসাইট থেকে আবেদনপত্র ডাউনলোড করেও আবেদন করার ব্যবস্থা আছে। পরীক্ষার মাধ্যমে বাছাইকৃত প্রতিটি ছাত্রছাত্রীকে ২৫ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়। সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপককে দেওয়া হয় ৭৫ হাজার টাকা। ৪০ শতাংশ বা তার বেশি নম্বর প্রাপক প্রতিটি ছাত্রছাত্রীকে শংসাপত্র দেওয়া হয়।

সিলেবাস

প্রশ্ন থাকে অবজেক্টিভ, মাল্টিপল চয়েস, শূন্যস্থান পূরণ এবং না/হ্যাঁ টাইপের। এই পরীক্ষা নিম্নলিখিত পাঁচটি বিভাগে সংঘটিত হয়:

বিভাগ	বিষয়	প্রশ্ন সংখ্যা	নম্বর
ক	ফিজিক্স এবং কেমিস্ট্রি (একাদশ এবং দ্বাদশ অ্যাডভান্স লেভেল)	৫০	৫০
খ	ম্যাথমেটিক্স/বায়োলজি (একাদশ এবং দ্বাদশ অ্যাডভান্স লেভেল)	৫০	৫০
গ	ভারবাল অ্যাপটিউড (ইংরেজি ভাষা)	৫০	৫০
ঘ	লজিক থিঙ্কিং (রিজনিং)	২৫	২৫
ঙ	জেনারেল নলেজ	২৫	২৫
মোট	সমস্ত বিভাগের সময় ২ ঘণ্টা	২০০	২০০

NEST-II

এমবিবিএস, বিএএমএস, বিএইচএমএস, বিইউএমএস, বিডিএস, বিসিএ এবং বিএসসি (শুধুমাত্র কম্পিউটার এবং আইটি) তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষের ছাত্রছাত্রীরা NEST-II বিভাগে স্কলারশিপ পরীক্ষার জন্য আবেদন করতে পারে। পরীক্ষার মাধ্যমে বাছাইকৃত প্রতিটি ছাত্রছাত্রীকে ৩৫ হাজার টাকা করে প্রদান করা হয়। সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপককে ১ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়। এ ছাড়া ৪০ শতাংশ বা তার বেশি নম্বর প্রাপক প্রতিটি ছাত্রছাত্রীকে একটি শংসাপত্র দেওয়া হয়।

সিলেবাস

এখানেও NEST-I-এর মতোই প্রশ্ন থাকে অবজেক্টিভ, মাল্টিপল চয়েস, শূন্যস্থান পূরণ এবং না/হ্যাঁ টাইপের। এখানেও পরীক্ষার উপরোক্ত পাঁচটি বিভাগ রয়েছে।

যোগাযোগ

The Director
C/O: SEMCI INDIA, B-I, Piccadilly Flats
57-J Clare Road, Byculla, Mumbai 900 008
Ph.: 022- 6529 2506/6529 2507
e-mail: info@nest.net.in

দি কালচারাল ট্যালেন্ট সার্চ স্কলারশিপ

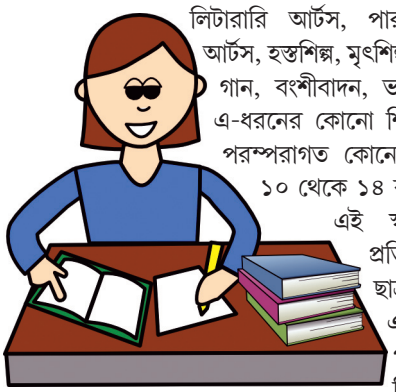

লিটারারি আর্টস, পারফর্মিং আর্টস, ভিজুয়াল আর্টস, হস্তশিল্প, মৃৎশিল্প, কারুশিল্প, চারুশিল্প, নাচ, গান, বংশীবাদন, ভাস্কর্য, চিত্রশিল্প ইত্যাদি— এ-ধরনের কোনো শিল্পে নিপুণ বা পরিবারের পরম্পরাগত কোনো শিল্পে বিশেষভাবে দক্ষ ১০ থেকে ১৪ বছর বয়সি ছেলেমেয়েদের এই স্কলারশিপ দেওয়া হয়। প্রতিযোগিতায় বাছাইকৃত ছাত্রছাত্রীদের প্রথমে ২ বছর এই স্কলারশিপ দেওয়ার পর পারদর্শিতার অগ্রগতি বিবেচনা করে নবীকরণ করা হয়। প্রথম ইউনিভার্সিটি ডিগ্রি বা ২০ বছর বয়স পর্যন্ত (যেটা আগে হবে) এই স্কলারশিপ প্রদান করা হয়ে থাকে।

বয়স

সাধারণত ১০ থেকে ১৪ বছর বয়সি ছাত্রছাত্রীরা আবেদন করতে পারে। তবে অনন্যসাধারণ দক্ষ ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে নিম্নসীমার বয়সে ২ বছর পর্যন্ত ছাড় দেওয়া হয়ে থাকে।

যোগ্যতা

ক. ছাত্রছাত্রীকে কোনো অনুমোদিত স্কুলে পাঠরত হতে হবে।
খ. ট্র্যাডিশনাল কোনো শিল্পের প্রদর্শন করে বা অভিনয় করে, সেইসব বাড়ির ছেলেমেয়েরা যদি দক্ষতার সঙ্গে এইসব প্রদর্শন করতে পারে, তাহলে তাদের এই স্কলারশিপে আবেদনের সুযোগ দেওয়া হয়।
গ. যদি কোনো ছেলেমেয়ে গুরুর কাছে বা কোনো প্রতিষ্ঠানে ৩ বছর বা তার বেশি এ-ধরনের সাংস্কৃতিক শিক্ষা গ্রহণ করে, তাহলে তারাও আবেদন করতে পারবে।

আবেদনের পদ্ধতি

বিভাগীয় ওয়েবসাইট www.ccrtindia.gov.in থেকে আবেদনপত্রের খসড়া পাওয়া যায়। গুরু, বাবা-মা বা অভিভাবকদের এ-আবেদনপত্র পূরণ করে জমা করতে হয়। একটিমাত্র ক্ষেত্র বা বিষয়ের জন্যই শুধু আবেদন করা যাবে। একই গুরুর কাছে শিক্ষাপ্রাপ্ত সর্বোচ্চ ৩ জন এই স্কলারশিপের জন্য আবেদন করতে পারবে। তবে একই গুরু ভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদান করলে এক-একটি প্রতিষ্ঠান থেকে সেই গুরুর শিক্ষাধীন ৩ জন করে আবেদন করতে পারবে।

নথিপত্র

ক. উপজাতি (ST) বা বিশেষভাবে সক্ষম (PH) ছাত্রছাত্রীরা সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তির কাছ থেকে ST এবং PH শংসাপত্র জোগাড় করবে।
খ. আর্টস বিভাগে আবেদন করলে গুরুর কাছ থেকে একটি শংসাপত্র জোগাড় করে আবেদনপত্রের সঙ্গে জমা দিতে হবে। সেই পত্রে প্রশিক্ষণ বিষয়ক খুঁটিনাটি সবকিছু পরিষ্কার লেখা থাকবে।
গ. গুরুর বায়োডাটাও নির্দিষ্ট খসড়ায় পূরণ করে আবেদনপত্রের সঙ্গে জমা দিতে হবে।

ঘ. অঙ্কন বিভাগে আবেদনের জন্য আবেদনপত্র এবং গুরুর বায়োডাটার সঙ্গে সর্বশেষ আঁকার তিনটি কপি (আসল অথবা ফোটোকপি বা ফোটো) গুরুর অ্যাটেস্টেড করে জমা দিতে হবে।

ঙ. কারুশিল্প বা ভাস্কর্য বিভাগে আবেদন করলে সাম্প্রতিক কোনো কাজের ছবি গুরু অথবা শিক্ষকের অ্যাটেস্টেড করে গুরু অথবা শিক্ষকের বায়োডাটাসহ জমা দিতে হবে।

বাছাইপদ্ধতি:

সমস্ত আবেদনপত্র বিচার বিশ্লেষণ করে ৬২০ জনকে ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাক মারফত চিঠি পাঠিয়ে জানানো হবে। ২০১৫-র মে থেকে জুলাই মাসের মধ্যে ইন্টারভিউয়ের তারিখ ধার্য করা হয়েছে। মাসিক ৬ হাজার টাকার কম আয় যেসব পরিবারের, তাদের ছেলেমেয়েদের বাছাইয়ে প্রাধান্য দেওয়া হয়। বংশপরম্পরাগত এইসব শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ছেলেমেয়েদেরও বাছাইয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে।

পুরস্কার

বাছাইকৃত ছাত্রছাত্রীদের মাসে ৩০০-৪০০ টাকা করে দেওয়া হয়।

যোগাযোগ

The Cultural Talent Search Scholarship
15-A, Sector 7, Pappankalan, Dwarka
New Delhi 110 075
Ph.: (011) 2508 8638, 2530 9300
Fax: 91-11-2508 8637
e-mail: dir.ccrt@nic.in

সীতারাম জিন্দাল ফাউন্ডেশন স্কলারশিপ

সীতারাম জিন্দাল ফাউন্ডেশন সারা ভারতবর্ষ জুড়ে আর্থিকভাবে দুর্বল মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার উন্নতি এবং অগ্রগতির জন্য স্কলারশিপ প্রদান করে থাকে। যোগ্য, ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীরা বিভাগীয় ওয়েবসাইট থেকে আবেদনপত্রের খসড়া ডাউনলোড করে প্রয়োজনীয় নথিপত্রসহ নির্দিষ্ট ঠিকানায় ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪-র মধ্যে পাঠাতে পারে।

যোগ্যতা

ক.

বিভাগ	বর্ণনা	পারিবারিক আয়
A	শুধুমাত্র ছাত্রী (নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি)	বিপিএল শ্রেণিভুক্ত
B	আই টি আই ছাত্রছাত্রী	শংসাপত্র দরকার নেই
C	স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর	বেতনভুক্তদের জন্য আয় (বছরে ৪ লাখের মধ্যে)
D	ইঞ্জিনিয়ারিং এবং মেডিকেল	বেতনভুক্তদের জন্য আয় (বছরে ২.৫ লাখের মধ্যে)
E	ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল, এনভারনমেন্ট সায়েন্টিস্ট, এনভারনমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং, এনভারনমেন্ট জার্নালিস্ট	বেতনভুক্তদের জন্য আয় (বছরে ২.৫ লাখের মধ্যে)

খ. ছাত্রছাত্রী অন্য কোনো স্কলারশিপ গ্রহণ করলে এই স্কলারশিপে আবেদনের সুবিধা পাবে না।

প্রয়োজনীয় নথিপত্র

ক. সর্বশেষ পরীক্ষার রেজাল্টের প্রত্যয়িত কপি।

খ. নবম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি অর্থাৎ A বিভাগের আবেদনকারীদের জন্য বিপিএল-এর শংসাপত্র আবেদনপত্রের সঙ্গে জমা দিতে হবে।

গ. বিশেষভাবে সক্ষম (PH) ছাত্রছাত্রীদের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে PH সার্টিফিকেট জোগাড় করে আবেদনপত্রের সঙ্গে জমা দিতে হবে।

ঘ. পারিবারিক বার্ষিক আয়ের শংসাপত্র।

ঙ. আবাসিক ছাত্রছাত্রীরা বিভাগীয় ওয়েবসাইট থেকে খসড়া নিয়ে হস্টেল কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর করে হস্টেলারের প্রমাণপত্রস্বরূপ জমা করবে।

চ. বিধবা বা এক্স-সার্ভিসম্যানদের ছেলেমেয়েরা পিপিও, এক্স-সার্ভিসম্যান, বিধবা আইকার্ড, রিলেশনশিপ ডিপেনডেন্সি সার্টিফিকেট জমা করবে।

স্কলারশিপের পরিমাণ

বিভাগ	বর্ণনা	পরিমাণ (প্রতিমাসে)
A	শুধুমাত্র ছাত্রী (নবম—দ্বাদশ শ্রেণি)	বিপিএল শ্রেণিভুক্ত ৩০০ টাকা
B	আইটিআই ছাত্রছাত্রী	প্রাইভেট আইটিআই ৪০০ টাকা সরকারি আইটিআই ২০০ টাকা
C	স্নাতক-স্নাতকোত্তর ছাত্রছাত্রী	ছাত্র ৪০০ টাকা ছাত্রী ৬০০ টাকা পিএইচ ছাত্রছাত্রী ৭০০ টাকা এক্স-সার্ভিসম্যান ৮০০ টাকা অনাথ অবিবাহিত ৮০০ টাকা বিধবা ৮০০ টাকা
D	মেডিকেল-ইঞ্জিনিয়ারিং	স্নাতক ছাত্র ১০০০ টাকা স্নাতক ছাত্রী ১২০০ টাকা স্নাতকোত্তর ছাত্র ১৫০০ টাকা স্নাতকোত্তর ছাত্রী ১৮০০ টাকা
E	ইলেকট্রনিক্স, মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল, এনভারনমেন্ট সায়েন্টিস্ট, এনভারনমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং, এনভারনমেন্ট জার্নালিস্ট ছাত্রছাত্রী	ছাত্র ৭০০ টাকা ছাত্রী ৮০০ টাকা

আবাসিক স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রতিমাসে অতিরিক্ত ৪০০ টাকা, আবাসিক মেডিকেল-ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রতিমাসে অতিরিক্ত ৬০০ টাকা দেওয়া হয়।

যোগাযোগ

Website: sitaramjindalfoundation.org

দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের ছাত্রছাত্রীদের জন্য

The Trustee, Sitaram Jindal Foundation, Jindal Nagar, Tumkur Road, Bengaluru 560 073, e-mail: scholarship.blr@sitaramjindalfoundation.org

উত্তর-পূর্ব ভারতের ছাত্রছাত্রীদের জন্য

The Trustee, Sitaram Jindal Foundation– 'NATURELLE', No. 11, Green Avenue, Behind Sector D-III, Bhatta Road, Vasant Kunj, New Delhi 110 070
e-mail: scholarship.dec@sitaramjindalfoundation.org ■

সব পরিবারেরই কিছু বলবার কথা থাকে, যে-কথা সবার সঙ্গে ভাগ করে নিতে হয়। আল-আমীন পরিবারেরও আছে তেমন কিছু কথা, কিছু খবর। এই বিভাগে থাকছে সেইসব কথা, সমাচার।

স্বাধীনতা দিবসে ফুটবল প্রতিযোগিতা ও রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী

অসম ঝাড়খণ্ড ও আমাদের রাজ্যের পনেরোটি জেলায় ছড়িয়ে থাকা আল-আমীন মিশনের একচল্লিশটি আবাসিক ও ছাব্বিশটি অনাবাসিক ক্যাম্পাসে গত ১৫ আগস্ট যথাযোগ্য মর্যাদায় ভারতের ৬৮-তম স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপিত হয়। মূল অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় হাওড়ার খলতপুর ক্যাম্পাসে। এখানে ছাত্র ও ছাত্রী বিভাগে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন যথাক্রমে মিশনের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী জনাব মারুফ-ই-ইলাহি। এই উপলক্ষে ছাত্রছাত্রীরা দেশাত্মবোধক নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে।

স্বাধীনতা দিবসের এই মহান দিনে ১৫—১৭ আগস্ট তিন দিনব্যাপী বত্তিরিশটি শাখার সাব-জুনিয়র, জুনিয়র ও সিনিয়র বিভাগে মোট আটচল্লিশটি দলের আন্তঃশাখা ফুটবল প্রতিযোগিতা যৌথভাবে উদ্‌বোধন করেন বিশিষ্ট ফুটবলার শ্রীষষ্ঠী দুলে ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম। ষষ্ঠী দুলের আগমন-মুহূর্তে মিশনের ছাত্রছাত্রীদের ভেঁপু বাজিয়ে স্বাগত জানানো এবং ভিন্ন ভিন্ন রংবেরংয়ে জার্সি ও নিজ নিজ দলের পতাকা নিয়ে আটচল্লিশটি দলের মাঠ প্রদক্ষিণ উপস্থিত সবাইকে মোহিত করে। ফুটবলের প্রতি কচিকাঁচাদের এই অনুরাগে মুগ্ধ ষষ্ঠী দুলে জানান, শহর থেকে দূরে এই শিক্ষাঙ্গনে আসতে পেরে তিনি আপ্লুত এবং বিশেষ করে অনাথ দুঃস্থ ও পিছিয়ে-পড়া পরিবারের ছেলেমেয়েদের আধুনিক শিক্ষার মাধ্যমে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার এই মানবিক উদ্যোগে সবারই সামিল হওয়া জরুরি। পরের দিন ১৬ আগস্ট কলকাতার আরেক জনপ্রিয় ফুটবলার মেহতাব হোসেন উপস্থিত হয়ে মিশনের খেলওয়াড়দের উৎসাহিত করেন।

বিশিষ্ট ফুটবলার মেহতাব হোসেন।

শেষদিন ১৭ আগস্ট ছাত্রী ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হয় রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী ও কৃতী ছাত্রী সংবর্ধনা। মিশনের ছাত্রী আমিরা পারভীনের কোরআন পাঠ দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। স্বাগত ভাষণে এম নুরুল ইসলাম বিশিষ্ট অতিথিবর্গের উপস্থিতিতে সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, মিশনের ব্যাপ্তি ক্রমান্বয়ে বর্ধিত হলেও আল্লাহ্‌র অপার অনুগ্রহ ও মহানবি হজরত মোহাম্মদ (স.)-এর নামের বরকতে পড়াশোনার মান ও সাফল্য আনুপাতিক হারে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি রাজ্যের সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরের সচিব জনাব সহিদুল ইসলাম, সম্মাননীয় অতিথি আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আবু তালেব খান ও বিশেষ অতিথি ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার সিনিয়র অফিসার আভা বেগমকে শাল ও স্মারক দিয়ে সম্মান জ্ঞাপন করা হয়।

অনুষ্ঠানে ফুটবলতারকা ষষ্ঠী দুলে (বাঁ-দিকে)।

সহিদুল ইসলাম বলেন, লেখাপড়া ছাড়া আমাদের সামনে কিন্তু কোনো পথ নেই। আমরা সবথেকে পিছিয়ে আছি শিক্ষায়। সেই কারণে লেখাপড়াটাকে এক নম্বরে রেখে অন্য সব কাজ করতে হবে। আল-আমীন মিশনকে ধন্যবাদ দেব যে, দীর্ঘদিন ধরে বহু পরিশ্রমে এই রাজ্যে তো বটেই, অন্য রাজ্যেও এই ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পেরেছেন।

ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, তোমরা যে-কাজই করো না কেন, সেই কাজটা কিন্তু খুব ভালোবেসে করতে হবে। ভালোবেসে না করলে কাজটি আয়ত্ব করতে পারবে না। এ ছাড়াও ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্যের দিকে তিনি বিশেষ নজর দিতে বলেন এবং সেই সূত্রে খাদ্যাভ্যাস নিয়েও বিশেষ আলোচনা করেন।

উপাচার্য আবু তালেব খান মেডিকেলে সফল ছাত্রীদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, বিজ্ঞানের আরও উচ্চতর গবেষণায় তোমাদের এগিয়ে আসতে হবে। শুধু ডাক্তার আর ইঞ্জিনিয়ার হলেই সব সফল হয়ে গেল, এমনটা কিন্তু নয়। জেনারেল সায়েন্স বা আর্টসেও তোমাদের সফলতা অর্জন করতে হবে। রামানুজনের উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, মাত্র পঁয়তিরিশ বছর বয়সে তিনি গণিতের বিস্ময় হয়েছেন। অথচ রামানুজন ক্লাস টেনের পরীক্ষায় গণিতে ফেল করেছিলেন। তিনি যদি পারেন, তা হলে আমরা কেন পারব না? উপাচার্য জনাব খান ডাক্তারির সঙ্গে সঙ্গে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তেও ছাত্রীদের উৎসাহিত করেন।

আভা বেগম বলেন, নারী জাতি চিরকাল সব ক্ষেত্রেই পিছনের

সারিতে। কিন্তু এখন তাদের উন্নয়নের জন্য যে এত বড়ো কর্মযজ্ঞ চলছে, তা আল-আমীনে না এলে বুঝতেই পারতাম না। আমরা যখন পড়াশোনা করেছি, তখন কিন্তু আমাদের সামনে এত সুযোগ ছিল না। তোমরা সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে প্রকৃত মানুষ হয়ে ওঠো— এই কামনা করি।

সভাশেষে মিশন পরিবারের দাদু শ্রীননীগোপাল চৌধুরী আগত অতিথিদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, আপনারা আজ থেকে আমাদের পরিবারে আর অতিথি না থেকে আত্মীয় হয়ে উঠলেন।

এ-বছরের জয়েন্ট মেডিকেলে সফল তেইশ জন কৃতী ছাত্রীর হাতে পুরস্কার তুলে দেন সম্মাননীয় অতিথিবৃন্দ। অনুষ্ঠানে নাত-এ-রসুল এবং রবীন্দ্রসংগীত ও নজরুল গীতি পরিবেশন করে মিশনের ছাত্রী যথাক্রমে নিশাত সিদ্দীকা, শবনম পারভীন ও সাহিনা আহম্মদ। মিশনের সভাপতি জনাব সেখ মহম্মদ আলী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

ওই দিনই, অপর এক সান্ধ্য অনুষ্ঠানে ফুটবল প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ও বিজেতাদের পুরস্কৃত করা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন আল-আমীন মিশন ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান ও মিশনের সুপারভাইজার সেখ মারুফ আজম। সাব-জুনিয়র, জুনিয়র ও সিনিয়র বিভাগে বিজয়ী হয় যথাক্রমে উনসানি, পাথরচাপুড়ি, উস্থি শাখা। অগণিত দেশপ্রেমী বীর সেনানীর স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মবলিদানকে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণের পাশাপাশি ফুটবল প্রতিযোগিতা, রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী, কৃতী ছাত্রী সংবর্ধনাসহ তিন দিন নানান অনুষ্ঠানে ভরপুর ছিল খলতপুর। আবার অপেক্ষা শুরু আগামী বছরের জন্য।

মডেল মাদ্রাসার প্রতিনিধি দল আল-আমীনে

গত ২০ আগস্ট পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের উদ্যোগে রাজ্যের চল্লিশটি মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকার একটি প্রতিনিধিদল খলতপুর হাইমাদ্রাসা (উচ্চমাধ্যমিক) ও আল-আমীন মিশন পরিদর্শনে আসেন। প্রতিনিধিদলে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি জনাব ফজলে রাব্বি ও সহ-সচিব শাবানা শামীম। উল্লেখ্য যে, রাজ্যের মডেল মাদ্রাসাগুলোর মধ্যে অন্যতম খলতপুর হাইমাদ্রাসার বিভিন্ন শ্রেণিকক্ষ, সায়েন্স ল্যাবরেটরি, কম্পিউটার ল্যাব, শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতিসহ অন্যান্য দ্রষ্টব্য প্রতিনিধিদল ঘুরে দেখেন। এই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক ও আল-আমীন মিশনের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম জানান যে, খলতপুর মাদ্রাসা দিয়েই কর্মযজ্ঞের শুরু। এই মাদ্রাসাকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে আল-আমীন মিশন, যা আজ অসম ঝাড়খণ্ড ও এ-রাজ্য মিলিয়ে একচল্লিশটি শাখায় বিস্তৃত। তাঁর মতে মাদ্রাসা-শিক্ষার যে মূল আদর্শ— নৈতিকতা মিশ্রিত আধুনিক শিক্ষা, সেটাই আল-আমীন মিশনে অনুসরণ করা হয়। এবং এর প্রভাবে এই রাজ্যে আরও বহু আবাসিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তৈরি হয়েছে। ফলে সংখ্যালঘু সমাজের বহু ছেলেমেয়ে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।

জনাব ফজলে রাব্বি জানান, মাদ্রাসাগুলোকে আরও উন্নত করার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার উদ্যোগ নিয়েছে। বেশ কিছু মাদ্রাসায় ইতিমধ্যে হস্টেলের নির্মাণকাজ শুরু হয়েছে এবং যেসব মাদ্রাসার নিজস্ব জমি আছে, তারা আবেদন করলে ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য আলাদা হস্টেল নির্মাণে সরকার আগ্রহী। তাঁর মতে মাদ্রাসার পঠনপাঠন আবাসিক হলে, সেখানে আল-আমীন মিশনের পদ্ধতিতে পড়াশোনা হতে পারে এবং মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীদেরও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়া সম্ভব। প্রতিনিধিদলের অন্যান্যরাও তাঁদের প্রতিক্রিয়ায় আল-আমীন মিশনের পরিকল্পনা ও পদ্ধতি অনুসরণের ওপর জোর দেন।

এ-দিন গার্লস ক্যাম্পাসে এক অনুষ্ঠানে উচ্চমাধ্যমিকের কয়েক জন কৃতী ছাত্রীর হাতে পুরস্কার তুলে দেন ফজলে রাব্বি ও শাবানা শামীম। শাবানা শামীম তাঁর ভাষণে মেয়েদের উচ্চশিক্ষা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার ওপর জোর দেন।

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে পাঁচুড় শাখায় চারু-কারু প্রদর্শনী।

পাঁচুড় শাখায় স্বাধীনতা দিবস

১৫ আগস্ট আল-আমীন মিশন পাঁচুড় শাখার উদ্যোগে আয়োজিত হল এক বর্ণাঢ্য প্রদর্শনী ও ছাত্রছাত্রীদের বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। ভারতের ৬৮-তম স্বাধীনতা দিবসের স্মরণে পালিত হল এই বর্ণময় উদ্যোগ। প্রতিবছরের মতো ত্রিবর্ণ পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় অনুষ্ঠান। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবী জনাব সাজাহান মোল্লা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আল-আমীন স্টাডি সার্কলের অধ্যক্ষ দিলদার হোসেন ও সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যরা। চারু-কারু প্রদর্শনী ও অভিভাবকদের বসে আঁকো প্রতিযোগিতা ছিল এ-দিনের বিশেষ আকর্ষণ। প্রায় দুই শত ছাত্রছাত্রী এ-দিনের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। সংগ্রামীদের জীবনের বিনিময়ে লব্ধ এই স্বাধীনতার প্রতি উদ্দেশ্য করে বক্তৃতা রাখেন বিশেষ অতিথিরা।

মডেল মাদ্রাসার প্রতিনিধি দলের সঙ্গে জনাব ফজলে রাব্বি, শাবানা শামীম এবং এম নুরুল ইসলাম।

পুরস্কৃত সাবিয়া বেগম

বেঙ্গালুরুর আল-আমীন এডুকেশনাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ডা. মুমতাজ আহমেদ খানের জন্মদিন ৬ সেপ্টেম্বর এই সোসাইটির তরফে 'ফাউন্ডারস ডে' হিসেবে প্রতিবছর পালিত হয়। এই অনুষ্ঠানে মহানবি হজরত মোহাম্মদ (স.)-এর প্রথমা পত্নীর নামাঙ্কিত 'হজরত বিবি খাদিজা পুরস্কার' শিক্ষা ও সমাজসেবায় অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে প্রদান করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গ থেকে এ-বছর এই পুরস্কার পেলেন আল-আমীন মিশনের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলামের সহধর্মিণী সাবিয়া বেগম। প্রতিকূল পরিবেশের কঠিন সংগ্রামে বহু ত্যাগ তিতিক্ষা স্বীকার করে এম নুরুল ইসলামের পাশে থেকে নীরবে সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন সাবিয়া বেগম। তারই স্বীকৃতিস্বরূপ এই পুরস্কার বলে কর্তৃপক্ষের ঘোষণা। এই উপলক্ষ্যে সাবিয়া বেগমের হাতে মানপত্র, শাল ও উপহার সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। এই বিশেষ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রাক্তন অ্যাসিস্ট্যান্ট সলিসিটর জেনারলে টি পি এম ইব্রাহিম খান, কেরল। উপস্থিত ছিলেন প্রধান অতিথি সিয়াসত উর্দু দৈনিকের সম্পাদক জাহিদ আলি খান, হায়দরাবাদ; সম্মাননীয় অতিথি ডা. মুমতাজ আহমেদ খান ও বিশেষ অতিথি কর্ণাটক সরকারের শহর বিকাশ ও হজ বিষয়ক মন্ত্রী রওশন বেগ প্রমুখ।

আদর্শ শিক্ষক সম্মাননা পেলেন এম নুরুল ইসলাম

বিশিষ্ট দার্শনিক ও ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের ১২৭-তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে গত ৭ সেপ্টেম্বর উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার দেগঙ্গাস্থিত ফ্রন্টপেজ গ্রুপ অফ ইনস্টিটিউশনে অনুষ্ঠিত জাতীয় শিক্ষক দিবসে প্রদান করা হল 'আদর্শ শিক্ষক সম্মাননা ২০১৪'। এ-বছর এই সম্মাননা পেলেন আল-আমীন মিশনের সাধারণ সম্পাদকসহ কয়েক জন গুণী শিক্ষক। স্বাগত ভাষণে সংস্থার চেয়ারম্যান মুহাম্মদ কামরুজ্জামান বলেন, শিক্ষকদের প্রতি শিক্ষার্থীর দায়িত্ববোধ ও ছাত্রছাত্রীদের প্রতি শিক্ষকদের দায়িত্ববোধ ও ভালোবাসা যাতে কোনোমতেই নষ্ট না হয়, সে-দিকে সজাগ থাকা জরুরি। তিনি আরও বলেন, আজকের এই শুভক্ষণে আমরা মানুষ গড়ার কারিগর বেশকিছু আদর্শ শিক্ষককে সম্মানিত করতে পেরে গর্বিত। এম নুরুল ইসলামকে শাল ও মানপত্র দিয়ে সম্মানিত করা হয়। উল্লেখ্য, এম নুরুল ইসলাম খলতপুর হাইমাদ্রাসার প্রধান শিক্ষকও।

প্রতিক্রিয়ায় এম নুরুল ইসলাম বলেন, শিক্ষার বিকল্প নেই। শিক্ষার মধ্য দিয়েই পিছিয়ে-পড়া সংখ্যালঘু সমাজকে তুলে আনা সম্ভব। একজন শিক্ষক শিক্ষাপ্রদানের মাধ্যমে গড়ে তোলা সমাজ ও শিক্ষার্থীর মধ্যেই সারাজীবন জীবন্ত থাকেন। তাই শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক হওয়া উচিত মধুর ও পারস্পরিক সহযোগিতাপূর্ণ। অন্যান্য যাঁরা এই সম্মাননা পেলেন— রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সুরঞ্জন মিদ্দে, রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রবীণ শিক্ষক ড. নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, মালদার চাঁচল কলেজের অধ্যাপক ড. নুরুল ইসলাম এবং কামারগাঁতি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক কানিজ আহমেদ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ড. দিলীপকুমার ভট্টাচার্য এবং উপস্থিত ছিলেন 'কলম' পত্রিকার সম্পাদক সাংসদ আহমদ হাসান ইমরান, দেগঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক পলাশ চ্যাটার্জি, কাদেরিয়া হাইমাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক খাদেমুল ইসলাম, সংস্থার ডাইরেক্টর ড. জাহিদুর সরকার প্রমুখ।

খলতপুর শাখায় সায়েন্স অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম

গত কয়েক বছর ধরে মিশনের বিভিন্ন শাখায় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে গণিত ও বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গত ২৭ সেপ্টেম্বর খলতপুর শাখায় 'সায়েন্স অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামে' উপস্থিত হন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জ্যোতির্বিজ্ঞানী অধ্যাপক অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি জানান, ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন প্রথমে চন্দ্রযান ও পরে মঙ্গলযান সফল প্রতিস্থাপন করে এক বিশেষ ইতিহাস গড়েছে। চীন জাপানের মতো দেশকে টপকে ইসরোর সফল মঙ্গলগ্রহ অভিযান ভারতের জন্য অবশ্যই গর্বের। পাওয়ার প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানের নানান বিষয় ছাত্রছাত্রীদের কাছে বিশেষ আকর্ষণীয় করে তোলেন। মঙ্গলযানের সাফল্য আলোচনা করে তিনি মিশনের ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতে বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণার আহ্বান জানান।

কলকাতার আকাশবাণীর বিজ্ঞান বিভাগে কর্মরত বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের নানান অনুষ্ঠানের সফল প্রয়োজক ড. মানসপ্রতিম দাস স্লাইড শোয়ের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের মাঝে 'আলো' সম্পর্কে নানান তথ্য

তুলে ধরেন। গ্যালিলিওর সময় থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত কৃষ্ণগহ্বর, ছায়াপথ, অতি বেগুনি রশ্মি ও নানান তরঙ্গ নিয়ে মনোগ্রাহী আলোচনা করেন। মঙ্গলযান সম্পর্কে তিনি জানান, মার্স কালার ক্যামেরা মঙ্গলপৃষ্ঠের ছবি তুলবে, মার্স মিথেন সেন্সর মঙ্গলে মিথেন গ্যাসের সন্ধান করবে, লাইম্যান আলফা ফোটোমিটার আবহাওয়ার ঘনত্বের সন্ধান দেবে, মার্স এক্সোস্ফেরিক নিউট্রাল কম্পোজিট অ্যানালাইজার বায়ুমণ্ডলের অতড়িদাহত কণার সন্ধান করবে ও থার্মাল ইনফ্রারেড ইমেজিং স্পেকট্রোমিটারের কাজ হবে মঙ্গলে মাটির গড়ন, ভূমির তত্ত্বগত বিশ্লেষণ ও অগ্নুৎপাত হয়েছে কি না, তা দেখা। সাত হাজার তিনশো কিমি উচ্চতা থেকে তোলা মঙ্গলযানের ক্যামেরাবন্দি প্রথম ছবির স্লাইড পর্দায় দেখে ছাত্রছাত্রীরা অভিভূত হয়ে যায়।

অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় ও ড. দাস, উভয়েই বিজ্ঞান বিষয়ে মিশনের ছাত্রছাত্রীদের কৌতূহল ও শৃঙ্খলাবোধ দেখে খুবই আশাবাদী হন। প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর শ্রীদীপককুমার সাহা মিশনের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলামের হাতে 'সায়েন্স অ্যান্ড কালচার' জার্নালের কয়েকটি সংখ্যা তুলে দেন। এই অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন এম নুরুল ইসলাম এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ননীগোপাল চৌধুরী।

মিশনের ছাত্রছাত্রীদের সাফল্য

২৪ এপ্রিল ও ৮ জুলাই ২০১৪ অষ্টম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের জন্য 'ন্যাশনাল মুসলিম ট্যালেন্ট সার্চ এগজামিনেশনে'র আয়োজন করেছিল দিল্লির হিউম্যান ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন। সম্প্রতি এই মেধা পরীক্ষায় পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে প্রথম ও ভারতবর্ষে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে আল-আমীন মিশনের খলতপুর শাখার ছাত্র মেহেবুব হোসেন মোল্লা। রাজ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান পায় মিশনেরই ছাত্র শান আরিয়ান ও মহম্মদ ওয়াসিম। ছাত্রীদের মধ্যে রাজ্যে প্রথম হয় খলতপুর শাখার তামান্না জামান। উল্লেখ্য যে, এই মেধা পরীক্ষায় রাজ্যের ২২৯৬ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে র‍্যাঙ্ক করে সফল হয়েছে মাত্র ১১৩ জন। সফল ১১৩ জনের মধ্যে রয়েছে মিশনের খলতপুর শাখার ৬০ জন ও মহম্মদপুর শাখার ১০ জন।

রাজ্যে প্রথম মেহেবুব হোসেন মোল্লা।

নয়াবাজ শাখায় নবীনবরণ

গত ১৯ জুন আল-আমীন মিশনের নয়াবাজ শাখায় দারুণ উৎসাহ ও উদ্দীপনায় নবীনবরণ ও কৃতী সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। উচ্চমাধ্যমিক ও জয়েন্ট এন্ট্রান্সের মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে সফলদের সংবর্ধনার পাশাপাশি একাদশ শ্রেণির নবাগত ছাত্রদের মিশন পরিবারের রীতি অনুযায়ী বরণ করে নেওয়া হয়। এই উপলক্ষে মিশনের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম কৃতী ছাত্রদের আরও বড়ো হওয়ার স্বপ্ন দেখতে অনুপ্রাণিত করেন। ভবিষ্যতের ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ারদের দেখিয়ে একাদশ শ্রেণির নবাগত ছাত্রদের তিনি উৎসাহ দেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এলাকার শুভাকাঙ্ক্ষী ও বিশিষ্টজন, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীবৃন্দ এবং নয়াবাজ শাখার ভারপ্রাপ্ত খন্দকার মহিউল হক।

মিশনের ভর্তির পরীক্ষা

পশ্চিমবঙ্গে প্রায় প্রতিটি জেলায় ছড়িয়ে থাকা আল-আমীন মিশনে পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণিতে ভর্তির জন্য এ-বছর মোট ১৩০৭৮ জন ছাত্রছাত্রী গত ২ নভেম্বর ২০১৪ পশ্চিমবঙ্গের ৪৯-টি ও ত্রিপুরার একটি কেন্দ্রে পরীক্ষা দেয়। এদের মধ্যে ৮৬০৭ জন ছাত্র ও ৪৪৭১ জন ছাত্রী।

লিখিত পরীক্ষার ভিত্তিতে প্রাথমিকভাবে ৩৪৮২ জন সফল ছাত্রছাত্রীর তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। এদের মধ্যে ২৪-টি ক্যাম্পাসে প্রায় ২৩০০ ছাত্রছাত্রীকে ভর্তি নেওয়া হবে।

একাদশ শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তির জন্য ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে ফর্ম দেওয়া শুরু হবে। ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫। ভর্তির পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে ৮ মার্চ ২০১৫ রবিবার।

মোল্লা আজিজুল হকের প্রয়াণ

বিশিষ্ট সমাজসেবী শিক্ষানুরাগী মোল্লা আজিজুল হক গত ২৯ আগস্ট ২০১৪-য় মাত্র ৪৬ বছর বয়সে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বিড়লাপুর গ্রামে, নিজের বাড়িতে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন।

মোল্লা আজিজুল হকের জন্ম ১৯৬৮ সালের ৪ অক্টোবর। আব্বা সানোয়ার আলি মোল্লা এবং মা ফজিলাতুন নেশা বেগম। বৃহৎ অথচ অসচ্ছল পরিবারে জন্মানোর কারণে, অল্পবয়স থেকেই উপার্জন করে অভাবের সংসারে নানাভাবে সাহায্য করতেন, বিশেষত অন্যান্য ভাই-বোনেদের পড়াশোনার আর্থিক ভার গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বিড়লা জুট মিল হাইস্কুল থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাস করার পর ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে যাদবপুরে ভর্তি হন। তারপর থেকে কলকাতায় তাঁর স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু। অংশ নিয়েছিলেন প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে, মুসলিম লিগের প্রার্থী হয়ে নির্বাচনেও লড়েছিলেন। আল্লাহ্‌র প্রতি গভীর ভক্তি, সততা ও স্পষ্টবাদিতা তাঁর চরিত্রের পরম গুণ। যেকোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁকে জীবনের সূচনা থেকে শেষ পর্যন্ত সরব থাকতে দেখা গেছে। আত্মিক কোনো স্খলন ঘটতে পারে, এমন কোনো কাজে তাঁকে কখনও যুক্ত থাকতে দেখা যায়নি। সদাশয় সাত্ত্বিক স্বভাবের জন্য বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী জ্ঞানীগুণী মানুষদের সঙ্গে ছিল তাঁর মধুর সম্পর্ক। তীব্র জ্ঞানতৃষ্ণার কারণে তিনি গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন থেকেও শিক্ষা গ্রহণ করেন। কিছুদিন তিনি আমিনি বা জমি জরিপের কাজ করেছিলেন। বিনাপয়সায় শরিয়তি বিধান মেনে নানান আইনি সমস্যার সমাধান করতেন। বালকবয়স থেকেই তাঁর অন্তরে লালিত হত হজ পালনের অভিপ্রায়, সেই অভিপ্রায়ের জোরে তিনি কম বয়সেই হজ পালনে সমর্থ হন। তিনি বেশ কিছু সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন আজীবন।

প্রায় পনেরো বছর আগে শিলিগুড়িতে মেহেবুবা আলীর সঙ্গে শরিয়তমতে তাঁর বিবাহ হয়। দার্জিলিংয়ে কিছুদিন হোটেল ব্যাবসা করেন। পরে তা ছেড়ে দিয়ে শিলিগুড়িতে একটি স্কুল ও ম্যানেজমেন্ট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করেন। অবশেষে দীর্ঘদিনের সহযোগী আবু বক্কর সিদ্দিক এবং গোলাম মোর্তজাকে সঙ্গে নিয়ে শিলিগুড়িতে মিলনমোড়ে চার বিঘা জমির ওপর পাহাড়ের কোলে আধুনিক ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অ্যাডামস স্কলার ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন। প্রায় একই সময়ে তাঁর উদ্যোগে উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ায়ও একটি স্কুল স্থাপিত হয়। এর কিছুদিনের মধ্যে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ায় পরিবারের অন্যান্যরা তাঁকে বিড়লাপুরে গ্রামের বাড়িতে নিয়ে চলে আসেন।

স্বভাবতই তাঁর স্বপ্নের অ্যাডামস স্কলার ফাউন্ডেশনের দায়িত্বভার নিয়ে তাঁর মধ্যে নানান উদ্‌বেগ তৈরি হয়। এবং অনেক বিবেচনার পর আল-আমীন মিশনের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলামকে যোগ্যতম মনে করে, তাঁর পরিবারবর্গের উপস্থিতিতে তিনি তা শর্তনিরপেক্ষভাবে অর্পণ করেন মিশনের হাতে। সেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই 'আল-আমীন মিশন একাডেমী, মিলনমোড়', যা আল-আমীন মিশন পরিচালিত প্রথম ইংরেজি মাধ্যম স্কুল।

বিড়লাপুর গ্রামে পারিবারিক কবরস্থানে তাঁর দাফন সম্পন্ন হয়। তাঁর জানাজায় অসংখ্য মানুষের সঙ্গে আল-আমীন মিশন পরিবারের পক্ষে সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলামসহ বেশ কয়েক জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। তাঁরা তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সমবেদনা জানান। মিশনের সমস্ত শাখার শিক্ষক শিক্ষাকর্মী ও হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী মরহুম মোল্লা আজিজুল হকের রুহের মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করেন। মোল্লা আজিজুল হক রেখে গেলেন স্ত্রী, কন্যা, দুই পুত্র এবং অগণিত অনুরাগীকে। ■

এবারের পাতায় রয়েছে পাথরচাপুড়ি, ধুলিয়ান, মালদা ও বাবনান ক্যাম্পাসের ছাত্রছাত্রীদের ছবি ও লেখা।

বুড়ো ব্যাঙের কাহিনি

আব্দুল সামাদ
একাদশ শ্রেণি, মালদা ক্যাম্পাস

এক যে ছিল আজব দেশ, সে-দেশ আমাদের গ্রাম শহর ও সাতসমুদ্দুর পেরিয়ে। সেখানে বাস করত এক ব্যাঙ এবং তার দুই বন্ধু হরিণ ও খরগোশ। একদিন এক ভোজের আসরে তাদের তিনজনের ডাক পড়ল। কিন্তু সেখানে ঘটল এক অদ্ভুত ঘটনা। সবাই খাবারের অপেক্ষায় বসে আছে, অনেকক্ষণ পরেও কেউ কোনো খাবার পেল না। সেই দেশের এক নিয়ম ছিল: যে সবার চেয়ে বুড়ো, তাকেই সবার প্রথমে খাবার দিতে হবে। এবার সমস্যা বাধল, কে সবার চেয়ে বুড়ো? তখন হরিণ তার শিং দুলিয়ে বলল, আমি তো হলাম সবার চেয়ে বুড়ো। খরগোশ তখন তাকে বলল, তোমার বয়স কত শুনি? হরিণ বলতে শুরু করল, ওই যে আকাশে তারাগুলি দেখছিস, ওগুলো আমি পেরেক ঠুকে আকাশের বুকে এঁটে দিয়েছিলাম। এরপর হরিণের কথা শুনে খরগোশ বলতে লাগল, তাহলে তো আমি তোমার দাদুর সমবয়সি। কারণ, তোমরা যে-মই বেয়ে আকাশে চড়ে তারাগুলোকে আটকে দিয়েছ, সেই মই তো আমার নিজের হাতে লাগানো গাছ থেকে তৈরি। খরগোশের কথা শুনে ব্যাঙ কেঁদে উঠল। তার কান্না দেখে হরিণ ও খরগোশ দুজনে তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, কাঁদছ কেন বন্ধু? ব্যাঙ তখন তার হাতের চেটো দিয়ে চোখের জল মুছে বলল, তোমাদের কথা শুনে আমার অনেক পুরোনো দিনের কথা মনে পড়ে গেল, তোমরা তো জান, আমার তিন ছেলে ছিল। তারা তিনজন তিনটে গাছ লাগিয়েছিল। প্রথম ছেলের লাগানো গাছ থেকে হাতুড়ি তৈরি হয়েছিল, যা দিয়ে পেরেক লাগানো হয়েছে। দ্বিতীয় ছেলের লাগানো গাছ থেকে তৈরি লাঙল দিয়ে আকাশের বুকে ছায়াপথগুলিকে টানা হয়েছিল। আর তৃতীয় ছেলে একটি তারার গাছ লাগিয়েছিল, সেই তারা আকাশে আটকানো হয়েছে। কিন্তু কী হতভাগ্য আমি! আমি বুড়ো হওয়ার আগেই আমার তিন ছেলে বুড়ো হয়ে অনেক আগে মরে গেছে। ব্যাঙের কথা শুনে আসরের সবাই হেসে উঠল। বুড়ো ব্যাঙের পাতে তখন থরে থরে খাবার সাজিয়ে দেওয়া হল।

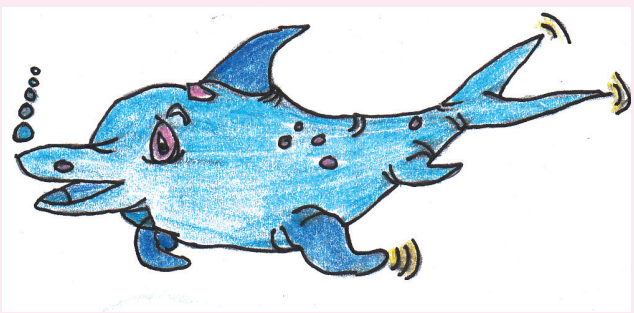

নাইস রহমান
সপ্তম শ্রেণি, পাথরচাপুড়ি ক্যাম্পাস

নাসিমা মণ্ডল
পঞ্চম শ্রেণি, পাথরচাপুড়ি ক্যাম্পাস

পাখি ও আলো

মহ. নাবিল সাদ হালদার
পঞ্চম শ্রেণি, বাবনান ক্যাম্পাস

পাখির ডানার রঙে যেন ঝলমল করে ওঠে আকাশ,
আলো যেন ফুটিয়ে তোলে গগনকে।
ছোটো দিঘিতে আলো পড়ে ঝলমলে,
ছোটো দিঘিতে পাখি ডানা মেলে কোলাহলে,
আকাশটা যেন ফুটিয়ে তোলে পাখি আর আলো,
পাখি ফেরে বাসায়,
আলো ফেরে রাস্তায়।
পাখি তো আমাদের ভালো,
আলোতে সূর্যের আলো,
পাখি ওড়ে মেঘের চূড়ায়,
আলো ওঠে আকাশে বাতাসে।
পাখি আর আলো যেন ফুটিয়ে তোলে আকাশকে।

বাঁদর

প্রিয়াঙ্কা খাতুন
পঞ্চম শ্রেণি, পাথরচাপুড়ি ক্যাম্পাস

এক যে ছিল বাঁদর
সে গায়ে দিত চাদর,
চড়থাপ্পড় কিল মেরে
সে করত খুব আদর।
একদিন সে রাতে
লাঠি নিয়ে হাঁটে,
ঝাল-লঙ্কা ফেলে দিল
হাঁড়িভরা ভাতে।
ঝাল খেয়ে প্রাণ যায়
সবাই করে হায় হায়,
তা-ই দেখে বাঁদরভায়া
মিটিমিটি চায় পিটিপিটি চায়।

সেটা

তুহিনা ইসলাম
দশম শ্রেণি, পাথরচাপুড়ি ক্যাম্পাস

সেটা যেন নির্মল আকাশ
বৃষ্টিভেজা হিমেল বাতাস,
সেটা যেন ভোরের আলো
আমাকে হঠাৎ জাগাল।
সেটা যেন সাদারং ফুল
হালকা এক গন্ধে মশগুল,
সেটা যেন মধুর আবেশ
রাপুনজেলের সোনালি কেশ।
সেটা যেন জোনাকির প্রভা
প্রজ্বলিত করে তার শোভা,
সেটা আমি খুঁজি হেথা হোথা
সেটা মাগো তোমারই মমতা।

নাজনিন সুলতানা
একাদশ শ্রেণি, ধুলিয়ান ক্যাম্পাস

আমাদের পাতা

লেখা পাঠাবে পরিষ্কার হস্তাক্ষরে। কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখবে, অন্য পৃষ্ঠা থাকবে সাদা। অবশ্যই পাতার দু-দিকে অনেকটা মার্জিন রাখবে, যাতে সম্পাদনা করতে সুবিধে হয়। লেখাটি অবশ্যই নিজের হতে হবে। লেখা পাঠাবে নকল রেখে, যাতে ছাপার পর সম্পাদিত লেখার সঙ্গে নিজেরটির তুলনামূলক বিচার করতে পার।

খবরে আল-আমীন মিশন: ১৯৯৮—২০১৪

- একটি পিছিয়ে পড়া সমাজকে টেনে তুলছে আল-আমীন মিশন। —অশোককুমার কুণ্ডু, আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৪.০৮.১৯৯৮
- দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদের খুঁজে চলেছে আল-আমীন মিশন। —অশোককুমার কুণ্ডু, আনন্দমেলা, ০১.০৩.২০০০
- বাঙালি মুসলিমদের শিক্ষায় নবজাগরণের নয়া তীর্থ। —আবদুর রাউফ, সংবাদ প্রতিদিন, ১৪.১২.২০০০
- বিদ্যার অভিনব সূর্যোদয়: আধুনিক শিক্ষাখাতে যাকাত ও ফিতরার অর্থ সম্পদের ব্যবহার প্রায় দেখাই যায় না। এদিক থেকে আল-আমীন মিশনের আরম্ভ, নির্মাণ ও বিস্তার অবশ্যই একটি নিঃশব্দ বিপ্লব। —বাহারউদ্দিন, আজকাল (রবিবাসর), ১৮.১১.২০০১
- দানের টাকায় আধুনিক শিক্ষা, একটি স্বপ্নের নীরব অভিযান। —মিলন দত্ত, আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৪.০২.২০০২
- Mainstream reform from within –Madhumita Bhattacharya, The Telegraph, 10.09.2002
- একটি স্কুলের ভর্তি পরীক্ষা, নবজীবনের প্রবেশ পথ। —একরাম আলি, আজকাল, ০৪.০৪.২০০৩
- Merit Explodes Madrasah myths –Sunanda Sarkar, The Telegraph, 28.07.2003
- সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অনন্য দৃষ্টান্ত। —সম্পাদকীয়, কালান্তর, ০৯.০৮.২০০৩
- ইচ্ছে হাওয়ায়। —কবীর সুমন, আজকাল, ১৭.০৭.২০০৪
- Flying Colours –Md. Shafi Shamsi, The Indian Express, 02.06.2005
- Al-Amin Way: The Real Alternative to Reservation –Arindam Chowdhury, Business & Economy (Editorial), 26.08.2005
- ধর্ম, সমাজ, ঘেরাটোপ— ঢেউ উঠছে, কারা টুটছে। —বোলান গঙ্গোপাধ্যায়, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২২.১২.২০০৫
- School Bells Echo Amidst Paddy Fields: Al-Ameen Mission has today become a model for excellent education standards. –Islamic Voice, February 2006
- Hope for Hopeless: It's school that gives those children a chance who have not a penny of their name– Nisha Lahiri, The Telegraph, 02.06.2006
- রাজ্যে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার নবজাগরণ। —অঞ্জন বসু, সংবাদ প্রতিদিন, ০৩.০২.২০০৭
- আল-আমীন মিশন—প্রতিশ্রুতির অন্য নাম। —এস. এম. সামসুদ্দিন, একদিন, ০২.০৩.২০০৭
- মূল স্রোতে। —সম্পাদকীয়, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৮.০৫.২০০৭
- Mission Launchpad for poor student –Jhimli Mukherjee, The Times of India, 01.06.2007
- আল-আমীনের সাফল্য: আত্মশক্তিতে ভরপুর বাঙালি মুসলমানরা।— শেখ ইবাদুল ইসলাম, একদিন, ০১.০৬.২০০৭
- আল-আমীন মিশন: স্বপ্ন পূরণের মাইল ফলক। —মহ. সাদউদ্দিন, কালান্তর (রবিবারের পাতা), ১০.০৬.২০০৭
- Sustained by Donations, Al-Ameen Mission is providing mainstream learning to the community's children. Rajdeep Datta Roy, Live mint.com, The Wall Street Journal, 18.12.2007
- Mission Possible: It has scripted many a turnaround: Picking up poor kids, tutoring them and seeing them off on the road of success. –Jayanta Gupta & Subhro Maitra, The Times of India, 30.04.2008
- Deprived kids blaze trail of glory: House of dreams. The Al-Ameen Mission has been nurturing talent from underprivileged Muslim Families. –Sumati Yengkhom, The Times of India, 28.05.2010
- Al-Ameen Mission-Shelter & Studies. –Bibhas Bhattacharyya, Hindusthan Times, 23.06.2010
- গৌরব, লজ্জা— সম্পাদকীয়, আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৯.০৫.২০১২
- A mission that changes lives, helps dreams soar. –The Times of India, 28.05.2013
- নতুন তারার জন্ম আল-আমিনে। —কৌশিক সরকার, এই সময়, ০৪.০৬.২০১৩
- One Mission, hundreds of success stories –The Times of India, 04.06.2013.
- Al-Ameen Students score big in medical. –Sumati Yengkhom, The Times of India, 07.06.2013
- জয়েন্টেও মিশন সফল আল আমিনের। —অনির্বাণ ঘোষ, এই সময়, ০৯.০৬.২০১৩
- সমাজের অন্দর থেকে। —তাজুদ্দিন আহ্‌মেদ, আনন্দবাজার পত্রিকা, ১১.০৯.২০১৩
- আল-আমীন মিশন এক মরূদ্যান, এক অনুঘটক। —একরামূল হক শেখ, স্বভূমি, ০৯.০৩.২০১৪
- দারিদ্র্য জয় করে উজ্জ্বল আল-আমীন মিশন। —সোমনাথ মণ্ডল, আজকাল, ৩১.০৫.২০১৪

সেরা মেধাবীদের সেরা প্রতিষ্ঠান ▮ উচ্চতায় অদ্বিতীয় উজ্জ্বলতায় অম্লান

আল-আমীন মিশন

উমর আলি
মেডি. ৩২

একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি ২০১৫

- একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির ফর্ম পাওয়া যাবে ১২ ডিসেম্বর ২০১৪ থেকে।
- ফর্ম সংগ্রহ ও জমা দেওয়ার শেষ তারিখ: ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫।
- প্রবেশিকা পরীক্ষা: ৮ মার্চ ২০১৫, রবিবার।
- দুঃস্থ, মেধাবী ও এতিম ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিশেষ সুযোগ সুবিধা আছে।
- www.alameenmission.org এই ওয়েবসাইট থেকে ফর্ম ডাউনলোড করেও জমা দেওয়া যাবে।

তাবাসসুম খাতুন
মেডি. ৫৮

একনজরে সাফল্য ২০১৪

জয়েন্ট এন্ট্রান্সের ফল

মেডিকেল*	১০০০-এর মধ্যে	১৫০০-এর মধ্যে	২০০০-এর মধ্যে	২৫০০-এর মধ্যে
	১০৪ জন	১৩৯ জন	১৮১ জন	২৩১ জন
ইঞ্জিনিয়ারিং	২০০০-এর মধ্যে	৫০০০-এর মধ্যে	১০০০০-এর মধ্যে	১৫০০০-এর মধ্যে
	১৪ জন	৫৭ জন	১১২ জন	১৫৮ জন

*এ-বছর মেডিকেলে ২১১ জন ভর্তি হয়েছে (এমবিবিএস ১৫৬ জন, বিডিএস ৫৫ জন)।

সাজিদ আহমেদ
মেডি. ৩৩

মেহজাবীন পারভিন
মেডি. ৮২

ইনজামামুল হক
মেডি. ৩৪

রুনা লায়লা
মেডি. ১১২

উচ্চমাধ্যমিকের ফল

	পরীক্ষার্থী	৯০%	৮৫%	৮০%	৭৫%	৭০%	৬০%	সর্বোচ্চ
ছাত্র (বিজ্ঞান)	৯১৫	১০	৭১	২৩১	৪৩৯	৬৩৫	৮৫৪	৯১.৮%
ছাত্রী (বিজ্ঞান)	৪৪৯	০১	১৯	৮৫	১৯৩	২৮৮	৪০৪	৯০.০%
ছাত্রী (কলা)	২৫	—	০১	০৫	১২	১৭	১৯	৮৪.৬%
মোট	১৩৮৯	১১	৯১	৩২১	৬৪৪	৯৪০	১২৭৭	—

জোহেব মণ্ডল
মেডি. ৩৮

নিশা খাতুন
মেডি. ১১৫

মাধ্যমিকের ফল

	পরীক্ষার্থী	৯০%	৮৫%	৮০%	৭৫%	৭০%	৬০%	সর্বোচ্চ
ছাত্র	৪২৪	৮৩	২১৭	৩১৮	৩৬৬	৩৯০	৪১৫	৯৫.১%
ছাত্রী	১৯০	২৭	৭৪	১১২	১৩৬	১৬৩	১৮১	৯৫.৭%
মোট	৬১৪	১১০	২৯১	৪৩০	৫০২	৫৫৩	৫৯৬	—

মহ. সাজিদ মল্লিক
মেডি. ৪০

সাবিনা আকতার
মেডি. ২৩০

সাহারুখ হোসেন
মেডি. ৫১

বুলবুল সেখ
মেডি. ৬৫

সেখ হাসানুর জামাল
মেডি. ৭৫

মহ. সামিম আক্তার
মেডি. ৯০

মতিউর রহমান
মেডি. ৯৫

কাজী রৌনক হোসেন
মেডি. ১৪৪

বুলবুল সরদার
মেডি. ১৬০

মহ. ওমর খান
মেডি. ১৬৩

রেজিস্টার্ড অফিস: খলতপুর, উদয়নারায়ণপুর, হাওড়া ● ফোন: (০৩২১৪) ২৫৭ ৭৯৬/৮০০, ৯৪৩৪৬ ২০৯২০
সেন্ট্রাল অফিস: ৫৩ বি ইলিয়ট রোড, কলকাতা ৭০০ ০১৬ ● ফোন: (০৩৩) ২২২৯ ৩৭৬৯, ৩২৯৭ ৩৫৮০